শ্রীমতী কাফে

সমরেশ বসু

মৌসুমী প্রকাশনী।। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ১৩৬০

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
অন্নপূর্ণা এজেন্সি
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

দাম : আশি টাকা

অনিল সিংহ ও সনত বসু

বন্ধুবরেষু—

প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গে

প্রথম কথা, শ্রীমতী কাফে কোন একটা রেস্তোঁরা নয়। তবু একাধিক মিলে শ্রীমতী কাফের একটা বিশেষত্ব আছে। অর্থাৎ শ্রীমতী একটা ঐতিহ্য বহন ক'রে চলেছে। সে ঐতিহ্য আমাদের জাতীয় জীবনেরই আলো আঁধারির খেলা।

শ্রীমতী কাফে উপন্যাস। কাহিনী ও চরিত্রই এর প্রধান উপজীব্য এবং তা বাস্তবধর্মী হলেই এর উৎস-সন্ধানে যে ইতিহাস আপনা হতেই এসে পড়ে, উপন্যাসে সেটা অপ্রধান নয়।

শ্রীমতী কাফে যেন রঙ্গমঞ্চ, যে হিসাবে আমরা সমগ্র বিশ্বকেই রঙ্গমঞ্চ বলে থাকি। সুতরাং ক্ষেত্র বড় বিস্তৃত নয়। অথচ অনেক ঘটনা। তাই কাহিনীর গতি চলতি নিয়ম থেকে একটু অন্য পথ ধরেছে। পথটা সমাদৃত হলেই সার্থক।

আবার বলছি শ্রীমতী কাফে কোন বিশেষ রেস্তোঁরা নয় এবং শ্রীমতী কাফের আয়নায় যদি কেউ নিজের প্রতিবিম্ব দেখেন, সে দায়িত্ব লেখকের নয়। চরিত্রগুলি লেখকের সৃষ্টি।

আর এক কথা, তেরশো উনষাটের শারদীয় চতুষ্কোণে শ্রীমতী কাফে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল, সেটুকু প্রকৃতপক্ষে বর্তমান উপন্যাসের কিঞ্চিৎ গল্পাংশ। বাংলাদেশের চলতি-প্রথানুযায়ী ওটা একটা শারদীয়-কীর্তি হিসাবে গণ্য করলে ত্রুটি হবে না আশা করি।

বইটি প্রকাশে বিলম্বের দরুণ বন্ধুমহলে অনেক কৈফিয়ত দিয়েছি, এবার তার নিরসন হ'ল।

লেখক

অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

সময়টা উনিশ শো বাইশ সালের বসন্তকালের শেষ দিক। সারা দেশটা যেন একটা বিরাট ছাইয়ের ভস্মস্তূপ হয়ে আছে। ছাইয়ের স্তূপটা বিলিতি কাপড়ের। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, জাতীয় আন্দোলনের নিভানো চিতার ছাই প্রদেশ জেলায় ছড়িয়ে যেন একটা ধূসর আবছায়ায় ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। বোঝা যায় না সেই ভস্মস্তূপের তলায় আগুন চাপা প'ড়ে আছে কিনা। আর জায়গায় জায়গায় লেগে আছে রক্তের দাগ। নতুন যুগের সূচনায় যে সমস্ত বিচিত্র ও অসম্ভব ঘটনা গত কয়েক বছর দেশে ঘটে গিয়েছে, বুঝি সেটা একটা স্বপ্ন মাত্র। অবুঝ কাঁচা মেয়েটাকে কে যেন তেপান্তরের মাঝে ফেলে পালিয়েছে। স্তব্ধ হয়েছে নূপুর ও বাঁশীর সুর শব্দ। চৈত্রের পাগল হাওয়ায় এক অসহ্য গোম্‌রানি ছড়িয়ে পড়ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

নতুন রাগিণী ও তান ধরে দিয়ে গিয়েছে বর্দৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। একমাত্র ব্যক্তির নেতৃত্বে সারা দেশ আচ্ছন্ন। তিনি গান্ধীজী, যাঁর অঙ্গুলিসংকেতের জন্য সমস্ত দেশ প্রতীক্ষা ক'রে আছে। তিনি আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিলেন। দেখলেন, যাকে তিনি জাগাতে যাচ্ছেন সে একটা সুপ্ত হিংস্র সিংহ। অহিংসা বোঝে না সে।

কিন্তু বর্দৌলির রাগিণী যেন বিয়েবাসরের হাসি কলরবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিষাদ নিয়ে চেপে বসল। তার সঙ্গে ওই অসহ্য গোম্‌রানিটা একটা বেসুরো শব্দে ভরে রাখল আকাশটা।

বারাসত মহকুমা কোর্ট। কোর্ট মহকুমা হাকিমের। তিন মহলা কোর্ট। অর্থাৎ তিন টুকরো একতলা বাড়ী। বিচার চলে তিন ঘরে। এক নম্বরে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট, দু'নম্বরে এক অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, তিন নম্বরটা উভয়ের। একদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পুলিশ বিভাগ, মহকুমা হাজত। কোর্ট প্রাঙ্গণের একপাশে বার লাইব্রেরী। সেখানে চোগা চাপকান পরা উকীল মোক্তারবাবুর দল ঝিমুচ্ছেন, দু'একজন কথাবার্তায় ব্যস্ত নয় তো নথি ঘাঁটছেন চোখে চশমা এঁটে। ডাকসাইটে মোক্তার নলিনীবাবু যথাপূর্বং তাঁর চোপসানো গালে খোলো হুঁকোয় সশব্দে চুমু খাচ্ছেন আর নড়বড়ে দাঁতে চিবুচ্ছেন পান।

হাকিমের লাঞ্চটাইম প্রায় উত্‌রোয়। তবু কোর্ট প্রাঙ্গণটা যেন ঝিমুচ্ছে এখনো।

কোর্টের একপাশ দিয়ে গুম্ গুম্ ক'রে বেরিয়ে গেল আপ-এর বনগাঁ লোকাল ট্রেন। আর একদিকে সুদূর নির্জন যশোর রোডটা গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে। চৈত্রের এলোমেলো হাওয়ায় দুলছে শাল শিমুল ও কৃষ্ণচূড়ার মাথা। ডালে ডালে থোকা থোকা লাল ফুল বাতাসের ঘায়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে আগুনের শিখার মত। তারই নিখুঁত ছায়া মাটির বুকে নাচছে যেন দল বাঁধা বুনো মেয়েরা। আচমকা নোনা হাওয়ার ঝোড়ো শব্দ যেন বেদনার্ত পৃথিবীর দমকা নিঃশ্বাস। তার সঙ্গে রাশি রাশি ধুলো উড়ে বিব্রত ক'রে দিচ্ছে মানুষকে। হঠাৎ শুকনো পাতা উড়ে গিয়ে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, বুঝি সে বাতাসের ব্যাকুল চিঠি। কয়েদী ঠাসা হাজত ঘরটার পাশে একটা গাছে পাখী ডাকছে কুহু! কুহু!

কোর্ট ঝিমুচ্ছে। আছে গুল্‌তানি, কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা, বাদী আসামী সাক্ষীর ভিড়। তবু যেন ঝিমুচ্ছে। মুহুরীদের কলম ধরা হাতে আঁটন নেই। তেলে ভাজা খাবারের দোকান ও হোটেলগুলোর টুলে খদ্দেরেরা খেয়ে নিয়ে জিরুচ্ছে। রাস্তার একপাশে কয়েকটা গরুর গাড়ী, আর একপাশে ঘোড়া-গাড়ী কাতার দেওয়া রয়েছে ডজন খানেক। ঝিমুচ্ছে জানোয়ারগুলো

এবং তাদের প্রভুরা। গরুর গাড়ীর ছইয়ের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়েছে নথ নোলক পরা সম্পন্ন গেরস্ত বউ। হয় তো বাদী নয় তো আসামী। কৌতূহল ভ'রে দেখছে বিচারালয়, নিজের অজান্তে হাসি নিয়ে দেখছে হাজতের বারান্দায় দড়িবাঁধা আসামীদের। সেদিকে তাকিয়ে পরস্পর হাসাহাসি ক'রছে গেঁয়ো, আধা গেঁয়ো লোকগুলো।

হোটেলের পেছন দ্বার দিয়ে বেরিয়ে একটা বেড়াল অসঙ্কোচে ঘুমন্ত পেয়াদার নাকের উপর দিয়ে এক নম্বর আদালতের হাকিমের চেয়ারে গিয়ে গুটিসুটি বসল। এই কোর্টের, ওই চেয়ারের এক কালের হাকিমের তেল-রং ছবি টাঙ্গানো দেয়ালে, বঙ্কিম চাটুয্যের মুখে বুঝি চকিতে ঝিলিক দিয়ে গেল হাসি। মনে পড়ে গেল নাকি কমলাকান্তের মার্জার প্রসঙ্গ।

ঝিমুনি কাটছে না। আমের বোলের সঙ্গে বে-আইনী চোলাই করা মদের গুদাম থেকে একটা তীব্র মদিরা-গন্ধ যেন মানুষ ও জানোয়ার সবাইকে নেশাচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে। যশোর রোডের দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গানের স্তিমিত সুর।

ঝিমুনি সর্বত্র। সারা দেশে। গত সালে মামলার সংখ্যা আশাতীত কম। অনেকগুলো মামলা বাদী আসামীর অনুপস্থিতি বা ইচ্ছানুক্রমে কোর্ট খারিজ ক'রে দিয়েছেন। লোকে বিবাদ বিসম্বাদ একটা বছরের জন্য যেন প্রায় ভুলতে বসেছিল। অবশ্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার কথা বলছি। তবুও সরকারের আইন শৃঙ্খলা বিভাগ গত বছরে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পায়নি।

তারই একটার রেশ এখনো রয়েছে যেন সুরের মাঝে ছেঁড়া তারের গোঙ্গানির মত। এ চৈত্র আকাশটার মত উদাস অথচ নীল, বেদনার বিলম্বিত সুরের মাঝে দমকা হাওয়ার বেতাল লয়!

ঢং করে বেলা একটার ঘণ্টা পড়ল। গড়াক্ গড়াক্ ক'রে এল হাকিমের গাড়ী। আড়মোড়া ভাঙ্গল কোর্ট। হুজুরে সেলাম পড়ল এদিকে সেদিকে, প্রত্যুত্তর চোখের ইসারায়। সময় বুঝে উকীলবাবুরা পেছন দিক দিয়ে হাত পাতলেন মক্কেলের কাছে, মুহুরী কলম চালাতে চালাতে সেদিকে নজর রাখল কড়া। গাছে গাছে পাখীগুলো তাড়া খায় লোকের মাথা নষ্ট হওয়ার ভয়ে। গরুর গাড়ীর ছইয়ের বাইরে দুই চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠেছে। এই হাকিম, মানে ম্যাজিস্টর অর্থাৎ কাজী!

বেড়ালটা পালাল নিঃশব্দে কাঠগড়ার তলা দিয়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কোর্ট বসতেই নাজিরের নির্দেশে পেয়াদা বাইরে এসে হাঁকল, মা'দেব হালদার হাজি-র! একবার দুবার নয় চার পাঁচবার গলা ফাটিয়ে ডাকা হল।

নলিনী মোক্তার লাফ দিয়ে উঠে হুঁকো হাতে ছুটে এলেন মুহুরীর কাছে। দেখলেন মহাদেব হালদার পাঁশুটে রং-এর সুতোর গলাবন্ধ কোটটা গায়ে দিয়ে, মোটা ছড়িগাছটি মাথার কাছে রেখে তখনো তন্দ্রাচ্ছন্ন। নলিনী প্রথমে খেঁকোলেন মুহুরীকে, 'কি রকম বে-আক্কেল হ্যা তুমি, ভদ্দলোককে ডাক দিতে পর্যন্ত পারনি?'

মুহুরী বলল, 'এঁজ্ঞে ডেকেছিলুম, উনি বিরক্ত হ'লেন।'

নলিনী বললেন, 'তোমার মাতা!' তাড়াতাড়ি ডাকলেন, 'কই হ্য মা'দেব ভায়া, ওদিকে ডাক পড়েছে য্যা।'

মহাদেব হালদার উঠলেন। গায়ে মাথায় দু' এক জায়গায় পাখীর বিষ্ঠা পড়েছে। সেসব দিকে কোন খেয়াল না ক'রে বললেন, 'কোন লাভ আছে নলিনীদা? জানার কি কিছু বাকি আছে? তবে?'

নলিনী বললেন, 'কী যে বল। আজকে মামলার রায় আর তুমি সুস্থ শরীরে কোর্টের উঠোনে বসে থাকবে?'

'কি হবে আর!' মহাদেব বললেন, 'বিশ্বেস করো, তোমার মোক্তারিতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। তবে ভাবছি, মামলাবাজ নামটা এবার ঘোচাব। এক ছিঁটে জমি নিয়ে অনেকদিন কাটল, আর নয়। এই মামলা ক'রে ক'রে কবে বউ ম'ল, ছেলে দুটো কতখানি হল কোন খোঁজ খবরই নিইনি। আজ থেকে—'

পেয়াদা আবার হাঁকল, 'মা'দেব হাল্‌দার হাজি—র!'

'হালদার মরেছে।' ব'লে হেসে উঠলেন মহাদেব।

নলিনী বললেন, 'না ভায়া, যেতে তোমাকে হবেই।'

মহাদেব ছড়িতে ভর্ দিয়ে উঠে ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ হাকিমের এজলাসের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'চল যাই। বীরপুরুষ তার পরাজয়ের সংবাদ নিজের কানেই শোনে। শুনেই আসি হাকিমের বক্তিমেটা।'

আধঘণ্টা বাদে হাকিম রায় দিচ্ছেন। মহাদেব তখন পকেট থেকে একটা আধুলী বের ক'রে পেয়াদার হাতে লুকিয়ে দিলেন। কাজটা অবশ্য কোর্ট অবমাননা করা। কিন্তু কোর্টেরও চোখ সময়ে সময়ে বুজে যায়। বললেন, 'ধর হে তাড়াতাড়ি। আমাকে আবার যেতে হবে।'

'এঁজ্ঞে আপনার রায় হচ্ছে যে।'

'আমার রায়?' হালদার নিঃশব্দে হেসে বললেন, 'এ সংসারে কার রায় কে দেয় হে।'

কথাটা এমনভাবে বললেন যে, হাকিমের বক্র বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিও চকিতে একবার হালদারকে খোঁচা মেরে গেল। জনকয়েক বাইরের লোক ছিল। তারা হাসল মুখ টিপে টিপে।

হালদারের এ মামলার আসামী হল এক সাহেব কোম্পানী। তাদের একজন আইরিশম্যান এঞ্জিনিয়ারও হাজির ছিল কোর্টে। সে খানিকটা বিস্মিত হ'য়েই তাকিয়েছিল কোম্পানীর এ জন্মশক্রটির দিকে! তার সঙ্গে ছিল তাদের কেরানী কান্ত চক্রবর্তী। সে স্পর্ধাটা দেখছিল হালদারের।

নাজির বলল গম্ভীর গলায়, 'আপনারা চুপ করুন।'

হাকিমের রায় পাঠ শেষ হল। রায়ে আদালতী ইংরেজী কথায় এ যাত্রা তার পরাজয় ঘোষণা হল। মহাদেব হালদার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

হালদার সুপুরুষ। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। গায়ের রংটা উজ্জ্বল শ্যাম। টানা টানা দুটো চোখে কিছুটা লালের আভাস। চাউনিটা তীব্র কিন্তু উদাস। পাঁশুটে বর্ণের বিশাল গোঁফের পাশে এমনি একটা বক্রতা ছিল যে, সাধারণের দ্বারা তাঁকে হঠাৎ ঘাঁটানো সম্ভব ছিল না। প্রশস্ত কপাল। মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মিলে একটা মসৃণ ধূসরতা দেখা দিয়েছে কিন্তু চুলের গোড়া যে শক্ত তা দেখলেই বোঝা যায়। এত থাকতে যেটা নিয়ে হালদারের চেহারার খ্যাতি, তা হল তাঁর খাঁড়ার মত বিরাট নাক। লোকে বলে, তার একপাশে দাঁড়ালে আর একপাশের সবটা ওই নাকটি আড়াল ক'রে রাখে। যেন একটা পাঁচিল। তাই পড়শীরা বলে, নেকো হালদার।

জয়ী পক্ষকে ঘিরে ধরেছে তাদের পাওনাদারেরা। পাওয়ানা বখশিস ইনাম অনেক কিছু। হালদার দেখছিলেন নলিনী মোক্তার কোথায়। নলিনী মোক্তার হালদারের উনিশটি মামলার পরাজয়ের গ্লানি বহন করছেন, কোনদিন তিনি জেতাতে পারেননি। তাই আজ তিনি হুঁকো সহ অন্তর্ধান করেছেন।

সে চক্ষুলজ্জা যার বিন্দুমাত্র ছিল না সে হল মুহুরী। সে বলল, 'চললেন হালদার মশাই?'
হালদার বললেন, 'চলব তো তোমার বাবু কোথায়?'
মাথা চুলকে বলল মুহুরী, 'এঁজ্ঞে তিনি বোধ করি পাইখানায় গেছেন।'
'এমন অসময়ে?' বলে হালদার তাঁর সেই চোখে সঙ্কুচিত মুহুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেই হুঁকো নিয়েই গেছে বুঝি। তোমার বাবুকে ওটা একটু গঙ্গাজলের ছিটা দিয়ে নিতে ব'ল। আর এই নেও, তোমার আর তোমার বাবুর পাওয়ানাটা।'
ব'লে কোটের পকেট থেকে টাকা বের ক'রে মুহুরীর হাতে দিয়ে হালদার ঘোড়ার গাড়ীর লাইনের কাছে এসে দাঁড়ালেন।
ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা চেঁচাচ্ছে, 'আইয়ে বাবু নীলগঞ্জ, বারিকপুর, টিটাগড়, খড়দা।' কেউ-বা চেঁচাচ্ছে, 'ইছাপুর, শ্যামনগর, ভাটপাড়া। বলদ ও ঘোড়া-গাড়ী ছাড়া এখান থেকে যাওয়ার আর কোন যানবাহন নেই। ট্রেনে দমদম জংশন হ'য়ে যদি উজানে আবার উত্তরদিকে পিছু হটতে হয়, সে বড় ঘুরপথ ; সেইজন্য বিশেষ করে উত্তরদিকের লোকেরা সাধারণত চারজন ক'রে শেয়ারে ঘোড়া-গাড়ী ভাড়া করে বারাকপুর ষ্টেশন হ'য়ে যায়। চারজন অবশ্য আইনত, বে-আইনে জনা বারোও হয়।
হালদার সাধারণত শেয়ারে গিয়ে থাকেন আর গাড়োয়ানরাও তাকে বিলক্ষণ চেনে। কিন্তু হালদার আজ স্থির করলেন, ভাগাভাগি থাক, এ দিনটাতে একলা যাওয়াই ভাল। কেননা, শেয়ারে যারা যায়, তারা সকলেই জানে উনি একজন মামলাবাজ শুধু নন, ফেরেববাজও বটেন। শলাপরামর্শ ও উপদেশ দিতে যেমনি ওস্তাদ, তেমনি সেটা কার্যকরী। অনেকে তাঁর পরামর্শে ও উপদেশে বিলক্ষণ লাভবান হয়েছে। কেবল নিজের জীবনে এ মামলা সংগ্রামে কোনদিন জয়তিলক পাননি। আজ আর ওইসব পরামর্শপ্রার্থীদের বাহবা, গুলতানি কিছুতেই ভাল লাগছে না।
এই কোর্টের পানবিড়িওয়ালা থেকে সুরু ক'রে সবাই হালদারকে চেনে। কিন্তু হালদার আজ আর কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন না। বাড়ী ফিরে যাওয়ার একটা তাগিদ তাঁকে ভিতরে ভিতরে ব্যস্ত করে তুলছে।
কোর্টের কাজ যেমন তেমনি চলতে লাগল। সারা মহকুমা থেকে এখানে নিত্য নতুন লোকের আনাগোনা। একদিন ছিল প্রায় সারা জেলার তীর্থক্ষেত্র। বারাকপুর কোর্ট হয়ে এখানকার তেজ সম্প্রতি কিছু কম হয়েছে। এখানে লোক ও রকমের ভাবনা নেই। তাই হালদারের বিদায়ে এখানে কারুর কিছু যায় আসে না।
তবু হালদার একবার ফিরে তাকালেন। কিছুই নতুন নয়। তবু হাইকোর্টের চেয়ে মফস্বলের এসব কোর্টের প্রতি তাঁর একটা মমতা ছিল। তাঁকে ঘুরতে হয়েছে নগর ও উপকণ্ঠের সব বিচারালয়েই। কিন্তু এসব জায়গায় তাঁর একটা ঘরোয়া মজলিসী ভাব ছিল।
ফটকের মাথায় সিংহ ওৎ পেতে রয়েছে। তার মাথায় টকটকে লাল কৃষ্ণচূড়া হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে যেন বিক্ষুব্ধ অগ্নিশিখার মত সিংহকে পুড়িয়ে দিতে চাইছে। চালচুলোহীন বাউলটার মত কাঁটা ভরা ন্যাড়া শিমুলের সর্বাঙ্গে অনল-সাজ।
কিন্তু বিশ্ব সংসারটা ঝিমুচ্ছে। মাতালের মত। ঘুঘু ডাকছে কোন নির্জন ঝোপে। সব অলস, মন্থর। তার মাঝে টুনটুনির চিড়িক পিড়িক যেন ছেলেমানুষের লুকোচুরি খেলা।
হালদার গাড়ীতে উঠলেন।

গাড়ী পশ্চিমের খোয়া বাঁধানো রাস্তা ধরে চলল ঘ্যাগর ঘ্যাগর করে। হালদার ঘোড়া দুটোর দিকে তাকিয়েছিলেন বাইরের দিকে মাথা হেলিয়ে। ঘোড়া দুটোর পরস্পরের বনিবনা নেই বোঝা গেল। এ ওকে খোঁকাচ্ছে, ও একে। হালদার ভাবলেন, কি বা ওদের বিবাদ, কে বা করবে বিচার। মামলা হাজির করা তো ওদের দ্বারা সম্ভব নয়। জানোয়ারে আর মোকদ্দমার কি বোঝে। ওরা যেটা বোঝে, সেটা গাড়োয়ান হাকিমের চাবুক।

জানোয়ারের মামলাতত্ত্ব থেকে কখন তাঁর মনে ভর করেছে তাঁর স্ত্রী-হীন সংসার ও ছেলেদের কথা তা বোধ করি নিজেরও খেয়াল নেই। সে চিন্তাও আজ এসেছে নিজের দারুণ অসহায়তার কথা ভেবেই। উপরের হাজারো নির্লিপ্ততার মধ্যে বুকের ভেতরে যেন একটা চাকা ঘুরছে লক্ষ মাইল বেগে। সেই চাকাটাকে যেমন বোঝা যায় না সেটা ঘুরছে কিনা, তাঁর উপরের শান্তভাব খানিকটা তাই।

বসতবাড়ীটি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। আজ যে জমির উপর সাহেবরা কারখানা করেছে, সেখানেই অনেকের সঙ্গে তাঁরও খানিকটা জমি ছিল। কিন্তু, গোঁ ধরে বসেছিলেন, সে জমি তিনি ছাড়বেন না। কোম্পানীকে কম বেগ পেতে হয়নি। তাদের অনেকখানি কাজ বাকী পড়েছিল। প্রতিশোধ নিতে তারাও ছাড়বে না। আগে যে দামে তারা সেধেছিল, আজ তার থেকে কম দেবে। বিশেষ ওই কান্ত চক্রবর্তীর মত লোক যখন কোম্পানীর সহায়। লোকটা বোধকরি নেকো হালদারের নাকেও দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে। তা ছাড়া কানাই মুখুজ্জের মত জমিদার কোম্পানীর বন্ধু।

কিন্তু কথা সেখানে নয়। যে টাকা তিনি পাবেন কোম্পানীর কাছ থেকে সে টাকাও মামলার দেনা শোধ করতেই যাবে। যে পকেট থেকে তিনি আজ নলিনী মোক্তারকে টাকা দিয়ে এসেছেন, সে পকেট শেষবারের মত শূন্য হতে বসেছে। কী ভাগ্য মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন, স্ত্রীর শ্রাদ্ধটাও করেছেন নিজে। যারা বাকি আছে, তাঁর দুই ছেলে। বড় নারায়ণ, ছোট ভজন। দু'জনেই শিক্ষিত। কিন্তু নারায়ণ একরকমভাবে সংসারের মায়া ছাড়িয়েছে। এ দুর্ভাগা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছে সে। মাসখানেক হ'ল সে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। একমাত্র ভরসা ছিল ভজন। কিন্তু ভজন অত্যন্ত উন্নাসিক, দুর্বিনীত। বিশেষ, বাপের সঙ্গে তার একটা ঘোরতর বিরোধ। সে বিরোধ মহাদেব হালদারের সংসারের বিমুখতা। তা'ছাড়া অত্যধিক সুরাসক্তিতে তিনি নিমজ্জমান। অর্থাৎ, এ সংসারের দিকে তিনি কোনদিন ফিরে তাকাননি উপরন্তু যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন, সেটা একটা অন্ধকার অতল গর্ভের খাদের ধারে। অথচ ভজন চাকরি করবে না।

তবু হালদারের অন্ধকার চোখে শেষ পর্যন্ত ভেসে উঠল ভজনের দোকান। বাড়ীর সামনেই সামান্য জায়গায় ছিটেবেড়ার ঘরে ভজনের চায়ের দোকান। আজ ডোববার মুহূর্তে সেটা যেন মুমূর্ষুর তৃণকুটার মত মনে হল। শেষ হবার আগে একবার বুঝি পা ঠেকাবার এক চিমটি মাটির আভাস রয়েছে জলে।

গাড়ী বারাকপুরের রেল ক্রসিং পেরিয়ে বাঁয়ে ষ্টেশনের দিকে মোড় নিল। অস্তমিত সূর্যের আভা পড়েছে হালদারের চিন্তাক্রান্ত মুখে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তাঁর কপালে। গাড়োয়ানকে বললেন, 'নন্দীর দোকানে চল।'

গাড়ী আবার বাঁক নিল পশ্চিমে চার্ণক ফাঁড়ির পাশ দিয়ে।

চকিতে একবার মনে উদয় হল হালদারের, ভজনকে কোনরকমে যদি একবার মামলা মোকদ্দমার দিকে ঝোঁকাতে পারেন, তাহলে এখনো গোটা তিনেক মামলা হাইকোর্টে আপীল করার সুযোগ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া এমন কতকগুলো জমি তাঁর সন্ধানে আশেপাশে ছিল, যেগুলো একটু চড়কো হ'লেই ভজন নিজের কুক্ষিগত করতে পারে।

কিন্তু বড় শক্ত ঘাঁটি। দু'পয়সা কাপ চা বিক্রি করবে সে, তবু এসব দিকে ভিড়বে না। এক কথা, তাকে বিয়ে দিয়ে যদি তার বউয়ের মারফত তাকে ঘোরানো যায়। ওই শ্রীপাদপদ্মে অনেক বীরপুরুষ তাদের উঁচু মাথা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েন।

রাস্তার দু'পাশের ঝাউ ও দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে থেকে থেকে হঠাৎ অস্তোন্মুখ ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কোনদিন তো তাঁকে বাঁধতে পারেনি। তিনি নিজের বেগে দুর্বার আর সে রূপসী কন্যা পেড়ে শাড়ী পরে পায়ে আলতা দিয়ে রক্ত-রেখায়িত ঠোঁটে টিপে টিপে হেসেছে ঘরের কোণে বসে। কেন? হয়তো নিজের কাছে সে ছিল অপরাজিতা। সেই হাসির মতই ডঙ্কা মেরে সে পরম ঔদাস্যে বিদায় নিয়েছে।

হালদারের প্রৌঢ় বুকের মধ্যে হঠাৎ কিসের বান ডেকে উঠল, নড়ে উঠল ঠোঁট। আমি কার কাছে থাকব, কে আমাকে দেখবে? কোনদিন যাদের মুখ চাইনি, আজ তাদেরই কাছে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে দাঁড়াতে হবে। আমি করুণার পাত্র হতে চলেছি এক মুঠো ভাত আর এক ঘটি জলের জন্য। তোমার সেই দুর্জয় হাসিই যে অক্ষয় হ'য়ে রইল আমার জীবনে!

হু হু করে দুরন্ত বেগে ছুটে এল দক্ষিণ হাওয়া। যেন ভেঙ্গে পড়ল বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ, নোনা জল। তপ্ত।

গাড়ী এসে দাঁড়াল নন্দীর 'ফরেন লিকার সপের' সামনে।

গোধূলীর ঝিকিমিকি বেলা। চিক চিক করে উঠল আকাশে দুটো তারা। হালদার বেরিয়ে এলেন নন্দীর দোকান থেকে। গাড়ী চলল ষ্টেশনের দিকে। তারপর উত্তরে।

তবু অবসাদ কাটতে চায় না। ঝিমুনি যেন বসেছে মৌরসী পাট্টা নিয়ে।

বড় রাস্তার পশ্চিম ধারে কেরোসিন টিন পাতের মরচে পড়া চালা আর পোকা ধরা ছিটেবেড়ার হেলে পড়া ঘর। তাকে আবার দুভাগে ভাগ করা। সামনের দিকে কেরোসিন কাঠের টেবিল, আর উনুন। উনুনে চা-এর কেট্‌লি। টেবিলে কাপ আর গেলাস। বাইরে খান দু'য়েক বেঞ্চি পাতা। সেখানে বসে চা খাচ্ছে কয়েকজন মিস্তিরি শ্রেণীর লোক।

টেবিলের উপরে একটা সাবেক কালের দেয়ালবাতি। মসজিদের লম্বা গম্বুজের মত তার চিমনিটা কালি প'ড়ে প'ড়ে কালো হয়ে উঠেছে। ঘরে কেউ নেই। পার্টিশনের আড়ালে কেউ আছে কিনা কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ঘরের বাইরে দরজার পাশে একটা ব্ল্যাকবোর্ডে মস্ত বড় ক'রে খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে চা। ছোট অক্ষরে, এক কাপ দুই পয়সা। দু' পয়সা আবার দুটো গোল বৃত্ত এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। রসুন পেঁয়াজের একটা হাল্‌কা গন্ধে বোঝা যাচ্ছে, ওই জাতীয় খাবারও এখানে কিছু বিক্রি হয়। তার আর একটা নিদর্শন, দোকানটার সামনে অনেকগুলো শালপাতা ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো চেটে চেটে বেড়াচ্ছে একটা কুকুর।

রাস্তাটা খোয়া বাঁধানো, কাঁকর বিছানো। দক্ষিণ দিক থেকে সোজা এসে হঠাৎ বাঁক নিয়ে

উত্তরে চলে গিয়েছে। একচোখো ভূতের মত দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে কেরোসিন ল্যাম্প-পোষ্ট। রাত্রি প্রায় আটটা, কিন্তু রাস্তাটা এর মধ্যেই খালি হ'য়ে এসেছে।

একটা মস্ত ছায়া ফেলে এসে দাঁড়ালেন সেখানে হালদার। বেঞ্চির লোকগুলোকে একবার দেখলেন ঘোলাটে চোখে। দুলে উঠলেন বারকয়েক। লোকগুলো এক মুহূর্ত অবাক হয়ে থেকে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে হাসল। মা'দেব হালদার মদ খেয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন এটাই তাদের হাসির কারণ।

হালদার ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে লোহার চেয়ারটায় বসে কোটের ঝোলা পকেট থেকে বার করলেন বাইশ আউন্স বোতলের প্রায় খালি করা স্কচ্ হুইস্কির বোতলটা। তারপর এ তা হাঁটকে বের করলেন ঘুগনি ও চপের ভাণ্ড। বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলে কোনদিকে দৃকপাত না করে সেই খাবার খেতে আরম্ভ করলেন।

সেই মুহূর্তে আবির্ভাব ভজনের। হালদার মশায়ের ছোট ছেলে। ছেলে নয়, যেন একটা জীবন্ত শানিত ইস্পাতের তলোয়ার। গায়ের রংটা উৎকট ফর্সা, ধবধবে। ঠোঁট দুটো রক্তাভ। খাড়া নাকটা তার উন্নাসিক চরিত্রের সাক্ষীর মতন, চোখ দুটো টানা টানা কিন্তু কটা মণি দুটোতে একটা অদ্ভুত ধকধকানি। একহারা, লম্বা, সটান একটু বেশী। সামনে পেছনে কোথাও সামান্য ঝোঁকতা নেই। আর মাজা ঘষা ফিটফাটভাব তার সর্বাঙ্গে বিরাজ করছে। দু'এক বছর হ'ল বি. এ. পাশ করে বেরিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের ছেলে। এ যুগে এতখানি লেখাপড়া শিখে সরকারী দপ্তরে একটা সদ্‌গতি হতে পারত তার। কিন্তু সেদিক থেকে তার নিজের প্রচণ্ড আপত্তি। তা'ছাড়া, তাদের পরিবারে একটা সরকার-বিরোধী ছাপ একা নারায়ণ হালদারের জন্যই যেন গভীরভাবে এঁকে রেখে গিয়েছে। সেসবে ভজন বিচলিত নয়। এখানকার কোন চটকল বা অন্য কোন বেসরকারী কারবারে তার চাকরি হতে পারত। কিন্তু জবাব তার একটাই ছিল, ওসব ছ্যাঁচড়া কাজের জন্য ভজন জন্মায়নি। কিন্তু টাকাও নেই যে, কোন একটা কারবার ফেঁদে বসবে। অতএব এই চায়ের দোকান।

ঘরে ঢুকে সামনেই বাবার কীর্তি দেখে ভজুর মুখটা যেন আগুনের মত দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল। সে কিছু একটা বলবার উদ্যোগ করতেই হালদার প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভজুর উপর। তার হাত ধরে বলে উঠলেন, 'রাগ করিস্‌নে ভজু। আমার ছেলে তুই, তোর চাটের দোকান। আর কোথায় যাব আমি?'

তাতে ভজুর রাগের চেয়ে লজ্জার মাত্রা বেড়ে গেল। বাবার গলা শুনে থম্‌কে গেল সে। ঠিক বুঝতে পারল না, মামলাবাজ উদ্ধত লোকটা সত্যি আজ এতখানি নেমে এসেছে কিনা। জীবনে এই প্রথম যে তার ছেলের কাছে এসে কোথাও না যেতে পারার অক্ষমতা স্বীকার করছে, সে দম্ভী, বক্রভাষী নেকো হালদার।

'আমি হয়তো মরে যাব।' হালদারের মোটা গলায় কথাটা শোনাল যেন কান্নার মত। অন্তত ভজুর তাই মনে হল। তিনি জড়ানো গলায় টেনে টেনে বলে চললেন, 'তবু তোদের আমি মানুষ করেছি, তোদের বাবা আমি। যতদিন বেঁচে থাকব—'

ভজুর একটু মায়া হল। সে বলল, 'তুমি বাড়ী যাও। তোমাকে কিছু বলতে হবে না।'

'হবে।' হালদার দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন সোজা হয়ে। বললেন, 'শুনেছি নারাণ বে' করবে না। কিন্তু তোকে করতে হবে, তোকে সংসার করতে হবে। আমি তোর বড়লোক শ্বশুর ক'রে দেব, তুই কারবার করবি। বল্, অমত করবিনে?'

ভজু অবাক হয়ে তার বাবার মুখের দিকে তাকাল। হালদারের রক্তবর্ণ চোখে আশা নিরাশার দোলা। সারা মুখটা যেন তার মত্ততায় আরও বড় হয়ে উঠেছে। গোঁফের পাশে সকলের হৃদয়বিদ্ধকারী রেখাটা যেন ক্রন্দনোন্মুখ হৃদয়ের ঢেউমাত্র। উৎকণ্ঠা, দীনতা করুণা ভরা মুখ।

ঘটনাটা শুধু অভাবিত এবং চমকপ্রদই নয়, ভজুর বুকের কোন্‌খানটায় যেন বারেবারে মোচড় দিয়ে উঠল। বাবার প্রতি যে তার মমতা খানিকটা আছে, তা এমন করে আর কোনদিন সে বুঝতে পারেনি। বলল, 'সেসব কথা তো পরেও হতে পারবে। মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে তোমার মনটা হয়তো খারাপ আছে। তুমি এখন ঘরে যাও।'

হালদার আর কোন কথা না বলে ভজুর হাত ছেড়ে দিলেন। গোড়াহীন গাছের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আরও কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু না পারার যন্ত্রণাটা যেন চেপে বসেছে তাঁর মুখে। তারপরে হঠাৎ বললেন, 'তোর গায়ের রংটা তোর মায়ের মত, কিন্তু চেহারাটা আমার মতই। তুই একরোখা। তুই বুঝবি ঠিক আমার কথা। জানিস্'—

বলে আবার তিনি ভজুর কাছে এলেন, 'এ সংসারে কাউকে বিশ্বেস করবিনে, তার জায়গা এটা নয়। দ্যাখ্, আমাদের এ গাঁয়ে কোন্ লোকটাকে তুই ভাল বলবি? কালো চাটুয্যের দিদি কালোকে খুন করতে চেয়েছিল নুকিয়ে। পয়সার জন্যে। আমাদের নারাণই তোকে কোনদিন ফাঁকি দিতে চাইবে।'

বলে গলার স্বর নামিয়ে বললেন ফিস্‌ফিস্ করে, 'খুব হুঁসিয়ার।' তারপর টলায়মান পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভজু সেই পথের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে ভাবল, কিসের ফাঁকি আর কেনই বা ফাঁকি। আমার কি আছে যে আমি হুঁসিয়ার হব। আবার তা-ও হুঁসিয়ার হতে হবে কিনা দাদার জন্য! মনটা তার লজ্জায় সঙ্কোচে ছিঃ ছিঃ করে চুপসে গিয়ে চকিতে আবার রাগে স্ফীত হয়ে উঠল। ঘৃণা জাগল বাবার প্রতি। লোকটা জীবনে কোনদিন কাউকে বিশ্বাস করেননি। শুধু তাই নয়, চুপিসারে কেউ-ই বলতে ছাড়ে না যে, তার বাবা জমিদারের নায়েবগিরি ক'রে এ বিশ্বসংসারে অনেককে অনাথ করেছেন। কিন্তু সে বঞ্চনার মুঠিভরা পয়সা তিনি কোনদিন রাখতে পারেননি। এক হাতে এনেছেন, অন্য হাতে তা বেরিয়ে গিয়েছে। ভজনের বিশ্বাস, দশজনের অভিশাপই তার কারণ। তবে একথাও সত্যি, চব্বিশ পরগণার উত্তর সীমান্তে তাদের এ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত অঞ্চলে পাড়ায় ঘরে নীচতা ও হীনতা যেন সীমাহীন। অর্থ ও যৌবনের লালসার নোংরা দাগ অনেক ঘরে গুপ্ত ছাপ রেখে গিয়েছে। হাজার বছর পূর্বে এরা স্বৈরতন্ত্রের রাজা ও পুরোহিত, সেকথা বাহ্যত ভুলে গেলেও নীল রক্তধারা তার কাজ এখনো স্তিমিত ধারায় তলে তলে চালিয়ে যাচ্ছে। তবু এখানেই যত সমাজ সামাজিকতার বন্ধন, এখানেই যত হাঁকা-হাঁকি ও গলাবাজী! ....এ সত্যের মত আর একটা সত্য, সুযোগের সদ্ব্যবহারও এরাই করেছে। আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে এরাই সকলের আগে। এ যুগে এদের বংশধরেরাই আবার প্রতিবাদ করেছে অন্ধকারে গোপন পাপের। অবশ্য এ সমাজের পরিত্যক্ত স্তরগুলোতেও এ সময়ে পম্পিয়াই নগরীর পশ্চাদ্‌পট সর্বনেশে বিসুবিয়াসের মত তলে তলে গোম্‌রাচ্ছে।

ভজনের জন্ম এ সমাজে। এখানে ঘরে বাইরে তার শ্রদ্ধা নেই কোথাও, বলা চলে একটা চির-অবিশ্বাসী। ওমর খৈয়ামের সেই উক্তিটা ভজনের তাই খুব প্রিয়, 'সে কোন্ এক মরুর

বুকে, অবিশ্বাসী থাকত সুখে।' এই নিরালার সুখই ভজনের কাম্য। তাই তার সমস্ত কিছুতেই এখানে অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা। তাই ব্যক্তি হিসাবে একমাত্র নারায়ণের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা, বুঝি নিজের প্রাণটাও তুচ্ছ কিন্তু নারায়ণের পথকে সে গ্রহণ করেনি! ওটা একটা বৃথা কাজ, পাথরের দেয়ালে অকারণ মাথা ঠোকা। যে কারণে সে সাধু হবে না, সে কারণেই সে হবে না বিপ্লবী। তাঁদের জন্য তোলা রইল তার নমস্কার।

এ সমাজের বুকে তাই সে ব্যতিক্রম নয়, একটা বিভ্রাট। যত অশ্রদ্ধা, তত তার দম্ভ। বিনয় হল ধাষ্টামো। ঘরে বাইরের দুর্বুদ্ধিতা তাকে যেন নিয়ত পোড়াচ্ছে। চরিত্রে যে তার প্রচণ্ড বেগ, তাতে সেই পোড়ানো যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও ঠাঁই নেই তার, নেই জীবনের নিরাপত্তা। তবে কাকে মানবে সে। তাই বুঝি আর সবকিছু ছেড়ে এ চায়ের দোকান। তাই সে ভজু নয়, লোকে বলে ভজুলাট।

তবু জীবনাকাশে ছিল একটি সূর্য, সে নারায়ণ। অনেক নক্ষত্র। সে তাঁর সঙ্গীরা। ওরা আর যা-ই হোক এ সমাজের নোংরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয়। জীবনটাকে পুতু পুতু করে ধরে রাখার জন্য মিথ্যা মায়াজাল ওরা রাখেনি ছড়িয়ে।

কিন্তু এ সমস্ত চিন্তা ছাড়িয়ে ভজুর মনে গুন্‌গুন্ করে উঠল নহবতের অনুরাগ ধ্বনি। আচমকাই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি মুখ। কিন্তু কি বিচিত্র, ক্ষণে ক্ষণে সে মুখ কত রূপে ভেসে উঠতে লাগল। এক দেহে সহস্র মুখ, একটা ছেড়ে আর একটা যেন হঠাৎ অস্থির করে তুলল তাকে। বাবার একটা কথায় মনের সুরটা বদলে দিয়ে গেল তার। বারবার মন বলল, সে কে, সে কে! বোঝা গেল, এমন চরিত্রের ভজুর মনটাও একটা খুব সাধারণ তারে বাঁধা রয়েছে, তাই বিয়ের কথায় মনের তলে এত উচ্ছ্বাস।

ভজু বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল। সে কবিতা লেখে। বলা চলে লিখত। নিয়মিত পাঠাত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায়। কিন্তু ছাপানো অক্ষরের জগৎটা ধরা দেয়নি কোনদিন। সেজন্য তার বিক্ষোভের অন্ত ছিল না। এখন সে কবিতা বলে মুখে মুখে। আজ তার মনে গুন্‌গুনিয়ে উঠল কবিতা।

কিন্তু বাধা পড়ল। বাইরের থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'একটু চা দিও গো বাবু।'

ভজু দেখল কয়েকজন এসেছে। সে তাড়াতাড়ি চা তৈরী করতে আরম্ভ করে জিজ্ঞেস করল, 'কে, বাঙ্গালী না কি রে? ক'জন আছিস?'

লোকটার নাম বাঙ্গালী। কাজ করে রেলওয়ে ইয়ার্ডে। ভজুর নিয়মিত খদ্দের। বলল, 'খান চারেক সাজো। আর ঘুগনি দিও এক প'সার ক'রে।'

'ঘুগ্‌নি নেই।' জবাব দিল ভজু। ছিল, তার বাবা সমস্তটাই প্রায় নষ্ট করে গিয়েছেন।

বাইরেও সেই আলোচনাই চলছিল। হালদার মশাইকে যারা দেখেছিল, তারাই বলাবলি করছিল, কিন্তু খুব সন্তর্পণে। যেন ভজু শুনতে না পায়।

কেবল বাঙ্গালীর কেশো মোটা গলায় শোনা গেল, 'কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি। খেটে খুটে এলুম, এট্টু ঠাউরের ঘুগ্‌নি খাব ব'লে। তা আর'—

বলে সে চুপ ক'রে গেল। বাঙ্গালী না হলে এমন ক'রে কথা বলা মুসকিল ছিল। কারণ ভজু যে শ্রেণীর গুণের কদর করত, সেরকম গুণের অধিকারী বটে বাঙ্গালী। বাঙ্গালী একরকমের উন্নাসিক। ছোট জাতের বড় চোপা। অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতের সীমায় নিজেকে বাঁধতে রাজী নয়।

এ পাড়ার তিলক ঠাকুর একদিন কি কারণে রাগ ক'রে তাকে বলেছিল, 'এ ছোট জাতের মানুষগুলোকে উঠতে বসতে খড়মপেটা করতে হয়।' যেমনি বলা, তেমনি বাঙ্গালী তিলক ঠাকুরকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে প্রথমে ছাড়িয়ে নিয়েছিল তার পায়ের খড়ম। হয়তো আছাড় মারত। কিন্তু তা' না ক'রে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বলেছিল, 'বল বাউন ঠাকুর, এবার তোমার খড়ম তোমার পিঠে ভাঙ্গলে কোন্ বেম্মা এসে রক্ষে করবে।'

বোধ করি তিলক ঠাকুরের বেম্মারও ক্ষমতা ছিল না সেকথার জবাব দেওয়া। ঘটনাটার সাক্ষী ছিল ভজু। সেইদিন থেকে বাঙ্গালীর সঙ্গে তার একরকম বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিল।

বাঙ্গালী আবার বলল, 'ঠাকুর ছিটেফোঁটা পেসাদও কি নেই?'

ভজু তাকিয়ে দেখল, ঘুগনি খানিক প'ড়ে আছে তখনো। বলল, 'ওই পেসাদের মত একটুখানি প'ড়ে আছে। বেচা যাবে না। খাস্ তো এমনি খা।'

বাঙ্গালী বলল, 'বাঁচালে ঠাকুর। খিদেয় পেট য্যানো হেদিয়ে পড়েছে।'

আর একজন বলে উঠল, 'প'সাটা আজ রইল গো বাবু।'

এক মুহূর্তের জন্য ভূজোড়া কুঁচকে উঠল ভজুর। বলল, 'হিসেবের বেলায় তো বল্‌বি, এত খেলাম কবে? হিসেব ক'রে খাস্।'

এমন সময় ঢং ঢং করে সামনের কারখানাটার পেটা ঘড়িতে ন'টা বাজল। চমকে উঠল ভজু। সবাইকে চা দিয়ে সে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এদিকে ওদিকে দেখল। শূন্য রাস্তা। ভেসে আসছে একটা রেল ইঞ্জিনের ঝুক ঝুক শব্দ সেইসঙ্গে থেকে থেকে 'হেইয়ো' ধ্বনি! অন্ধকার। দমকা হাওয়া। গাছ গাছালির ফাঁকে পুবে দেখা যায় একটা পুরনো দোতলা বাড়ী। আবছায়াতে ঘাপটি মেরে প'ড়ে আছে যেন একটা কিম্ভূতাকৃতি মস্ত জানোয়ার।

দোকানের পরে এক ফালি জমি, তারপরেই ভজুদের বাড়ী। রেলিং দেওয়া বারান্দা। কে যেন বারান্দায় রয়েছে দাঁড়িয়ে, রেলিং-এ ভর দিয়ে। রাস্তার স্তিমিত আলোর এক কণা বারান্দার এক কোণে এসে পড়েছে। সে আলোয় লক্ষ্য করা যায় একখানি ফর্সা হাত, নিখুঁত চিবুকের একটি পাশ। বাদ বাকি সবটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

দাঁড়িয়ে আছেন বকুল মা। ভজুর বকুল মা। তার মায়ের বকুলফুল ছিলেন তিনি। ভজু নারায়ণের পালিকা মা। এ গাঁয়েরই বউ, অল্পবয়সে বিধবা হ'য়েছেন। ভজুর মায়ের সঙ্গে শুধু তো সই পাতানো নয়, দুজনের জন্য দুজনের প্রাণ দুটো যেন হাওয়া-দোলা পদ্মপাতায় দু' ফোঁটা জল। এর জন্য ওর নিয়ত প্রাণ যায় যায়, গেল গেল। এ দুই রূপসীকে নিয়ে গাঁয়ে কথার অন্ত ছিল না। সেকথা ভাল মন্দ দুই-ই। সুন্দরী বলেই বুঝি ছিল লোকের অত ফিস্‌ফিস্ গুন্‌গুনানি।

একজন আজ স্বামীহারা, আর একজন স্বামী ছেড়ে গিয়েছেন। বকুল মা'র ছেলেমেয়ে হয়নি। সইয়ের মরণের পর তার নাবালক অপোগণ্ডদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেদিন বকুল মা। সেজন্য কত কথা। গাঁয়ে ঘরে, পথে ঘাটে কান পাতা দায়। কিন্তু হার মানবার পাত্রী ছিলেন না বকুল মা। লোকে তাঁকে মহাদেব হালদার নামের সঙ্গে যুক্ত করে কুৎসা রটিয়েছে। রটাক, কিন্তু সইয়ের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠল তো তাঁরই হাতে। আজও এ সংসারের হেঁসেল থেকে সুরু করে সবই তাঁর হাতে। তার উপরে, ভজুর দোকানের ঘুগ্‌নি চপ তিনিই তৈরী ক'রে দেন। আর আছেই বা কে, কাকে নিয়ে বা তাঁর থাকা।

একদিন সহস্র লজ্জায় ওই সুন্দর মুখ মহাদেব হালদারের সামনে খুলতে পারতেন না। সইয়ের বর যে! তা ছাড়া ভয়ও ছিল। হালদার মামলাবাজ, উদ্ধত। তা'ছাড়া অতবড় নাকটা যার, তার সঙ্গে মেয়েমানুষ কথা বলবে কি? সইকে বলতেন ঠাট্টা ক'রে, 'অতবড় নাকটাকে তুই সামলাস্ কি করে?' সইও ঠাট্টা করে জবাব দিতেন, 'সব পুরুষের তোলা নাকই তো আমাদের কাছে ভোঁতা লো।'

আজ আর নেই সে ঘোমটার লজ্জা, নেই ভয়। হালদার নিয়মিত ঘরে এসেছেন, খেয়েছেন, বকুলফুলকে দেখেছেন যেন সংসারেরই আর কেউ। টেরও পাননি ভাল করে, কি হারিয়েছে এ সংসারের।

বকুল মা'য়ের সম্পর্ক শুধু ছেলেদের সঙ্গে।

ভজু দেখল, বকুল মা দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো ভাবছেন, কখন খেতে আসবে ছেলে দুটো। খাওয়া হলে তিনি আবার বাড়ী যাবেন।

কে যেন আসছে উত্তর দিক থেকে। পেছনে আর একজন। আর একজন আসছে দক্ষিণ থেকে, কারখানা পাঁচিলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে। সকলেই এসে উঠল ভজুর চায়ের দোকানে।

ভজু আবার দোকানে এসে ঢুকল। কৃপাল আর হীরেন এসেছে। কৃপাল দত্ত আর হীরেন নিয়োগী। ভজুর বয়সী সকলে। আর এসেছে রথীন। সে সকলের চেয়ে বছর দুই তিনেকের ছোট। তার আজ অবধি ম্যাট্রিক পাশ করা আর হয়ে উঠল না। স্বদেশী নিয়ে মাতামাতি চলেছে তার গত দু'তিন বছর ধরে। সেইজন্য তাকে সবসময় বাড়ী থেকে লুকিয়ে বেরুতে হয়। কারুর সঙ্গে তার মেশামেশি সম্পূর্ণ বন্ধ। বিশেষ ভজুর চায়ের দোকান তো তার অভিভাবকেরা নিষিদ্ধ এলাকা বলে একটা লাইন টেনে দিয়েছেন এবং তারপরেও যখন তাকে এখানে দেখা গিয়েছে, তখন বাড়ীতে বেশ ভালরকম উত্তম নারায়ণের ব্যবস্থা হয়েছে। সেদিক থেকে কৃপাল হীরেন এরা এখন এ্যাডাল্ট। আধপোয়া নস্য ভরা কৌটো আর ন্যাকড়া পকেটে পুরে এরা সব সময়েই প্রায় বাইরে ঘুরে বেড়ায়। কলেজের ক্লাশের দুর্ভেদ্য বেড়া থেকে ওদের সরস্বতী ভারতমাতার দুর্জয় মূর্তি ধরে বার করে নিয়ে এসেছে। গত বছর ওরাও নারায়ণের সঙ্গে জেল খেটেছে। এরা সকলেই নারায়ণের বন্ধু ও শিষ্যস্থানীয়। তাছাড়া ভজুর যাকে বলে রেগুলার খদ্দের। তবে ভজুর বক্তব্য অনুযায়ী, হিসেব না জানা লোকের চেয়েও এদের হিসেবের গণ্ডগোল অনেক বেশী, ভজু বলে, 'সুরুতেই গণ্ডগোল, ভবিষ্যতে যে কানা হয়ে যাবি তোরা।'

কৃপাল তার নাকের ছোট ছোট ফুটো দিয়ে অবিশ্বাস্য রকমের একদলা নস্য পুরে দিয়ে বলল, 'কই হে ভজু, একটু দাও। চা লা হলে আর জব্‌ছে লা।'

নস্য নিলে কৃপাল ন, ম ইত্যাদি শব্দগুলো কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারে না।

ভজু ভাবছিল তার দাদার কথা। এতক্ষণে তো দাদার এসে পৌছুনো উচিত ছিল। সে চা তৈরী করতে গেল।

রথীন চঞ্চল, অস্থির। শুধু বয়স নয়, ওটা তার স্বভাব। চোখ দুটো যেন কিসের উন্মাদনায় প্রতি মুহূর্তে জ্বলছে। কৃপাল আর হীরেন যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত। কিছুটা নির্বিকার, শান্ত। তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যেটা ফুটে উঠেছে সেটা একটা স্বভাবসুলভ সর্দার প'ড়োভাব। এ অঞ্চলের জনসাধারণের শ্রদ্ধামাখা বিস্মিত চোখে নিজেদের তারা নিয়ত দেখে দেখে এমন

একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে তাদের হৃদয় বারবার স্ফীত হয়ে ওঠে, উন্নত মাথাটা আরও যেন উন্নত হয়ে ওঠে। সেজন্য একটা সঙ্কোচ ছিল, বোধ করি কৃতজ্ঞতা বোধও ছিল একটা। সেটা সচেতন মনের কিনা, বোঝা যায় না। কিন্তু তারা অনেক কিছু করবে, এমনি একটা আকাঙ্ক্ষা তাদের হৃদয়ে যেন ঠাসা রয়েছে।

বাঙ্গালী চা খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'নেও বাবু, এট্টু দেশের কথা-টথা শোনাও। তা' পরে বাড়ী যাই।'

এমনভাবে কথাটা বাঙ্গালী বলল যেন, দেশী প্রথাতে কেউ রামায়ণ মহাভারত শোনবার জন্য তৈরী হয়ে বসেছে। হীরেন নিয়োগী কিছুক্ষণ আগে থেকেই বাঙ্গালীর উপর খানিকটা রুষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গালী যে মদ খেয়ে এসেছে, তা সে আগেই টের পেয়েছে। সে বলল, 'দেখ বাঙ্গালী, দেশের কথা যদি শুনতে হয়, তবে তোমাকে পবিত্র হয়ে আসতে হবে। স্বরাজ তো তোমার আমার হাতে। শোননি সেই গল্প, শিকার করতে গিয়ে রাজা কাপালিকদের পাল্লায় পড়ে বলি হওয়ার জন্য যখন প্রাণের ভয়ে মুচ্ছো গেছেন, তখন দেখা গেল রাজার একটা আঙ্গুল নেই। অঙ্গহীনকে দিয়ে তো আর দেবতার পুজো হয় না। তেমনি আমাদেরও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র করতে হবে। গান্ধীজী তাদেরই পথ চেয়ে আছেন। আমাদের অঙ্গ আমাদের চরিত্র, তাতে খুঁত থাকলে আর ভারতমাতার পুজো হবে না।'

এ পর্যন্ত বলে হীরেন থামল। অন্ধকারে চৈত্র রাত যেন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কৃপাল চমৎকৃত, রথীনও প্রায় তাই। বাঙ্গালীর সঙ্গীরা নির্বোধের মত হাঁ করে তাকিয়ে রইল হীরেনের দিকে। ভজু একটু অবাক-ই হয়েছে হীরেনের বক্তৃতায়।

বাঙ্গালী বোকাটে মুখে বলল, 'চরিত্তি টরিত্তি কি বলছ বুঝলুমনি বাবু। মুখ্যু মান্‌ষের অনেক দোষ। একটু বুঝ্যে সুঝ্যে বল।'

হীরেন তীব্র চাপা গলায় বলে উঠল, 'তুমি মদ খেয়ে এসেছ বাঙ্গালী, তুমি পাপ করেছ। মদ খাওয়া তোমাকে ছাড়তে হবে।'

বাঙ্গালী আর তার সঙ্গীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করল এমনভাবে যেন, হঠাৎ এ আবার কোন্ দেশী কথা! বাঙ্গালী বলল, 'এই মেরেছে। শেষটায় সব ছেড়ে ছুড়ে তোমরা আমাদের পেছুতে লাগলে?'

অমনি কৃপাল কিছু একটা বলবার উদ্যোগ করতেই হীরেন বলে উঠল, 'তোমার লজ্জা করে না বাঙ্গালী একথা বলতে? ভেবেছ, মদ খেয়ে বদমাইসি ক'রে এ দেশ স্বাধীন করা যাবে। এই অনাচারের জন্যেই আজ আমরা পরাধীন'—

'বদমাসি কেন বলছ গো বাবু,' বাঙ্গালী বাধা দিয়ে বলে উঠল। 'আমরা কি বদমাইস? তত প'সাও নেই, সময়ও নেই। বাঙ্গালীর মদ খাওয়া অনাচার, তার চে' কতবড় অনাচার যে সংসারে নিত্যি ঘটছে! আর আমাদের শালা পেটে নেই দানা, মা'গের ঝাঁটা খেয়ে দু ফোঁটা মদ, তাও বলছ ছেড়ে দিতে? তা'লে আর হলনি বাপু।'

ব'লে বাঙ্গালী ও তার সঙ্গীরা উঠে দাঁড়াল। ঘৃণা ও করুণায় ভরে উঠল হীরেনের মন। সে বাঙ্গালীদের দিকে তাকিয়ে দেখল, আবছা অন্ধকারে একদল নিশাচর প্রেত যেন। যারা স্বাধীনতার মর্ম বোঝে না, ভাল বোঝে না, জীবনকে চেনে না, এমনকি ধর্ম জানে না, এরা সেই দেশবাসী। বুঝল, এদের দিয়ে কোনদিন কিছু হবে না, এদের পৈশাচিক প্রবৃত্তির ভয়েই গান্ধীজী

বারবার পেছিয়ে আসছেন। এরা নিজেরা কোনদিন কিছু করবে না, আমাদের সংযত আন্দোলনেরও অন্তরায়। হ্যাঁ, এই বিষকে আমাদেরই গ্রাস করতে হবে, এই জঞ্জালকে সরিয়ে আমাদেরই প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্বরাজ। এমনকি, আর কথা বলতে পর্যন্ত তার দ্বিধা হল বাঙ্গালীর সঙ্গে, নিজের অপমানের ভয়ে।

এত কথা ভাববার অবকাশ ছিল না বাঙ্গালীর। সে পকেট থেকে পয়সা বের ক'রে গুনে দেখে ভজুর হাতে দিল। চলে যাবার মুখে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'চললুম গো লেইগি বাবু, মনে কিছু করনি। আমাদের কথা মনে নিওনি।'

বলে তারা সকলে চলে গেল।

কৃপাল বলল, 'নারায়ণদা'র সঙ্গে বসে এ রোববারেই মদের দোকানে পিকিটিং-এর প্রস্তাবটা নিয়ে ফেল হীরেন।'

হীরেন যেন আশার আলো দেখতে পেল। বলল, 'ঠিক বলেছ। রথীন, কাল থেকেই তুমি স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা কর।'

তাদের এই কথার মাঝেই এলেন নারায়ণ হালদার। ভজুর দাদা। প্রায় ভজুর মতই তাকে দেখতে, তবে ভজুর মত তীব্রতা তার নেই। যে অস্থির বেগে ভজু চঞ্চল, তাকে যেন তিনি গ্রাস করে আত্মস্থ হয়েছেন। ধীর ও স্থির। চোখের মণি তার কটা নয়, কালো চোখে স্নিগ্ধতা। হৃদয়ের একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস যেন চাপা বেদনার মত লুকিয়ে আছে তার চোখে। তবুও সে চোখে একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা, দৃঢ়তা এবং বিক্ষুব্ধতা। ঠোঁটের কোণে একটা বিষণ্ণ হাসির আভাস সব সময় লেগেই আছে।

তিনি একলা আসেননি, সঙ্গে আর একটি লোক ছিল। লোকটার পরনে সাহেবী পোষাক, মাথার টুপিটা কপাল অবধি টেনে দেওয়া। তার তলায় দুটো চোখ আধো অন্ধকারে জ্বল্ জ্বল্ করছে, হাতে একটা মাঝারি সুটকেশ। লোকটি এক লহমায় দেখে নিল সবাইকে। নারায়ণ বললেন, চাপা গলায়, 'ভেতরে চলে যান।' ভজুকে বললেন একটু উঁচু গলায়, 'কই রে ভজু, আমাদের একটু চা টা দে।'

সবাই তাকিয়েছিল সেই আগন্তুকের দিকে। এই তা' হ'লে সেই লোক। যেন চকিতে এখানকার আবহাওয়া থমথমিয়ে উঠল, একটা বিভীষিকার ছায়া ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সকলেই সচকিত হয়ে উঠল, যেন মনে পড়ে গেল, তাদের সকলের আশেপাশে ছায়ার মত গুপ্ত শত্রুরা ওৎ পেতে আছে। সাবধান!

এ সময়টাতে এমনিতেই সারা দেশময় সরকারের দমন নীতির তাণ্ডব চলছে। 'স্বরাজ' 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি শব্দগুলো যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। ওই কথাগুলোই যেন একটা মূর্তিমান বিদ্রোহের মত ব্রিটিশ সিংহকে ভীত ও ক্ষিপ্ত ক'রে তুলছে। তার উপরে এই ঘটনা তো আরও সাংঘাতিক।

আগন্তুক ঘরের ভিতরে যেতে ভজু তাকে পার্টিশনের আড়ালে ভাঙ্গা চৌকিটা দেখিয়ে দিল বসবার জন্য। তারপর চা তৈরী করতে লেগে গেল এমনভাবে, যেন কিছুই হয়নি।

নীরব উত্তেজনায় রথীনের চোখ মুখ জ্বলে উঠেছে। কৃপাল হীরেনের উত্তেজনা ছিল কিন্তু তাদের নীরবতা যেন অস্বস্তিকর।

নারায়ণ বললেন, 'রথীন, ষ্টেশনের পাশ দিয়ে এক চক্কর ঘুরে এস! সন্দেহজনক কিছু মনে হলে, এসে সংবাদ দেবে।'

বোঝা গেল, এ নির্দেশ হতাশ করেছে রথীনকে। সে এখান থেকে যেতে চায়নি। এই মুহূর্তে যে রহস্যের ঢাকনা এখানে খোলা হবে, তা' সে দেখতে পাবে না। কিন্তু নারায়ণদা'র নির্দেশ। এ বিশ্বকে অবজ্ঞা করা যায়, কিন্তু ওঁর কাছে তো কোন কথা চলে না।

বাধ্য সৈনিকের মত উঠে একবার সেই পার্টিশনের দিকে তাকিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

বাইরে অন্ধকার। নিস্তব্ধ। কিন্তু একটা অশরীরী জীবন্ত সত্তা যেন ভর করেছে সর্বত্র। কেবল বকুল মা দাঁড়িয়ে আছেন তেমনি। যেন প্রস্তর মূর্তি, নিশ্চল।

নারায়ণ সেদিকে এগিয়ে গেল নিঃশব্দে। যেন আপন মনেই বললেন, চাপা গলায়, 'এসে পড়েছে।'

বকুল মায়ের শরীরটা একটুও নড়ল না। কেবল উৎকণ্ঠিত মিহি গলা ভেসে এল, 'একটু সাবধানে থাকিস বাবা।'

তারপর নারায়ণ ফিরে হীরেন ও কৃপালকে নিয়ে ঢুকলেন পার্টিশনের আড়ালে।

ভজু যেন এক বিচিত্র বিপজ্জনক খেলার দর্শক। উত্তেজনার ঢেউ লেগেছে তারও বুকে। সে যে অনর্গল চা তৈরী করেই চলেছে তা' যে কে খাবে কেউ জানে না। হয়তো ফেলে দেবে। কিন্তু একটা ঘোর লেগেছে তার। টেবিলের উপর বাতিটা একটু তেরছা করে দিতেই পার্টিশনের আড়ালে ছুটে গেল একটা রেশ। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি একটা গান গাইতে থাকব দাদা?'

অন্য সময় হলে নারায়ণ হাসতেন। এখন বললেন, 'তাতে শ্রোতার দল জুটতে পারে তো।'

তা' বটে। ভজু একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। সে ভ্রূ কুঁচকে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল। বোধ হয়, চিন্তায় পড়ল, এ সময়ে কি করা যায়।

আগন্তুক এবার তার সুটকেশের ঢাকনা খুলতেই একটা চাপা আফিমের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরটার মধ্যে। বোঝা গেল বে-আইনী আফিম রয়েছে তার মধ্যে। সুটকেশের উপরের প্যাকেটটা সরিয়ে আর একটা বের করে সে দিল নারায়ণের হাতে।

নারায়ণ সেই প্যাকেটটা খুলতে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল বিষধর কাল কেউটের মত চকচকে দুটো রিভলবার। ছ'ঘরা রিভলবার। একবার ঘোড়া টিপলে আর একটা গুলি মুখের কাছে এসে তৈরী হয়ে থাকে। চকিতে নারায়ণের শান্ত চোখজোড়া যেন দুখণ্ড অঙ্গারের মত জ্বলে উঠল। ঠোঁটের বিষণ্ণ হাসি বেঁকে উঠল নিষ্ঠুর হাসিতে। বুঝি শত্রুকে তিনি দেখতে পেয়েছেন।

কিন্তু কৃপাল বা হীরেন কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। বাংলায় যাকে বলে ভড়কানো। এ ব্যাপারটাতে তাদের একটা ভয় ও অস্বস্তির ভাব ঘিরে ধরেছে। জেল থেকে আসার পর অবশ্য তারা একটা নতুন আন্দোলনের কথা চিন্তা করছিল। ভেবেছিল নারায়ণই তাদের পথ দেখাবেন। কিন্তু নারায়ণ যে এ ভয়াবহ পথে মোড় নেবেন, এটা তারা ভাবতেই পারেনি। এই প্রথম হীরেন ও কৃপাল চোখের এত সামনে রিভলবার দেখছে। কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক জীবনে এ পথে আসার কথা তারা কোনদিন চিন্তাও করেনি।

আগন্তুক আর একটি প্যাকেট নারায়ণের হাতে দিল। সেটাতে ছিল কার্তুজ। তারপর দিল একখানা চিঠি। চিঠিটা সাদা কাগজের। আগুনের তাপে ধরলে কথাগুলি আপনিই ফুটে উঠবে।

আগন্তুক এবার তার টুপি খলল। দেখা গেল লোকটার চেহারা মোটেই এ দেশীয় নয়।

13466

চ্যাপ্টা নাক, ছোট ছোট চোখ। পলকহীন সাপের মত চোখ। ভাঙ্গা বাংলায় বলল, 'আমি কলকাতা যাব! মাল খালাস করবে।'

লোকটা আফিমের স্মাগলার। তার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই একমাত্র পয়সা রোজগার করা ছাড়া। সন্ত্রাসবাদীরা খুব সহজেই এদের পাল্লায় এসে পড়েছে অস্ত্রের জন্য। কারণ, পৃথিবীর সমস্ত সীমান্তে এদের আনাগোনা। সীমান্ত থেকে সীমান্তে টপকে গিয়েই এদের কাজ চালাতে হয়। অনবরত খুন জখমের রক্তাক্ত বীভৎস পথে এরা কারবার করে ফেরে। আফিম বহনের মতই অস্ত্রটাও বহন করে, লাভের অংশটা এতেও কিছু কম হয় না।

ভজু তাড়াতাড়ি আগন্তুককে এক গেলাস চা এগিয়ে দিল। আগন্তুক ইংরাজীতে বলল, 'ধন্যবাদ'।

নারায়ণ বললেন, 'আপনি আবার কবে আসবেন?'

সে জবাব দিল তার অদ্ভুত চাপা ও মোটা গলায়, 'অপটের টিরি মন্‌টস্‌।'

অর্থাৎ তিনমাস বাদে।

এই সময়ে রথীন ফিরে এসে জানাল, কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

আগন্তুক চা খেতে খেতে হঠাৎ জানাল, 'একটা আর্মানি পিস্তল, পিপটেন রূপী, বেরী চীপ। অপটের টিরি মন্‌টস্‌।'

অর্থাৎ তিনমাস বাদে সে একটা আর্মানি পিস্তল মাত্র পনর টাকায় দিয়ে যাবে।

তারপর বলল, 'বোট রেডি?'

নারায়ণ বললেন ইংরাজীতে, 'হ্যাঁ। যে পথে এসেছেন, সেই পথেই যাবেন। এখন জোয়ার লেগেছে, আপনি দু'ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছুতে পারবেন।'

লোকটা হাসল। তাতে নাক কুঁচকে চোখ জোড়া ঢেকে গেল। টুপি মাথায় দিয়ে বেরুবার মুখে ভজু হঠাৎ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'সাহেব, তোমার এ কাজে আমাকে নিয়ে নাও।'

সাহেব আবার হাসল। নাক চোখ কিছুই নেই, খালি এক পাটি দাঁতের একটা অদ্ভুত বুনো হাসি। তারপর যেমন এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে গেল। মুহূর্তে কোথায় হারিয়ে গেল দমকা হাওয়ার মত।

ভজু বলল, 'এবার তোমরা কাটো দাদা, দোকান বন্ধ করব।'

নারায়ণ বললেন, 'আর একটু ভাই, আমাদের কয়েকটা কথা আছে।'

এটা মাত্র শুধু ভজুর তাড়া দেওয়া। সে এ দলের কেউ নয়, আপত্তি করলে নারায়ণকে হয়তো সত্যি অন্য কোথাও আস্তানা গাড়তে হবে। কিন্তু ভজুর একটা অদ্ভুত কৌতূহলও ছিল সব কথা জানার ও শোনার। তা' ছাড়া, এইসব বিপজ্জনক কাজে দাদাকে সে আর কোথায় যেতে বলবে?

নারায়ণের সারা মুখে তখনো উত্তেজনার ছাপ। জীবনে তার নতুন সূর্যোদয় ঘটেছে, এক নতুন জগতে আজ তার প্রবেশ। বললেন, 'তোমাদের তিনজনকেই আজ ডেকেছি, তার কারণ এ ব্যাপারে সবাইকে এখুনি টেনে আনা ঠিক হবে না। তার আগে দাঁড়াও, চিঠিটা পড়ি। ভজু বাতিটা দে, একটু বাইরে লক্ষ্য রাখিস্‌।'

তারপর আলোর গায়ে চিঠিটা ধরতেই, ছোট ছোট পাঁশুটে বর্ণের কতকগুলো অক্ষর যেন কথা বলে উঠল,

বীর বিপ্লবী!

আপনাকে দুইটি রিভলবার পাঠাইলাম, সঙ্গে একশত কার্তুজ। ভবিষ্যতে আরও পাঠাইব, অস্ত্র সংগ্রহ চলিতেছে। ইতিপূর্বে আপনাকে দলের সব কথাই জানান হইয়াছে। যাহা পাঠাইলাম, তাহা দিয়া বিপ্লবীদের অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করিবেন। তৎপূর্বে অবশ্যই বিপ্লবী হইতে ইচ্ছুকদের দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। নিয়মাবলী আপনি জানেন। মনে রাখিবেন, আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় ও একমাত্র ব্রত হইল, এদেশের প্রতিটি ইংরাজের রক্তে এদেশের মাটি আমরা লাল করিয়া দিব। এদেশে যতদিন পর্যন্ত একটি ইংরাজও জীবিত থাকিবে, ততদিন আমাদের পিতা মাতা ভাই ভগ্নী গৃহ কিছুই নাই। আমরা মরিব, তবু দেশ শত্রুমুক্ত করিব। ভবিষ্যৎ নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষা করুন।

বন্দেমাতরম্! ইতি
দলের কেন্দ্রীয় কমিটি।

চিঠি পড়া শেষ হল কিন্তু নারায়ণের গম্ভীর গলার রেশ তখনো প্রতিধ্বনির মত গুন্‌গুন্ করছে। রথীন একটা লেলিহান আগুনের শিখার মত জ্বলছে। হীরেনও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সে উদ্দীপনা ফার্‌নেসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন তাত লাগে তেমনি। কৃপাল বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে আছে চিঠির দিকে।

ভজু এক কেটলি তৈরী ঠাণ্ডা চা হুড়হুড় করে নর্দমায় ফেলে দিয়ে বলল, 'লোকসানের বরাত। পয়সাটা তোমরা দিয়ে দিও দাদা।'

কিন্তু সেকথায় নারায়ণ কান দিলেন না। বললেন, 'তোমাদের সকলেরই দীক্ষা প্রায় শেষ। কিন্তু একটা বাকি আছে। ভয় কাটাতে হবে তোমাদের।'

সকলেই নারায়ণের দিকে ফিরে তাকাল। নারায়ণ হীরেন ও কৃপালের দিকে তাকিয়ে মনে মনে একবার হাসলেন। বুঝলেন, ওরা একটু ভয় পেয়েছে। ওদের সাহস যোগাবার জন্যই তিনি রথীনকে ডাকলেন 'রথী।'

রথীন সামনে এসে দাঁড়াল। বলিষ্ঠ মূর্তি, নিষ্পলক দৃঢ় চাউনি, টেপা ঠোঁট। সামান্য গোঁফ দেখা দিয়েছে তার ঠোঁটের উপরে।

নারায়ণ বললেন, 'তোমাকে আজ রাত্রি বারোটার পর একলা শ্মশানে যেতে হবে। যে চিতায় হরি-বুড়োকে পোড়ানো হ'য়েছিল, তার পাশে তোমার নামের প্রথম অক্ষর লিখে রেখে আসবে। পারবে?'

রথীনের টেপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে খালি বেরিয়ে এল, 'পারব দাদা।'

বলে সে নারায়ণকে প্রণাম করল। নারায়ণ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুটি হৃদয়ের ধুক ধুক শব্দ যেন তাদের গোপন কথা বিনিময় করল। নারায়ণের বিশাল কালো চোখ জোড়া কিসের আলোয় চক্‌চক্ করে উঠল। মনে মনে কাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, 'তোমার-ই হাতে রথীকে ছেড়ে দিলুম, ওকে তুমি রক্ষা ক'রো!'

ভজু মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার বুকটার মধ্যে কেন যেন বারবার মোচড় দিয়ে উঠছে। অকারণ বেদনায় বুকটা ভরে উঠছে তার। কেবলি কেন মনটা তার বারবার বলে উঠল, 'আমি একাকী, নিঃস্ব। স্নেহ, ভালবাসা আমার জন্য নেই এ সংসারে।'

তারপরে অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি সে উনুনের আগুন খুঁচিয়ে দিতে লাগল, ধুতে লাগল কাপ গেলাস।

নারায়ণ বললেন, 'হীরেন কৃপাল, তোমরাও প্রস্তুত থাক এ পরীক্ষার জন্য! তুমি যাও রথী। আমি গিয়ে ভোরবেলা দেখে আসব শ্মশানের চিহ্ন।'

হীরেনের আর মদের দোকানে পিকেটিং-এর কথা বলা হল না। সেটা মুলতবী রয়ে গেল কালকের জন্য।

বাইরে অন্ধকার। অন্ধকার আরও ভারী হয়েছে। পথের কেরোসিনের বাতি কোনটা নিভে গিয়েছে, কোনটা নিভু নিভু! তেল নেই। সারাদিন গিয়ে চৈত্র বাতাস এখন আরও মত্ত হ'য়ে উঠেছে। ক্রমাগত চেপে আসা এ অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে নিতে চাইছে তার পাগলা প্রাণ।

স্তিমিত শব্দ আসছে রেলওয়ে ইয়ার্ড থেকে সোঁ সোঁ করে। সেখানে ইঞ্জিনের এ শব্দ সারারাত্রি। শেয়ালের পাল ডাকছে গঙ্গার ধার থেকে। পাড়ার ভেতর থেকে ডেকে ডেকে উঠছে কুকুরেরা।

কোথা থেকে ডেকে উঠল আর্তস্বরে প্রাণভীত চৈত্র পাখী। হয় তো তাড়া ক'রছে কোন খাবার সন্ধানী বিষধর সাপ।

সমস্ত চরাচর ঘুমন্ত কিন্তু তবু যেন জাগ্রত। আকাশে বাতাসে যেন কিসের কোলাহল। ঘুম যেন ছলনা। এ রাত্রি যেন কোন সর্বনাশের ষড়যন্ত্রে মত্ত।

হুতোম প্যাঁচাটা ডাকছে কোথায় হুম্ হুম্ ক'রে যেন সে এ রাত্রির হক্‌দার সাক্ষী। গাছগুলো মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে বুঝি কথা বলছে পরস্পরে।

বকুল মা খেতে দিয়েছেন দুই ভাইকে। নারায়ণ আর ভজু। নারায়ণ খাচ্ছেন ধীরে। খাওয়ায় মন নেই, চিন্তাচ্ছন্ন। সমাহিত। শূন্য দৃষ্টি। বোঝা যায়, জীবনের গতিতে তার হৃদয়ের তাল মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। সুরে লয়ে বাজছে ঐকতান। আশপাশ নেই, পেছন নেই। সামনের অন্ধকার কাঁটা ভরা পথটাকে কেবল অতিক্রম করা।

আর একজন বেতাল। তারও ঠিক খাওয়ায় মন নেই। দিশেহারা। ব্যস্ত। তার পাছ নেই আগও নেই। তার সুর নেই, লয় নেই। 'জীবনের পথে কেবলি কোলাহল। অস্থির। কি যেন চাই, কি যেন নেই। এ জীবনে কেবলই ছুটে চলেছি, যেন হাজার বছর ধ'রে। পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, কাব্য দর্শন, রাজনীতি তারপর চা-য়ের দোকান। কিন্তু বৃন্তহীন। কি যেন ফেলে এসেছি। কি চায় এ মন। মনের সঙ্গে মনান্তর। কোথাও মাথা নত করতে পারিনে, বুক ভরে পারিনে কাউকে আলিঙ্গন করতে। তবুও শুনি নহবতের সুর, বেতালের তালে দেখি গজলের তাল ফেরতার মোহিনী কটাক্ষ।'

আর একজন, বকুল মা। খাওয়া দেখছিলেন ছেলেদের। কিন্তু আর বোধ হয় দেখছেন না। হঠাৎ মন হারিয়ে গিয়েছে। বসে আছেন বকুল মা নয়, এক কিশোরী বালিকা। বয়স চল্লিশ পার হ'য়ে গিয়েছে। সে যেন পাথরের বুকে মাথা ঠুকে গিয়েছে হাওয়া। পাথর তেমনি রয়েছে, শক্ত মজবুত। মাথার চুল কুচকুচে কালো, কালো ভ্রূ। ফর্সা রং। বললেন, 'খা তোরা, হালদার মশাই খাবেন কিনা, জিজ্ঞেস ক'রে আসি।'

ঘরে ঢুকে দেখলেন হালদার আরাম কেদারাটায় গা হাত পা এলিয়ে প'ড়ে আছেন। সারা মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ। নাকের পাশের কোঁচ দুটো আরও গভীর হয়েছে। গায়ের জামা রয়েছে গায়ে। দেখলেন প'ড়ে রয়েছে মদের বোতল আর মোটা ছড়িগাছটি। চোখের পাতা বন্ধ। সইয়ের বর, নেকো হালদার। হয়তো দুঃস্বপ্ন দেখছেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। থাক্, ডেকে কাজ নেই। মায়া লাগে বকুল মায়ের। ঘুমুক। ঘুম তো কোনদিন ছিল না ওই চোখে।

হঠাৎ হালদার চোখ খুললেন। রক্তজবার মত চোখের চাউনি আচ্ছন্ন। বকুল মায়ের দিকে তাকিয়ে মাথাটা তুলতে চেষ্টা করলেন। ডাকলেন, 'কে স্বর্ণ। বড় বউ।'

হালদার তাঁর স্ত্রী'র নাম ধরে ডাকছেন।

বকুল মা'র বুকের মধ্যে চমকে উঠল। তার সুন্দর ঠোঁট নড়ে উঠল, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না।

হালদার ফিস্‌ফিস ক'রে বললেন, 'শোন বড় বউ, আমি ভজুর বে' দেব। নারায়ণটা জোচ্চুরির পথ ধরেছে, ও লোক ঠকিয়ে খাবে। কিন্তু ভজু তা নয়, ও সংসার চায়। মোটা পণ নে' ওকে আমি বে' দেব বুঝলে? তারপর, ওকে আমি ঠিক আমার রাস্তায় এনে ভেড়াব, তুমি দেখো।'

বকুল মা নীরব। বুঝি স্পন্দনহীন! জোর ক'রে তাকিয়ে আছেন হালদারের মাথার উপর দিয়ে দেয়ালের দিকে।

হালদার বললেন, 'হাসছ বোধ হয়? কোথা পেয়েছিলে অমন হাসি। শোন, কাছে এস বড় বউ।'

বকুল মা দেখতে পেলেন, ওই যে তার সই এসে দাঁড়িয়েছে! হাসছে নিঃশব্দে। যেন বলছে, 'জবাব দে না লো পোড়ারমুখী, আমার ভাতার কি তোর ভাসুর।'

কিসের ধাক্কায় কেঁপে উঠলেন বকুল মা। তাড়াতাড়ি বললেন, 'হালদার মশাই, আমি এসেছি।'

হালদার ভ্রূ টান করে বললেন, 'কে?'

'আমি, সুখদা।'

'বকুলফুল!'

হালদার একটু বিস্মিত হলেন। তারপর তাঁর সেই মত্ত চোখে বকুলফুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জীবনে যেন এই প্রথম দেখলেন বকুলফুলকে। স্বর্ণের মতই সুন্দরী। কেবল ঠোঁট দুখানি তেমন বাঁকা হাসিতে বাঁকা নয়। চোখে নেই তেমন ঔদাস্য। কি রয়েছে তার সারা চোখে মুখে, সব ঘুলিয়ে গেল হালদারের দৃষ্টির সামনে। মাথার মধ্যে অনেকগুলো কথা এলোমেলো হ'য়ে গোলমাল পাকিয়ে গেল সব। বকুলফুলের মূর্তিটা তাঁর চোখের সামনে ঝাপসা হ'য়ে এল। কি যেন বলতে চাইলেন। পারলেন না। খালি অস্ফুট গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, 'বকুলফুল!'

খোলা জানালা দিয়ে হু হু ক'রে ছুটে এল হাওয়া। যেন স্বর্ণর আচমকা নিঃশ্বাস! হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস পড়ল বকুল মায়ের। সই এসে দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি। একজন এ সংসার ছেড়ে গিয়েও যেতে পারেননি, আর একজন থেকেও সেখানেই গিয়েছেন। তাদের জীবনে পাওয়া না পাওয়ার যোগ বিয়োগ আজও এক তালেই চলছে।

জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা নিয়ে বকুল মা অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লাঞ্ছনা অপমান সব সয়েও দিন রাতের মত নিয়মে চলা জীবনে একটা কথাই বারবার মনে হয়, আর কিছু বাকি আছে। স্বামীর কথা স্মরণ করার চেষ্টা করেন। ভাল মনে পড়ে না। যাকে মনে পড়ে সে সই। এ গাঁয়ে ঘরে তার প্রতি কত ডাকাডাকি কত হাসাহাসি। অরক্ষণীয়ার সে চির অপমান। আছে শুধু ভজু আর নারায়ণ। তবু বুকের কোন্‌খানটাতে যেন একেবারে ফাঁকা। সে ফাঁকাতে নেই একটু বন পালা, শুধু বালিয়াড়ির স্তূপ।

'বকুল মা।' ভজুর গলা ভেসে এল।

'এই যে বাবা।' সাড়া দিলেন বকুল মা। তিনি কিছু কথা বলতে চাইছিলেন হালদারের সঙ্গে, বিশেষ, ওঁর মুখে ভজুর বিয়ের কথা শুনে। নারায়ণের জন্য ভয় পেয়েছেন তিনি। এ সংসারের একটা হিল্লে হওয়া দরকার। বকুল মা'র নিজেরও ছুটি চাই এবার।

কিন্তু তাকিয়ে দেখলেন, হালদার একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আশ্চর্য! এই তো কথা বলছিলেন, এর মধ্যেই ঘুমোলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিছুক্ষণ আগের তন্দ্রা তলিয়ে হঠাৎ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। যেন দুধের শিশু হালদার। গভীর ঘুমের মধ্যে শিশুর দেয়ালার মত হল ব্যাপারটা। হালদার সুখী। এসব মানুষেরাই তো প্রকৃত সুখী।

অথচ বকুল মায়ের কাছে রাত্রি আসে জাগার যন্ত্রণা নিয়ে। এ জীবনে কিছুই হয়তো ভাববার ছিল না। তবু সম্ভব অসম্ভব সব বিচিত্র ভাবনায় তাঁর রাত কাবার হয়। তাঁর অন্ধকার ঘরে একলা বিছানায় ওই চোখজোড়া যেন জ্বলতে থাকে, কখনো ভিজে ওঠে কখনো দিশেহারার মত এদিক ওদিকে ঘুরে ফিরে। যেন অনেক অপরিচিত আত্মার সঙ্গে তিনি মিশে যান। তাঁর সারা গায়ের মধ্যে ছুঁচ ফুটতে থাকে, মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্ করে। ইচ্ছে হয়, কোথাও ছুটে যান। কোথা গেলে যে একটু প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়!

ভজু এল ঘরের মধ্যে। বলল, 'চল বকুল মা, অনেক রাত হল।'

বকুল মা তাড়াতাড়ি ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ, চল্ বাবা, তোর বাবার দেখছি আজকে রাতটা কেদারাতেই কেটে যাবে। ডাকাডাকি করলে কি উঠবেন?'

ভজুর মুখ দেখে বোঝা গেল, সে এখন এসব কিছুই ভাবছে না। বলল, 'ছেড়ে দাও না। ওঁর তো এসব নতুন নয়! তুমি তাড়াতাড়ি চল। ঘরে গিয়ে তো আবার যা হোক কিছু মুখে দিতে হবে।'

সত্যি। না জানি রাত কত হল। এখন গিয়ে আবার বকুল মাকে যা হোক কিছু খেতে হবে। তারপর সেই ঘরটাতেও কাজকর্ম কিছু আছে।

খিড়কির দোর দিয়ে ভজুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন বকুল মা। ভজু শিকল তুলে দিল দ্বারে।

রাত নিশুতি। নিজ্‌ঝুম। অন্ধকার। আকাশে অগণিত নক্ষত্র। যেন অনেক অশরীরীরা প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। কিসের প্রতীক্ষায় সে চাউনি উৎসুক।

পাড়ার দুপাশে বাড়ীগুলো ছদ্মবেশী আততায়ীর মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় কোন ছোটখাট বনবেড়াল গোছের জন্তুরা হঠাৎ দৌড়ে পালাচ্ছে, সড়্‌সড়্ ক'রে শুকনো পাতার উপর দিয়ে। টিকটিকি ডাকছে ঠিক্‌ঠিক। বাড়ীগুলির গায়ে হাওয়া ধাক্কা খেয়ে অনেকের ফিসফিসানির মত শোনাচ্ছে।

বকুল মা একটু অবাক হলেন ভজুর কথা ভেবে। ও তো এরকম থম মেরে থাকে না। রোজ পৌঁছে দেওয়ার পথে কত বক্‌বক্ করে ভজু। সংসার, ব্যবসা, আশা আর ভবিষ্যৎ। তারপর আড় আনতে কুড়, বলে একে মারব, তাকে হাঁকব। তারও পরে বলবে, যত নষ্টের গোড়া আমার বাবা। তোমাদের এ নেকো হালদারটিকে কম ভেবো না বকুল মা। বকুল মাও হাসেন, বকবক করেন।

বকুল মা বললেন, 'ভজন, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ বুঝি আজ?'

চমকে উঠল ভজু, ভাবনার ঘোরে ধাক্কা খেয়ে বলে উঠল, 'কেন?'

'কথা বলছিস্ না যে!'

'এমনি।'

খটকা লাগল বকুল মায়ের। এমনি কেন। এমনি তো ভজুর হয় না। কি হল ওর প্রাণে, ওর হেঁকো ডেকো প্রাণে।

হ্যাঁ, কিছু হয়েছে তার প্রাণে। তাকে দুটো ভাবনা দুদিক থেকে চেপে ধরেছে। দুটো ভাবনা নয়, দুটো মুখ। একটি হল রথীনের সেই বীরত্বব্যঞ্জক দৃঢ় শক্ত মুখ। যে মুখখানি বুকে নিয়ে নারায়ণ আদর করেছেন। দাদার দুই হাতের মধ্যে সেই মুখ। ভজুর নয় রথীনের। আর একটি এক রহস্যময়ীর! পলে পলে যে মুখের পরিবর্তন। মুখ হাসি হাসি, তবু হাসি নয়, ও চোখে হাসির ধারা না অশ্রু ঝিকিমিকি! বকুনি না সোহাগ।

বকুল মা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'ওমা! আর চল্‌ছিস্ কোথা! এসে পড়লুম যে!'

অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ভজু। আবার বাধা পড়ল, বলল, 'তাই তো।'

বকুল মায়ের মনটা দমে যেতে লাগল বারেবারে। কি হয়েছে ছেলেটার, কি হয়েছে ওর মনে। নারায়ণ কিছু বলেনি তো। না, সে ছেলে তো কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলবার নয়। সে বরং ভজন। বাছাবাছি নেই, মানামানি নেই। গড়গড় করে যা মুখে এল তাই ব'লে দিল। তবে কি হল ছেলেটার। ওর বকুল মা'কে তো ও কোন কথা লুকায় না।

বললেন, 'আসবি আমার ঘরে, বসবি একটু।'

ভজু বলল, 'না বকুল মা, আমি যাব। তোমার কিছু করতে হবে কিনা বল।'

'না, আমার কিছু করতে হবে না। তোর মনটা খারাপ দেখছি, তাই বললুম।'

বকুল মায়ের গলা একটু ধরেই এল। অভিমান হল তাঁর মনে। জল এসে পড়ল চোখের কোলে। কিছু না করলে বুঝি আসতে নেই। কত অগুনতি রাত যে আমার এই বুকে শুয়ে কাটিয়েছিস্। যে বুকে আমার বিধাতা আজও কুমারীর বেদনার কাঁটা ফুটিয়ে রেখেছেন, যে বুকে তুই মা'কে খুঁজেছিস্ আর আমি খুঁজেছি মাতৃত্বকে। আসলে ভজু তার মনের কথা বলতে চায় না। বললেন, 'এত রাতে যেন আর কোথাও যাস্‌নি। গিয়ে শুয়ে পড়।'

বকুল মা বাড়ীতে ঢুকে গেলেন। অভিমান শুধু নয়, উৎকণ্ঠাও চেপেছে তাঁর মনে। মরণের সময় সইয়ের কথাগুলো মনে পড়ে গেল, 'সই, ওদের বাপের অনেক ছেলে মরেছে। সেসব ছেলের নাম মামলা। এগুলোকে তুই দেখিস আমার মুখ চেয়ে। ওদের কেউ নেই।'

বকুল মায়ের বুকটা মুচড়ে উঠল। নারায়ণ ধরেছে এক মহা সর্বনাশের পথ। ভজনও আজ কেমন ক'রে চলে গেল। কি হয়েছে ওর মনে।

কি হয়েছে ভজুর মনে। বাড়ীর খিড়কির দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ভজু। রথীনের মুখটা মনে পড়ছে। কঠিন শক্ত মুখ। বীর বিপ্লবী হতে পারবে না ভজু, ও পথে কোন টান নেই তার। কিন্তু ওই পথেই দাদা গিয়েছেন। তাই রথীন বুঝি দাদার প্রাণের চেয়েও বড়। রথীন নির্ভীক, তাই দাদার বুক ভ'রে ওঠে।

হঠাৎ পশ্চিম দিকে ফিরে ভজু হন্‌হন্ ক'রে চলতে আরম্ভ করল। আশেপাশে দেখল না, মানল না অন্ধকার, বাতাসের আগে চলল। এসে দাঁড়াল একেবারে গঙ্গার ধারে।

হু হু ক'রে হাওয়া ছুটে এসে ভরে দিল তার চোখ মুখ। উঁচু মাটির খাড়া ধারের নীচে সদ্য জোয়ার আসা গঙ্গা ছলাৎ ছলাৎ করে যেন তাকে ডাক দিল, চল্ চল্।

অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কার দেখা যায় উত্তরে হাওয়া একটা তীব্র স্রোতের রেখা। ঢেউয়ের মাথাগুলো আচমকা চক্‌চক্ ক'রে হেসে উঠছে। অন্ধকারে আকাশ গঙ্গা মেশামেশি।

খোলা আকাশের নীচে অবাধ হাওয়ার একটা গোঙানি প্রেতের আঁ আঁ শব্দে ছুটে আসছে। গায়ে গায়ে ঘেঁষা গাছগুলো সুযোগ পেয়ে কানে কানে কানাকানি ক'রে মরছে। মাথার উপর দিয়ে একটা পাখী উড়ে গেল সড় সড় করে। নিশুতি রাতে কপাটে কার টোকা পড়ার মত কোথায় একটা অর্থময় শব্দ হচ্ছে ঠুক ঠুক ঠুক।

এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল কয়েক হাত দূরেই। চকিতে বুঝি চক্ চক্ ক'রে উঠল জন্তুগুলোর চোখ। একটা তীব্র গন্ধ মাতাল করে দিচ্ছে সব কিছুকে।

গঙ্গার দূর-দূরান্তে মিশে যাওয়া শব্দের মধ্যে যেন ভজু শুনতে পেল, কে ডাকছে, মৃণ্ময়ী.....মৃণ্ময়ী। আপনা থেকেই কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়ে গেল তার। অমনি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি মুখ। একটি থেকে আর একটি, তারপর আর একটি। তার মনে হল, বুঝি সেও একদিন কাউকে এখানে, এই পাড়ের নীচে ওই তীব্র স্রোত ও পাক খাওয়া অতল জলে রেখে গিয়েছে। এ সমাজ ও সংসারের দিশেহারা প্রাণে সে আজ আবার তাকে নতুন ক'রে ডাকতে এসেছে। এ সংশয়াকুল জীবন সে আর সইতে পারছে না।

ওই দূরে দক্ষিণে অন্ধকারের বুকে অন্ধকার চেপে বসবার মত শ্মশানে বড় বড় গাছ-গাছালির মাথা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে চকিতে আবার রথীনের কথা মনে পড়ে গেল তার। অমনি সেদিকে চলল সে। রথীন বীর। ভজন শুধু ভজু। তবু, সেও কি পারে না যেতে শ্মশানে! পরীক্ষা কেন, এমনি অকারণেই কি আসা যায় না ঘুরে। না-ই রইল স্নেহালিঙ্গন, এ প্রাণ কি পারে না ভয়ের মুখে লাথি মারতে।

উঁচু পাড়ের সরু পথে শুকনো পাতা মড়মড়িয়ে উঠল তার দৃঢ় পদক্ষেপে। হাওয়া বুঝি তার পিছেপিছে ছুটে এল, ওরে যাস্‌নি যাস্‌নি।

কিন্তু যাবে। পাগলা নিশিতে পেয়েছে আজ তাকে। শুধু রথীন নয়, সেও পারে। জীবনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফেল বলে কোন কথা নেই তার।

তবু আবার সেই মুখ। এক দুর্বোধ্য চিন্তায় জট পাকিয়ে গেল তার মগজ। সংস্কারাচ্ছন্ন মন বলতে লাগল, মৃণ্ময়ী মরেনি। সে আজও বেঁচে আছে। তার বন্দিনী আত্মা এখনো ওই শ্মশানের চারদিকে ছটফট ক'রে ঘুরে মরছে। সে আজ তাকেও মুক্ত ক'রে আনবে। মুক্তি দেবে হঠকারী নবকুমারকে। হতাশ করবে শত শত বছরের প্রতীক্ষারত নারীমাংসলোলুপ তান্ত্রিক কাপালিককে।

পায়ের তলায় কি যেন মড়মড় ক'রে ভেঙ্গে গেল। ভজু তাকিয়ে দেখল, শ্মশানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে সে। পায়ে কাদার মত ঠেকছে। বোধ হয় মড়া পুড়িয়ে চিতায় কারা জল ঢেলে দিয়ে গিয়েছে। চারদিকে বড় বড় গাছের বেড়া। মাঝখানে ঘোর অন্ধকার। হাওয়া বাধা পাচ্ছে, তাই উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু কোথায় রথীন। চারদিকে তাকিয়ে দেখল ভজু। শেয়ালগুলো অবাক হয়ে নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছাকাছি। মাথার উপর ঝাপটা দিচ্ছে গৃধিণী।

কোথায় লিখতে হবে নাম। উপুড় হয়ে হাতিয়ে হাতিয়ে খুঁজে পেল একটা কলসী ভাঙ্গা।

ভাবল, নিজের পুরো নামটাই লিখবে সে। না, তা'হলে যে সব জানাজানি হ'য়ে যাবে। সে লিখল 'শ্রী'।

তারপর শ্মশানের বাইরে এসে দাঁড়াল। ঘামে ভিজে ওঠা শরীরটা মুহূর্তে হাওয়ায় জুড়িয়ে গেল! আরামে বুজে এল চোখ। নেমে গেল ঢালু পাড় বেয়ে নীচে। গণ্ডুষ ভরে জল নিয়ে ছিটা দিল চোখেমুখে। মনটা ঠাণ্ডা হ'য়ে এল। ভাবল রথীন হয়তো চলে গিয়েছে। দাদার বুক আরও ভরে উঠবে গর্বে।

বাবার কথা মনে পড়ল ভজুর। নিঃশেষিত বাবা। কার উপর নির্ভর করবেন তিনি আজ। দাদা তার নিজের পথে ছুটে চলেছেন দুর্বার বেগে। তিনি ফিরবেন না। বকুল মা কতদিন আর এ সংসার আগলাবেন, এ যে চারদিক থেকে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। আর তার নিজের রাস্তা-ই বা কোথায়।

গঙ্গার দূর বুকে বোবার মত তাকিয়ে রইল সে। মনের উত্তেজনা হঠাৎ অনেকখানি নেমে গিয়েছে। মৃণ্ময়ীর ভাবনা তার হৃদয়ের গোপন স্থলে বেজেছে নিজের বিয়ের কথা ভেবে। তার এই দিশেহারা প্রাণে কাউকে দরকার। কাউকে চাই। দাদা, রথীন, বাবা, বকুল মা, যাক্ যে যার পথে। সে যাবে তার নিজের পথে। কেন এত ভাবনা, কেন মনের এত বাড়াবাড়ি। কিসের মান অভিমান। দাদার সঙ্গী সে হবে না। বিবাদ করবে না সে বাবার সঙ্গে। বাঁধা থাকব না বকুল মার কাছে। কোন প্রতিযোগিতায় মাতবে না সে রথীনদের সঙ্গে। সে স্থির হতে চায়, স্থিতি চায়, জীবনের ভাঙ্গা ছড়ানো খোলটাকে ফেলে নতুন নৌকায় যাত্রা সুরু করবে সে। তার সমস্ত বেদনা যন্ত্রণা রাগ হাসি নিয়ে সে একজনের কাছে নিজেকে সঁপে দেবে।

ছলাৎ করে ছিটকে জল লাগল তার গায়ে মুখে। হঠাৎ শীত করে উঠল তার। দেখল কাপড়টা অনেকখানি ভিজে গিয়েছে। যেন নতুন করে মনে পড়ল, সে শ্মশানে বসে আছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ভাবল, কালকে হয়তো রথীন জীবনে আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে। তাতে তার কি। হয়তো সেও পারে রিভলবার দিয়ে শত্রুর মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে। কিন্তু সে কাজ তো সকলের জন্য নয়। বিপ্লবী বাহিনীতে যোগ দিয়ে সে দাদার স্নেহ কাড়তে পারবে না। না-ই ভাবলেন দাদা ভজুর ভাল মন্দর কথা। একলা জীবনেই সে এগিয়ে যাবে।

হাওয়া অনেকখানি প'ড়ে এসেছে। ম্লান হয়ে এসেছে আকাশের তারা। ভজুর চোখে শ্মশানটাকে মনে হল যেন প্রেতের মূর্তি ধরা বহুরূপীটা ধরাচূড়া ছেড়ে নিতান্ত ভালমানুষের মত পড়ে আছে। অন্ধকার হালকা হয়ে গিয়েছে। সবই পরিষ্কার দেখা যায়।

গঙ্গা নিঃশব্দ। ঢেউ কম। জোয়ার কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। আকণ্ঠ সুধা ভরা যার, সে তো নির্বাক। যার নেই, তারই তো নাচানাচি বেশী। শব্দ বেশী খালি কলসীর।

ভজু বিদায় নেওয়ার আগে একবার গঙ্গার দিকে তাকাল। গঙ্গা সমুদ্র হয়ে উঠেছে। তারই জীবনের ভবিষ্যতের মত কূলহীন, অথৈ। সেই পারাপারহীন অসীমের মাঝে আর কিছু নয়, কেবল একটি মুখ বারবার নানারূপে ভেসে ভেসে উঠল। টাবুটুবু গঙ্গার গুনগুনানি যে বাজতে লাগল অনর্গল সানাইয়ের সুরে।

কত কথা ছিল মনে। কত ছিল ভাববার, কত হিসাব-নিকাশ, জীবনের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে আড়ম্বরের যুক্তি-তর্ক। সব ভাসিয়ে অন্ধকারে এই মুহূর্তে শুধু একটি মুখ ছড়িয়ে গেল সারা আকাশে। অবলীলাক্রমে সে পরীক্ষায় পাশ করে এসেছে স্কুলে কলেজে, কিন্তু কোন বিশ্বাস

দানা বেঁধে ওঠেনি সেদিন। কি হওয়া উচিত ছিল, জানত না সে কথা। আজ হঠাৎ জীবন গঙ্গার মোহনায় এসে সে পথ হারিয়েছে। হারানো পথে কেবল একটি মুখ। 'গলিতে চলিতে ছলিতে সে মোরে, কেবুলি ডাঁইড়ে রয়।' এই হল বাঙ্গালীর গান। 'বুঝি গঙ্গার কাছে অঙ্গীকার করে গেল ভজু অস্ফুট গলায়, আমি বে' করব। এ অবিশ্বাস ও অনাদরের সংসারে আমি তাকেই চাই। সে আমার প্রাণের সই হবে। আমি সোহাগ কাড়াব তার কাছে।'

তারপর সে ফিরে চলল। জীবনের অথৈ সমুদ্রে সে চলল বুঝি তার মৃণ্ময়ীর সন্ধানে। মধ্য রাত পেরিয়ে, শ্মশান মাড়িয়ে চলল যেন এ শতাব্দীর এক অভিশপ্ত আত্মার ছায়া।

পরদিন সকালে কারখানাটার চা খাওয়ার ছুটির ভিড় লেগেছে ভজুর দোকানে। মজুর মিস্তিরির ভিড়।

রাস্তাটা লাল ধুলোয় ভরে গিয়েছে। পুব ধারের মাদার আর কুরচি গাছের পাতাগুলো পড়েছে ঝরে। হাওয়ায় উড়ছে সব। ধুলো আর পাতা। বেসামাল হচ্ছে মানুষ। সকলের নাক চোখ সর্বক্ষণই কুঁচকে থাকে। সামনের আম গাছগুলোতে বোল ধরেছে। গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। কচি কচি আমও হয়েছে, ঝরে পড়েছে তলায়। কুড়োচ্ছে কতকগুলো পাড়ার ছেলেমেয়ে।

গাছগাছালির ফাঁকে পুবে দেখা যায় সেই পুরোনো বাড়ীটা। উঁচু জমিতে মস্ত বাড়ী। ভাঙ্গা ভাঙ্গা, মেটে আর শেওলা রং। তারও পরে মন্দিরের একটা চূড়া।

ভজু এক মনে চা তৈরী করে চলেছে। তার মধ্যেই কথা বলছে খদ্দেরদের সঙ্গে, পয়সা নিচ্ছে। কিন্তু যারা চা খাচ্ছে তারা জানে ভজু চা-ওয়ালা নয়, বাবু। বাবুর দোকান। লেখাপড়া জানা এক মহা দিগ্‌গজ, নিরহঙ্কারী দিলদার মানুষ। বামুনের ছেলে। ভদ্রলোক। নারায়ণবাবুর ভাই। নেকো হালদারের ছেলে ভজন। ভজু, উন্নাসিক ভজু, ব্যাটা যেন ভজু-লাট। একথাও বলে অনেকে।

ঘরের বাইরে ভিড় খদ্দেরদের। ভেতরেও ভিড়, খদ্দের নামধারী নারায়ণের সাঙ্গপাঙ্গদের। খদ্দের তো বটেই, তারাও চা নিয়ে বসেছে। কিন্তু কে চা খাবে! এক মহাবিস্ময়ে সকলে স্তব্ধ, নির্বাক। উদ্বেগাচ্ছন্ন। বিমূঢ়। ঘটনার সুরুতেই এরকম একটা বাধা, সবাইকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। হীরেন, কৃপাল এবং আরও কয়েকজন এসেছে। তারাও শুনেছে ঘটনাটা রথীনের মুখে, এবং শুনে হয়তো তারা ভাবছে ভবিষ্যতে তাদের নিজেদের পালা এলে কি কৈফিয়ত নারায়ণদার কাছে দেবে।

নারায়ণ প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেননি। কেননা তিনিও ছিলেন কাল রাত্রে ওই কারখানা পাঁচিলের শেষে গঙ্গার ধারে বটতলার অন্ধকারে। রথীনের সত্য পরীক্ষার জন্য নয়, রথীনের প্রাণের জন্য তাঁর গভীর উৎকণ্ঠা। হয়তো বিপ্লবী-বাহিনীর আঞ্চলিক অধিনায়ক হিসাবে এ হৃদয়চাঞ্চল্য রীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু তিনি চুপ করে থাকতে পারেননি। রথীনের অদেখা আড়ালে তিনি তাকে চোখে চোখে রেখেছিলেন। কিন্তু রথীন বলছে সে আর একজনকে দেখেছে। সেই আর একজন নাকি সম্ভবত মাতাল ছিল অথচ যেন ভদ্রবেশী! লোকটা টলছিল কিন্তু ভীষণ তাড়াতাড়ি আসছিল। রথীন ভেবেছিল, লোকটা তারই পেছন পেছন আসছে। সে ভয় পেয়েছিল। তাই সে তার কাজ শেষ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছিল।

নারায়ণ যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে খালি শ্মশানের ফেরার রাস্তাটাই দেখা যায়। তিনি

দেখেছিলেন রথীন ছুটে আসছে। ভেবেছিলেন, ভয় পেয়েছে হয়তো কোন কারণে। কিন্তু অন্য কোন লোককে তিনি দেখতে পাননি। বিশ্বাসও করতে পারেননি প্রথমটা।

কিন্তু তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন চিতার পাশে মস্ত বড় করে লেখা রয়েছে 'শ্রী'। যেন লেখক আরও কিছু লিখতে চেয়েছিল অথচ না লিখে শ্রী'র পরে খামখেয়ালীভাবে একটা লম্বা লাইন টেনে দিয়েছে। কে সে। কে সেই লোক। বিস্ময়ে উদ্বেগে সন্দেহে নারায়ণের শান্ত মন অস্থির হয়ে উঠল। এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষের মুখ তার চোখের সামনে পর পর ভেসে উঠল। এমনকি পরিচিত পুলিশের গুপ্তচরও তার থেকে বাদ গেল না। তবু মন স্থির হতে চায় না।

রথীনকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'রথী, সে মাতাল কি করে বুঝলে তুমি?'

রথীন ত চিন্তাচ্ছন্ন। সে ডুবে গিয়েছিল চিন্তায়। হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত বলল, 'অ্যাঁ! কেন কি। আমার মনে হল লোকটা বিড়বিড় করছিল, আর খুব টলছিল।'

ভজু বাইরে চা তৈরী করতে করতে না হেসে উঠে পারল না। অকারণ হেসে উঠে সে তার এক খদ্দেরকে বলে উঠল, 'তুই ব্যাটা গোঁফটা তো খুব জোর তৈরী করেছিস্।'

যাকে বলল, সে গাল গোঁফ হাতিয়ে বলল, 'গোঁফ কোথা দেখলেন বাবু। আমার তো গোঁফ ওঠেনি।'

'তাই নাকি।' ভজু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। বলল, 'আমাকে মাইরী ভূতে পেয়েছে। তুই বাঙ্গালীর ভাই-পো না?'

বাঙ্গালীর ভাই-পো অবাক মুখে তাকিয়ে বলল, 'আঁজ্ঞা হ্যাঁ!'

কিন্তু ঘরের দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন লোকগুলোর নজর এদিকে ছিল না। তারা দেখতে পেল না ভজুর চাতুরী। তাদের পরস্পরের মধ্যে নানান আলোচনা চলছিল। কেউ ভাবছিল, এটা নিশ্চয় গুপ্তচরের ব্যাপার। কারুর ধারণা, চোর ডাকাতের কোন কারসাজি বুঝি এটা। রথীন বিশেষ ক'রে ভাবছিল তন্ত্রবিদ্ মদন ভট্টাচার্যের কথা। ভট্টাচার্য নাকি প্রায়ই মদ খেয়ে শ্মশানে যান দেবীর ধ্যান করতে।

নারায়ণ ভাবছিলেন অনেকের কথা। ভাবতে ভাবতে, ভজুর মুখটা তাঁর চোখের সামনে আসতেই তিনি থমকে গেলেন। অকারণ, তবু থমকে গেল মনটা, অসম্ভব, তবু মন নড়তে চাইল না। অপলক চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন ভজুর দিকে। স্বভাবে মনে ভাবনায় অস্থির, জীবনে দিশেহারা ভজু। তিনি জানেন তাঁর ভাইটিকে খানিকটা। জানেন ওর অবিশ্বাসী মনটার কথা, এ সমাজের ও সংসারের আবর্তে ওর তিক্ত অসুখী হৃদয়টার কথা। জেনেও তিনি নিরুপায়। তাঁর নিজের বিশ্বাস মত ও পথ আছে। ভজুর তা নেই। এ জীবনে ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের নেই কোন সূত্র। তবু বোঝেন খানিকটা তাকে। সংশয় থেকেও কেমন ক'রে যেন মনটা বারবার বলে উঠল, কাল রাতে ভজুই গিয়েছিল শ্মশানে। ভজু অবিশ্বাসী, কিন্তু দুঃসাহসী। মনের অন্তর্স্রোতের গতি বড় বিচিত্র। ও পরিষ্কার প্রত্যাখ্যান করেছে নারায়ণকে, ঘোষণা করেছে তোমার পথ তুমি দেখ। কিন্তু নারায়ণ জানতেন, সেখানেই শেষ নয়, ভজুর মনে আরও কিছু আছে। প্রাণ গেলেও সেকথা ও বলবে না। শোনবার অবকাশ তাঁরই-বা কোথায়।

ভাবলেন, এখুনি জিজ্ঞেস করবেন ভজুকে ডেকে। কিন্তু ডাকলেন না। এত লোকের মাঝখানে সে কোন কথা বলবে না, তিনি তা জানতেন। নিজেকে এ ভাবনার থেকে মুক্ত করে নারায়ণ

আলোচনায় চলে এলেন, বললেন, 'শোন সব, আমার মতে এভাবে ভেবে কোন লাভ নেই। আর আমার বিশ্বাস, কালকে রাতের সে লোক কখনো আমাদের শত্রু নয়। তবু রথীনকে আজ আবার পরীক্ষা দিতে হবে। একটা সুটকেশ নিয়ে রথীনকে আজ যেতে হবে শ্মশানে। তার মধ্যে থাকবে দুটো রিভলবার। বিশ্বাস ও সাহস, দুই-ই পরীক্ষা দিতে হবে। পারবে রথীন!'

রথীন একটু বিস্মিত হল মনে মনে। মুখে তা ফুটতে দিল না। বলল, 'পারব দাদা।'

আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই নারায়ণ গম্ভীর গলায় বললেন, 'আগামীকাল কৃপালের পরীক্ষা।'

কৃপাল নিশ্চুপ। তার নীরবতায় ইচ্ছা অনিচ্ছা কোনটাই বোঝা যায় না।

হীরেন তাড়াতাড়ি বলল, 'মদের দোকানে পিকেটিং করার একটা ডেট ফিক্স্‌ড করে ফেললে হ'ত নারায়ণদা।'

নারায়ণ একটু দ্বিধাভরে বললেন, 'করতে হ'লে কারখানা ছুটির দিন করতে হবে। কিন্তু মজুরদের সঙ্গে একটা ক্ল্যাশ হ'য়ে যেতে পারে। তাছাড়া. আমি তো ভাই থাকতে পারব না। —আমি বোধ হয় কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাব।'

হীরেন কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য ক'রে দেখছে, জাতির চরিত্র গঠনের এ ধরনের কাজেকর্মে নারায়ণদা'র কেমন একটা উদাসীনতা। তিনি সবসময় অন্য কিছু চিন্তা করছেন। তিনি স্বরাজ লাভের অন্য পথ ধরেছেন। বিশেষ ফেব্রুয়ারী মাসে বর্দৌলিতে ওয়ার্কিং কমিটির ডিসিসনের পর থেকে তিনি অন্যদিকে আরও এগিয়ে গিয়েছেন। এমনকি, বর্দৌলির ডিসিসনকে বলেছেন কাপুরুষতা। ব্যায়াম সমিতিগুলোর দিকে তাঁর ঝোঁক বেশী। কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত ছেলের সন্ধানে তিনি ঘুরছেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তিনি গান্ধীজীর পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। এ বড় বেদনার ও দুঃখের কথা। তাদের পথপ্রদর্শক নেতা নারায়ণদা আজ সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহ পথে চলেছেন।

হীরেনের পক্ষে এটা ধর্ম লঙ্ঘনের সামিল। তবু মদের দোকানে পিকেটিং করার ব্যাপারে তারও খানিকটা দ্বিধা আছে। এক কথা, এখুনি গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা। আর, মজুরদের সঙ্গে যদি মারামারি হয়। এই মজুর চরিত্রটা সম্পর্কে ভেবে সে কোন কূলকিনারা পায় না। ওরা নিজেরা যেমন ওদের ভাল-মন্দ বোঝে না, তেমনি বুঝতেও দেয় না কাউকে। অথচ নিজেদের একটা নৈতিক অধঃপতনে বাধা দিতে গেলে ওরা লাঠি মারতে আসে। তবে হ্যাঁ, একথাও ঠিক যে, আমরা ওদের দূরে সরিয়ে রেখেছি। অস্পৃশ্যতাই হচ্ছে তার প্রমাণ। আমাদের যেতে হবে ওদের কাছে, অধিকার দিতে হবে ওদের মন্দিরে প্রবেশের, এক জায়গায় বসে খাওয়ার। হৃদয়ের আর একটা দরজা খুলে দিতে হবে ওদের জন্য। ভালবাসার দরজা।

হীরেনের ভাবনার ফাঁকে রথীন বলল, 'দাদা, সুনির্মল আমাদের সঙ্গে আসতে চায়।'

নারায়ণ যেন কি ভাবছিলেন। চমকে উঠলেন একটু। আনমনা। ভাবের ঘোরে বললেন, 'কে সুনির্মল?'

'আমার বন্ধু, স্কুলে পড়ে।'

নারায়ণ বললেন, 'নিয়ে এস তাকে আমাদের এখানে। আজ নয়, কাল রাতে, আটটার সময়। এখন তোমরা সব যাও। বিকেলে সমিতিতে আসতে কেউ ভুলো না।'

চলে গেল সবাই একে একে। নারায়ণ বসে রইলেন। ভাবছিলেন ভজুর কথা। তিনি

নিঃসন্দেহ হয়েছেন কাল রাতে ভজুর যাওয়া সম্পর্কে। এখন তাঁর মনে পড়ছে, কাল অনেক রাতে তিনি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, তখন ভজু ফিরেছে বাড়ীতে। কোথায় গিয়েছিল সে অত রাত্রে! বকুল মা'কে পৌঁছে দিয়ে আসতে তো কোনদিন রাত কাবার হয় না।

এসব কথার সঙ্গে নারায়ণের একবারও বকুল মা'য়ের সকালবেলার কথাটা মনে পড়ল না। মনে পড়ল না বকুল মা বলেছিলেন, সাহার দোকান থেকে আড়াই মণ চাল আনিয়ে দিতে। সাহার দোকানের হিসাবটা নাকি তার বাবার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। সেটা দেখে সাহাকে টাকা মিটাতে বলেছিলেন। নারায়ণের সেকথা খেয়াল নেই। খেয়াল নেই, ঘরের তহবিল শূন্য। শূন্য বাবার পকেট, শূন্য ভাঁড়ার। কে জানে বকুল মা'র হাতও শূন্য কিনা।

দোকানে খদ্দেরের ভিড় কমে গিয়েছে। রয়েছে দু' একজন পশ্চিমা খদ্দের। গায়ে তাদের নীল কুর্তা। তারা রেলরোড্ মজুর। আর রয়েছেন বুড়ো গোলক চাটুজ্জে! এক হাতে হুঁকো, অন্য হাতে চায়ের গেলাস। এ পাড়ারই লোক। ঠিক বুড়ো নন, তবে বয়সটা নাবির দিকেই। সবসময়ই ঝিমোন আফিমের নেশায় অথচ নিপুণ অভিনেতার মত তাঁর গল্প বলার কথা এ অঞ্চলে বিখ্যাত। বুড়ো গ'প্পে। গল্প সব উদ্ভট, অদ্ভুত এবং অশ্রুতপূর্ব তো বটেই। তিনি হুঁকো ও চায়ের গেলাস নেড়ে নেড়ে পশ্চিমা মজুর দুজনকে তাঁর এক পশ্চিমা বন্ধুর গোঁফের গল্প বলছিলেন। বলছেন যে ভাষায়, সে ভাষার কোন মা বাপ নেই। বলছেন সেই গোঁফের খিদ্‌মদ্‌গারই ছিল চারজন। একদিন নাকি সেই বন্ধু গোঁফে তেলজল লাগিয়ে আঁচড়ে জানালা দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। গোঁফ পড়েছিল একেবারে জানালা বেয়ে বাইরের মাটিতে। গোঁফের মালিক শুয়েছিলেন জানালার নীচে খাটে। তখন এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক ঘরনা ঘরের ছেলে। সে ভাবল, অমন যার কেশের বাহার, না জানে সে অওরৎ কতই খুবসুরত্। লোভ সামলাতে না পেরে বেচারী সেই চুলের গোছা আল্‌গোছে ধরে মিঠে গলায় যেমনি ডেকেছে, 'হে সুন্দরী!' আর অমনি—

আর বলার দরকার ছিল.না। পশ্চিমা মজুর দুটি হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। খাপছাড়াভাবে হাসছিল ভজু নিজের কাজ করতে করতে।

বাইরের হাওয়া মত্ত। খোয়া বাঁধানো রাস্তার জমা ধুলো উড়ছে। লাল সুরকির মত ধুলো ছড়িয়ে পড়ছে গাছে গাছে পাতায় পাতায়, কেরোসিনের ল্যাম্পপোস্টের চিমনিতে, আকাশে আর মানুষের চোখে মুখে। সামনের আম গাছটায় ধুলো লাগা মস্ত মাকড়সার জালটায় রোদ পড়ে লাল দেখাচ্ছে।

লাল হ'য়ে উঠেছে নারায়ণের মুখ। ভজুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকটা মুচড়ে উঠল তার। ভাবতে আরম্ভ করলে যে রেহাই নেই। এ সংসারের সঙ্গে নিজেকে কোনরকমে বাঁধতে না চেয়েও মানুষগুলোর জন্য মায়া যে কাটানো যায় না। ওই যে ভজন দাঁড়িয়ে আছে, নিজের জীবন সম্পর্কে অনিশ্চিত অসহায়। মনে মনে ও দাদাকে যা-ই ভাবুক না, নারায়ণ তো জানেন ভজন তাঁর বুকের কতখানি জুড়ে আছে। সত্য এ কতখানি নিয়েই তাঁকে তাঁর পথে পাড়ি দিতে হবে। জীবন প্রতীক্ষা ক'রে আছে অন্যত্র। হৃদয়ের এ সম্বলটুকু দরিদ্রের। এটুকুতে ভজুর কিছু আসবে যাবে না, খোঁজেরও দরকার নেই।

কিন্তু ভজুকে তো বাঁচতে হবে। তার ভাবনা মত ভজু যদি সত্যিই গত রাত্রে শ্মশানে গিয়ে থাকে, সে যে সত্যি উদ্বেগের কথা। জীবনের অকারণ খেয়ালে অপঘাতে প্রাণ দেওয়ার তো

কোন অর্থ হয় না।

নারায়ণ ডাকলেন, 'ভজু?'

ওই ডাকের জন্য প্রতীক্ষা করছিল ভজু শঙ্কিত মনে। প্রতীক্ষা করছিল, তবু চমকে উঠল! মুখ ফেরাল না। হাতে কাজ নেই যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। তবু জল ন্যাকড়া দিয়ে টেবিল মুছতে মুছতে বলল, 'কি বলছ?'

নারায়ণ গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাছে আয়, শুনে যা।'

ভজু বুঝল, কাছে যেতে হবে। ওই মানুষটির কোন কথাই জীবনে অবহেলা করা চলবে না। কিন্তু কি শুনবে ভজু। কাল রাত্রে সে এক বিচিত্র খেলায় মেতেছিল। হ্যাঁ খেলাই তো। আজ সকালে সেটা হাস্যকর মনে হচ্ছে। সে যেন অনেকদিন আগের কথা। এখন তার সামনে একটা পথই খোলা আছে, একটা বিশেষ কাজের পথ। সে পথে সে মনে মনে অনেকক্ষণ পা চালাতে শুরু করেছে। না, তার এখন কোন মান অভিমান নেই।

সে দাদার কাছে এসে দাঁড়াল। কাছে এসে তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে নারায়ণ মনে মনে আরও স্থির হলেন ভজু সম্পর্কে। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে ভজন, কাল রাতে তুই শ্মশানে গিইছিলি?'

ভজু কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে বলল, 'শ্মশানে? আমার ব'য়ে গেছে।'

জবাব শুনে নিঃসন্দেহ হলেন নারায়ণ ভজুর শ্মশান যাওয়া সম্পর্কে। সে যদি না যেত তবে, এতক্ষণে নানান কৌতূহলিত প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলত। কেন, কি ব্যাপার, কখন এবং কি হয়েছে, এমনি হাজারো জেরা চলত তার। এক কথায় এরকমভাবে সবটা উড়িয়ে দিত না।

নারায়ণ বললেন, 'ব'য়ে যাক আর যাই হোক, এভাবে যাওয়া তোর ঠিক হয়নি। বিপদ আপদের কথা বলা তো যায় না।

'আমি জানি তোর সাহসের কথা। তোর সাহস রথীনদের মত পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে না। আমার মনে আছে সেই সাহেবের গাড়ীতে ঢিল মারার কথা। দলের কেউ পারল না, আমিও না। তুই হঠাৎ মেরে বসলি।'.............

দাদার মুখ থেকে এ স্বীকারোক্তি সহ্য করতে পারছিল না ভজু। তার সাহসের প্রতি দাদার এ অসীম আস্থার কথা শুনে এক অদ্ভুত অনুভূতিতে হঠাৎ তার বুকটার মধ্যে টন্‌টন্ ক'রে উঠে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। না, সে শুনতে চায় না। তার সহ্য হচ্ছে না।

নারায়ণ বলছিলেন, 'তোর মত সাহস আমাদের একটা ছেলেরও যদি থাকত'...........

ভজু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওসব কথা বাদ দাও দাদা। তোমাকে একটা কথা বলব আজ!'

নারায়ণ বললেন, 'বল।'

ভজু বলল যেন খেয়ালী ছেলের খানিকটা আবদারের মত, 'তুমি তো বাপু বে' টে' করবে না কিন্তু আমি এবার করব।'

নারায়ণ এক মুহূর্ত অবাক হ'য়ে হা হা ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, 'সত্যি? আমার হুকুমের অপেক্ষায় আছিস বুঝি? বললে বিশ্বাস যাবি না, একথা আমি কতদিন ভেবেছি। অবস্থা গতিকে বলতে পারিনি। তুই যেদিন খুসী বে কর ভজু, তা'হলে আমাদের সংসারটার রূপ খুলবে।'

ভজু হাসতে পারল না। দাদার হাসিটা যেন তার বুকের মধ্যে কেমন ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজতে লাগল। এ হাসি অভিশাপ না আশীর্বাদ সে বুঝতে পারল না। কিন্তু আর নয়, সে নিজের পথে এগিয়ে যাবেই।

দাদা যদি প্রতিবাদও করতেন, তা' হ'লেও সে থামত না। গোলক চাটুজ্জের বোধ করি তখনো মৌতাত কাটেনি। তাই বসেছিলেন। বললেন, 'কি গো, ভাই দুটির এত ফুর্তি কিসের। আমাদের একটু সন্দেশ-টন্দেশ দাও।'

নারায়ণ বললেন, 'ভজু বে করবে ঠাকুর্দা।'

বটে। গোলক চাটুজ্জে নিভুনো হুঁকোয় বার কয়েক টেনে বললেন, 'তবে শোন বলি এক বে'র ঘটনা!'

ভজু তাড়াতাড়ি বলল, 'এখন আর থাক ঠাকুর্দা। গোঁফের গল্প যা শুনিয়েছ, তাতেই তোমার এক কাপ চা পাওয়ানা হয়ে গেছে।'

বটে! খুশি মনে চোখ বুজে নিরস্ত হ'লেন ঠাকুর্দা।

নারায়ণের চোখে আচমকাই এই মুহূর্তে ভেসে উঠল এক কিশোরীর মুখ। গঙ্গার ধারের পাঠকবাড়ির মেয়ে। সে আজ আট ন' বছর আগের কথা, একহারা ছিপছিপে ফর্সা ফর্সা মেয়েটি, টানা টানা চোখ। পান পাতার মত মুখের কাটুনি। মাথায় এত চুল যে, চারটে বেণী পাকিয়ে মস্ত খোঁপাটা ঝুলত যেন কতকগুলো কালনাগিনী জড়াজড়ি ক'রে আছে। কাঁচা অবুঝ মেয়ে। তার ঠাকুরমা নাকি কোন্‌দিন বলেছিল, 'কার সঙ্গে তোর বে বসতে মন চায়।' নাতনী বলেছিল, 'নেকো হালদারের বড় ছেলের সঙ্গে।' মন চাইবে বৈকি। অমন টুকটুকে শিবঠাকুরের মত ছেলে। সে নিয়ে পাড়ায় কত হাসাহাসি ঠাট্টা তামাসা হয়েছে। তারপরে সে কথা শেষ পর্যন্ত বিয়ের আলোচনার স্তরে এসে পড়েছিল। নারায়ণের তখন কৈশোরের সীমা প্রায় অতিক্রান্ত। মনটা ছিল কাঁচা। সেই কাঁচা মন তারও কাঁচামিঠে হ'য়ে উঠেছিল। মনের কাছে অছিলা ক'রে কারণে অকারণে বারবার যেতেন গঙ্গার ধারের পাড়ায়। কিন্তু নেকো হালদার হ'য়ে পড়েছিলেন কালা আর বোবা। যেন শুনতে পাননি কিছু, বলেনওনি কিছু। অতএব চুকে গেল ব্যাপারটা।

ব্যাপারটা হাসির। কিন্তু নিজের মনের কাছে অস্বীকার করা যায় না, এ হাসির মাঝে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বেদনাবোধ ছিল। নারায়ণ তাকে তারপরে কয়েকবার দেখেছেন। চকিতে, পলকে। শরীরের সঙ্গে সে মেয়ের রূপ আরও বেড়েছে। বড় হয়েছে। তাকে দেখলে খালি নারায়ণের মনে পড়ে যায় বুড়ি পাঠক গিন্নির কথা, নাতনি আমার শিব গড়ে যেন নেকো হালদারের বড় ব্যাটাটি।

না, সে ভুল কথা। মনে হয়েছিল বটে নেকো হালদারের বড় ছেলে। কিন্তু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল অন্য জনের। সে যে আরেকজন।

হঠাৎ হাওয়ায় মড়মড় করে উঠল ছিটেবেড়ার ঘর। এলোমেলো করে দিল দোকান ঘরটা। চালায় জমানো ধুলো ঝরে পড়ল। দুলে দুলে উঠল মাকড়সার জাল ও ঝুল।

গাছে গাছে শব্দ উঠল সাঁই সাঁই। অস্থির ডালপালা থেকে আকাশে উড়ে গেল শঙ্কিত পাখীর দল। ঝরে পড়ছে শুকনো আমের বোল। আমের বোল কাল্‌চে হয়েছে। ছোট ছোট আম ধরেছে, কাচের দুলের সবুজ পাথরের মত। কোন কোন গাছে কচি কচি পাতা ধরেছে। শুকনো পাতা উড়ছে খড়্‌খড়্‌ ক'রে।

ফাঁকা রাস্তাটার উপর দিয়ে চলেছে একটা গরুর গাড়ী। আপন মনে গান ধরেছে পশ্চিমা গাড়োয়ান। অলস বলদ দুটো চলেছে ঝিমিয়ে চোয়াল নাড়তে নাড়তে।

সবাই চুপচাপ। যেন সকলেই কথা বলতে ভুলে গিয়েছে। কেবল গোলক চাটুজ্জে চা-পেয়ে খুশীতে গান ধরলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা কাঁপা অলস গলায়।

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া আওলা ঘরে
রাধিকার অন্তরের উল্লাস

উল্লসিত হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল সেই গান। হাওয়া দুর্বার। যেন কালবৈশাখীর গোম্‌রানির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বৈশাখের মাঝামাঝি। অনেক রাত। কত রাত, কে জানে। ঝড় উঠছে। ধীরে লুকিয়ে। যেন এ বিশ্বের ঘুমের সুযোগে বায়ুকোণে কারা দল বেঁধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তারই ইঙ্গিত হঠাৎ হাওয়ার সড়সড়ানিতে, আকাশের দূরাগত গোঙ্গানির মধ্যে, বিদ্যুতের সর্বনাশা চমকে, ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের করাল গ্রাসে। যেন বহুদূর থেকে একটা বিরাট ব্যাটালিয়ন আসছে কামানের গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে। এ যেন তারই দুম্ দুম শব্দ, তারই ঝলকানি, তারই কালো ধোঁয়ার রাশি।

চক্ষের পলকে শুরু হয় ঝড়ের তাণ্ডব। আকাশে কে হাসছে বিকট অট্টহাসি। গাছগাছালির মুণ্ডুগুলো ধরে কে যেন মাটিতে ঠুকে দিচ্ছে। চট্‌পট্ শব্দে ছিটকে আসছে জল।

অন্ধকারে মিশে গিয়েছে নেকো হালদারের একতলা বাড়ীটা। ঢেকে গিয়েছে মেঘ অন্ধকার ও গাছের মধ্যে।

কাঁপছে থর্ থর্ ক'রে ভজুর চায়ের দোকানটা। চালার টিনটা দুলে উঠছে। চড়্‌চড়্ ক'রে উঠছে বেড়ার বাঁশ। বন্ধ দরজাটা যেন কোন অশরীরীর ঠেলায় ধাক্কা খাচ্ছে। ঠকঠক ক'রে নড়ছে খড়ি দিয়ে লেখা কাঠের বোর্ডটা।

ভজু জেগে রয়েছে তার ঘরের মধ্যে। সিগারেট খাচ্ছে। নতুন খাওয়া ধরেছে। ছাতের হুকের সঙ্গে ঝোলানো একটা আগের আমলের কেরোসিন বাতি। বাড়ীতে বলে ওটাকে ফটিক বাতি। বাতিটা জ্বলছে কিন্তু কমানো। সেই আলোয় দেখা যায় ঘরটা আর শুধু ভজুর নেই, আর একজন রয়েছে। নতুন খাটে ফুল ছড়ানো বিছানায় শুয়ে রয়েছে ভজুর পরশু দিনের বিয়ে করা বউ। আজ ফুলশয্যার রাত। বাড়ীতে অনেক লোকজন রয়েছে অন্যান্য ঘরগুলোতে, কেবল বাবার ঘরটা ছাড়া। এসেছে সম্পর্কের মাসী, পিসী, কাকা, মামারা। এসেছে বোন তার ছেলেমেয়ে নিয়ে, স্বামীর সঙ্গে। অনেকে এসেছে, ভজু তাদের অনেককেই চেনে না। ফুলশয্যার উৎসবের বাড়ী।

উৎসব শেষ। লোকজন সব ঘুমুচ্ছে অন্যান্য ঘরে। আড়িপাতানির দল ফিরে গিয়েছে, ঢলে পড়েছে ঘুমে। অনেক রাত, তা ছাড়া দুর্যোগ। বাইরে শুধু ঝড়ের তাণ্ডব।

ভজু আলমারির পাশে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন অবাক হয়েছে। হতভম্ব। সারা মুখে একটা অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ। কেন, তা সে জানে না। তার বুকের মধ্যে দারুণ অস্থিরতা, একটা অসীম শূন্যতার হাহাকার। নিজেকে সে কিছুতেই যেন বুঝতে পারছে না। হাতে সিগারেট নিয়ে সে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে বিছানার দিকে।

নতুন খাট। পুরু বিছানায় ছড়ানো ফুল। গন্ধে ভরে রয়েছে সারা ঘর। খাটে শুয়ে রয়েছে

যুঁই, ভজুর বউ। যুঁই ঘুমিয়ে পড়েছে। কাত হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে। শ্যামাঙ্গিনী যুঁই, স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘ দেহ। ঘুমন্ত চোখের পাতা একটু খোলা রয়েছে। চোখের খোলা জায়গা যেন শ্বেত অপরাজিতার দুটো পাপড়ি। নাকটি সরু, টিকলো। তাতে ছোট একটি নাকচাবি। কপালের সিঁদুর সরু রেখায় গিয়ে মিশেছে সিঁথিতে। রেখাটা মাঝখানে এঁকেবেঁকে গিয়েছে। খসে গিয়েছে ঘোমটা। আধখানা বালিশ জুড়ে ভেঙ্গে রয়েছে মস্ত খোঁপা, খোঁপার মালা। সারা মুখে ক্লান্তি কিন্তু তৃপ্তির আবেশ মাখানো। আলতা মাখানো হাসি হাসি ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁকে দেখা যায় সাদা দাঁতের সারি। শান্তিপুরের চুমকি দেওয়া রঙিন কাচের মত শাড়ী আলুথালু। বিস্রস্ত যুঁই। এলোমেলো। মাঝারি ঘরের মেয়ে। তবু অলঙ্কার পেয়েছে কম নয়। কিন্তু সেসব গায়ে নেই। ভজুর ভাল লাগে না। তাই খুলে রেখেছে।

যুঁই ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে, নিঃসন্দেহে। বাঁ হাতখানি এলিয়ে পড়ে আছে ভজুর পরিত্যক্ত স্থানে। ভরা প্রাণের ঘুম। টেরও পাচ্ছে না বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব।

ভজু তাকিয়ে আছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে সারা মুখে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে আগুনের মত। তার কটা চোখ জোড়া জ্বলছে ধক্‌ধক্ করে। ......হ্যাঁ, এই তো সেই মেয়ে, যাকে সে কিছুদিন আগে চেয়েছিল। একে নিয়েই তো সে আজকের আধখানা রাত কাবার করেছে সোহাগের বন্যায়। চুমোয় চুমোয় ভরে দিয়েছে মেয়েটাকে, কথা বলেছে কত। জীবনের অদম্য কৌতূহলে চিনে নিয়েছে ওর প্রতিটি অঙ্গ, অনুভব করেছে, আগুন জ্বলে উঠেছে তার শরীরের প্রতিটি কোষে কোষে।

এখনো জ্বলছে। দপ্ দপ্ করছে প্রতিটি শিরা উপশিরা। কিন্তু বুকটার মধ্যে হাহাকার করছে। সেখানে তো একটুও ভরেনি। হ্যাঁ, সত্য সে একেই চেয়েছিল, তাতে ভুল হয়নি। কিন্তু মনের মধ্যে কে চীৎকার করছে, না আমি একে চাইনে, এর কাছে নিজেকে আমি কেমন করে সঁপে দেব।

তবে সে কাকে চেয়েছিল?'মন ফিরে বলে, একেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আর চাইনে। কাউকেই না। তার যে মনের সঙ্গে মনান্তর। চাওয়া পাওয়ার কোন কিছুর ঠিক নেই। মন যেন এক সর্বনেশে যন্ত্রবিশেষ।

তবু এ সংসারে তো মানুষ তার পথে বিশ্বাস নিয়ে চলে। চলে গিয়েছেন তার দাদা। এ উৎসবে আজ নারায়ণ অনুপস্থিত। তাঁর মত পথ ও বিশ্বাস আছে। তাঁর ডাক এসেছে, তিনি মুহূর্তে ছুটে গিয়েছেন। ভজু তাঁকে আটকাতে পারেনি। আটকাতে পারবে না এ বিশ্ব, স্নেহ, আদর ভালবাসা।

বাবা যথাপূর্বং মাতাল হয়ে পড়ে আছেন নিজের ঘরে। কেউ তাঁকে নিরস্ত করতে পারবে না। বিরক্ত করতে পারবে না গিয়ে কেউ। প্রাণ চাইলে আরও মদ খেতে পারেন। টাকা পেলে মামলা করতেও যাবেন।

বকুল মাও নিজের চিন্তায় স্থির। ভজু বিয়ে করে নাকি তার ছুটির দিন এগিয়ে দিয়েছে। তিনিও এবার বিদায় নিয়ে চলে যাবেন।

শুধু তুষ্ট নয় ভজু। তার তুষ্টি নেই। এ যুগটাই তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতার যুগ। এ যুগের শিক্ষিতের অভিশপ্ত জীবন নিয়ে সে দাঁড়িয়েছে। জীবনে সে কিছু চেয়ে উঠতে পারেনি, তবুও চেয়েছিল। এ অস্থিরতার মাঝখানে সে মূঢ় হয়ে উঠেছে। আগুন লেগেছে তার বোবা অস্থির

অনুভূতিময় প্রাণে। সে জানে না আগামীকাল তার জীবন কোন্ খাতে বয়ে চলবে অথচ একটা সন্দেহ উঁকি মারছে, এক দারুণ ব্যর্থতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে।

বাইরে কড়কড় করে মেঘ ডাকছে, বাজ পড়ছে। বাতাসের শাসানি আর মুষলধারে বৃষ্টির ঝাপটা আছড়ে পড়ছে।

যুঁই হাসছে। তার স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখে আর ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি। মৃণ্ময়ীর হাসি। কি কথা আছে তার মনে। কেন হাসছে।

মনে পড়ছে, দাদা নেই। আর যুঁই হাসছে। দাদা চলে গিয়েছেন, বাবা মাতাল হয়ে পড়ে আছেন, বকুল মা ছুটির ভাবনায় বিভোর হয়েছেন, আত্মীয়-স্বজনেরা সারাদিন খেয়েছেন, হেসেছেন, এখন নির্ভাবনায় ঘুমুচ্ছেন আর যুঁই হাসছে। ভজুকে নিয়ে একটা খেলায় মেতেছে সবাই। নিষ্ঠুর নির্বিকারভাবে।

গলার কাছে ঠাণ্ডা একটা কি স্পর্শ করতেই চমকে উঠল ভজু। মালা। সাপ নয়, বিছে নয়, ফুলের মালা। টান দিয়ে সেটাকে খুলে ফেলে দরজা খুলে বাইরের দালানে বেরিয়ে এল সে।

দালানের দরজা জানালা সব বন্ধ। হালদার মশাইয়ের ঘর থেকে উঁকি মারছে আলো। ভজু নিঃশব্দে অস্থির পায়ে সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। চিন্তার সমস্ত স্নায়ুগুলিকে নিষ্পেষিত করতে চায় সে।

হালদার পড়ে আছেন বিছানায়। আধখানা শরীর প্রায় তক্তপোষের বাইরে ঝুলে পড়েছে। খেয়াল নেই। মাথার বালিশের কাছে মদের বোতল।

কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ভজু মদের বোতলটা তুলে নিল হাতে। চকিতে একবার থমকাল। বুঝি একবার ভদ্র শিক্ষিত মন চমকে উঠল। কিন্তু ভাবনার অবসান চাই, বিশ্রাম চাই। সে নির্ভয়ে গলায় ঢেলে দিল মদ। একটা অসহ্য ঝাঁজে বুক জ্বলে গেল, তিক্ত স্বাদে বমির উঁকি উঠে এল। জ্বালা করে উঠল পেটের নাড়িগুলো। সামলে নিয়ে আবার ঢালল। তারপর বেরিয়ে এল।

ভজু দেখতে পেল না বকুল মা দীর্ঘ দালানেরই এক অন্ধকার কোণে পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরও চোখে ঘুম ছিল না। এক ভয়াবহ সর্বনাশের নাটক তিনি দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

নিজের কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি এ-দৃশ্যের সামনে পড়ে গিয়েছেন। ভজুর বিয়ের কথারম্ভের দিন থেকে তিনি ভাবতে আরম্ভ করেছেন। নিজেকে তাঁর সবটুকু বোঝা কোনদিনই পুরো হয়ে ওঠেনি। মনে হয়, সংসারের থেকে ছুটি তিনি চেয়েছিলেন, বলেছেন মুখ ফুটে। এখন দেখছেন, তার জন্য মন তৈরী হয়নি। দিশেহারা হয়ে উঠেছেন। মনে হচ্ছে, পেটের শত্রুর মত ভজু আচমকা বিয়ে করে বকুল মাকে আজ তাড়িয়ে দিতে চাইছে। রক্তক্ষয়ী অভিমানে পুড়ে যাচ্ছে বুকের মধ্যে। সেদিন রাত্রে পৌঁছে দেওয়ার পথে একথাই ভাবছিল ভজু। কিন্তু বকুল মাকে বলেনি। বলবে না বলেই বলেনি। কিন্তু কি অপরাধ করেছেন বকুল মা। কাকে নিয়ে কাদের নিয়ে তিনি থাকবেন?

জীবনে কি তিনি চেয়েছিলেন, আগে যেমন বোঝেননি, আজও জানেন না! অথচ একটা অসহ্য আপশোসে আজ ভরে উঠছে তাঁর বুক। এত নিঃস্ব নিজেকে তাঁর কোনদিন মনে হয়নি।

বছরের পর বছর ভজন নারায়ণকে রান্না করে খাইয়েছেন, দেখেছেন। কেউ জানে না, শ্বশুরের দেওয়া অলঙ্কার গোপনে বিক্রি করে করে হালদারের যাবতীয় খরচ জুগিয়েছেন। হালদার কোনদিন এ বিষয়ে একটু কৌতূহলও প্রকাশ করেননি। তাতে আসে যায়নি কিছু বকুল মা'য়ের। জিজ্ঞেস করলেই নিজেকে বরং তাঁর অপ্রতিভ মনে হত। নিঃসাড়ে, এমনি নিঃশেষ করে দেওয়ার মধ্যে তাঁর শান্তি ভরা ছিল। তবু তাঁর বৈধব্যের অন্তস্থলে একটা ক্ষীণ অগ্নিস্রোত প্রবাহিত ছিল। মাঝে মাঝে সেই স্রোতের তীব্রতা তাঁকে আনমনা করে দিয়েছে, ঘুম কেড়ে নিয়েছে, অদৃশ্যে কে যেন ভেংচেছে। তখন বলেছেন ছুটি চাই, চলে যেতে চাই কোথাও।

কোথায়? কোথাও নয়। সে যে শুধু মুখের কথা। এসব ছেড়ে তিনি কেমন করে যাবেন। কয়েকদিন আগে নারায়ণ চলে যাওয়ার সময় বলে গেল। তিনি বললেন, যাও। ভজন অনুমতি চায়নি, খালি একবার বলেছে, 'আমি বিয়ে করব।' তিনি বলেছেন, 'করবি বৈকি বাবা।'

কেবল হালদার অবুঝ শিশুর মত হাত পেতে প্রায়ই বলেন, 'বকুলফুল, কয়েকটা টাকা.....'

কোত্থেকে, কেমন করে আসবে, তা বলতেন না। বকুল মা টাকা এনে দিতেন, দিয়েছেন, দিচ্ছেন। হালদারকে দেখবে, কে খোঁজ করবে তাঁর দুবেলা, তাঁর খাওয়া শোয়ার। নারায়ণ ফিরে এসে আবার কাকে ডাকবে? ভজনের চায়ের দোকানের ঘুগনি কে তৈরী করে দেবে?

তিনি তো চাননি এসব ছেড়ে যেতে। কে চেয়েছে বৃন্দাবনের ঠাকুরের চরণ দর্শন করতে? সে চরণ যে তাঁর বুকেই ছিল। আজও তো তিনি তাই এত রাত অবধি সব দেখে বেড়াচ্ছিলেন। সবশেষে চলেছিলেন হালদারের ঘরে, সব গোছগাছ করে দিতে, তল্লাস নিতে।

কিন্তু এ কি দেখলেন তিনি? ভজু মদ খেয়ে এল বাপের বোতল থেকে। কেন, কি হয়েছে ভজুর? নিরালায় সইয়ের সঙ্গে যখন তিনি কথা বলবেন, কি জবাব দেবেন তিনি? কেন এমন সর্বনাশে মাতল ভজু!

নতুন করে আবার বুঝলেন তাঁর হাতের রশি ঢিলে হয়ে গিয়েছে। সবকিছু ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছে তাঁর হাত থেকে। মনে হচ্ছে, এ ঝড়ের রাতের অন্ধকারে বকুল মা যেন নিশাচরী প্রেতিনী একটা। অমঙ্গলের ছায়ার মত বুঝি তিনি এ বাড়ীর কোণে কোণে ঘুরছেন। তাঁকে পালাতে হবে।

ভজু দালান ঘরের একটা জানালা খুলে দিয়েছে। ঝড় থেমে এসেছে। বৃষ্টি হচ্ছে। ভজুর মনটা হঠাৎ যেন নৌকার ছেঁড়া পালের মত হু হু করে উড়ছে। মাথাটা ভারী হয়ে এসেছে, কিন্তু ইচ্ছে করছে গলা ছেড়ে গান করতে। সে বিড়বিড় করছে, বলছে, 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।' সে বলছে মনে মনে, তবে তাই হোক, তাই হোক।

কাল রাত পোহালে আমি যাব আমার দোকানে। বলব যুঁই, আমার ঘুগ্‌নি তৈরী করে দাও। নতুন বউ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। ভাববে সে একটা শিক্ষিত চা-ওয়ালার বউ। তবে তাই থাকবে না। ভজু দোকান করবে। স্টেশনের ধারে করবে হালফ্যাসানের রেষ্টুরেন্ট। মুদী সাহা এসে টাকা চাইতে দ্বিধা করবে, এ সংসারের পাওনাদারেরা মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়াবে সেখানে। যুঁইয়ের টাকায় সে বড় রেষ্টুরেন্ট খুলবে। নাম দেবে যুঁই রেস্তোরাঁ। না যুঁই কেবিন। ভাল শোনাচ্ছে না। কাফে দ্য যুঁই দিলে কেমন হয়। কিন্তু বউয়ের নামটা দিলে লোকে কি বলবে।

ভজু হা হা করে হেসে উঠল সশব্দে, চড়া গলায়। তারপরে হঠাৎ বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল,

আমি ভয় করব না ভয় করব না।.....

বকুল মা কান্না চেপে, তীব্র চাপা গলায় ডুকরে উঠলেন। ছুটে এসে হাত ধরলেন ভজুর। ডাকলেন, 'ভজু, ভজন কি হয়েছে তোর বাবা?'

ঝড়ের শেষ ঝাপটা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল জানালা দিয়ে। ফুলশয্যার ঘরে ছত্রাকার হয়ে গেল ফুল আর মালা। নতুন বউ শিউরে জেগে উঠে বসল।

হালদারের হাতের ঠেলায় মদের বোতল মেঝেয় পড়ে বেজে উঠল ঝন ঝন করে। কেবল ভজন যেন জেদী গলায় চীৎকার করতে লাগল, আমি ভয় করব না।......

বৎসরান্ত হল। ঘুরে গেল আরও একটা বছর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতেই। তারও পরের বছরটা কাটল তোড়জোড় করতেই। ভজনের নতুন দোকান খোলার তোড়জোড়।

হয়তো এত বিলম্ব ঘটত না। কিন্তু চারদিকে এমন সব বিশৃঙ্খলা গত বছর ঘটতে আরম্ভ করেছিল যে দিশেহারা ভজন কিছুই স্থির করতে পারেনি। সে অনেক প্ল্যান আর প্রোগ্রাম ভেঁজেছে, ইচ্ছে বলে বস্তুটা মুখ লুকিয়ে পড়েছিল কোথায়। ইতিমধ্যে যুঁইয়ের একটি ছেলে হয়েছে।

গত বছরের গোড়া থেকেই দাদা নারায়ণ অনুপস্থিত। ভজনের বিয়ের পর তিনি এসেছিলেন কয়েক মাসের জন্য। বাড়ীতে থাকতেন নিতান্ত অল্প সময়। কথা প্রায় কারুর সঙ্গেই বলতেন না। যদি কখনো বলতেন, সে কথার সুরে মনে হত, এক খাপছাড়া বিষাদ ভর করেছে তাঁর গলায়। যুঁই একটু কাশলে বলতেন, 'ভজু, বউমার শরীরটা খারাপ করেছে রে।' ভজনের ছেলেটিকে নিয়েও তাঁর উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। কিন্তু সে উৎকণ্ঠার মধ্যে একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। যেন চোখের উপর রয়েছে, তাই, নইলে এসবে তাঁর কিছুই আসত যেত না। বাইরের জীবনে তাঁর এত ব্যস্ততা ছিল অথচ ঘরে ঢুকলে মানুষটাকে আর চেনা যায় না। বাইরে তিনি কঠিন, নিয়মানুবর্তিতার প্রতিমূর্তি। সে বাইরেটা সাধারণের মধ্যে নয়, দলের মধ্যে। কখনো বা অত্যন্ত নরম ও মিষ্টি। কখনো ভয়ঙ্কর, কখনো মাটির মানুষ।

কিন্তু ঘরে ছিলেন যেন একটা বৈরাগীর মত। আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো। কে গেল, কে এল, কি হল না হল, তাতে তাঁর কিছুই আসত যেত না। এতটা তো ছিল না। এখন কেন? ভজন বিয়ে করেছে বলে? এমনি সন্দেহ উঁকি মেরেছে ভজনের মনে। কেউ সুখী হয়নি। দাদা নয়, বকুল মাও নয়। যেন এঁদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই সে মতলব করে যুঁইকে ঘরে এনেছে। আগে আগে কত কথাই বলতেন নারায়ণ ভজনকে। এখন সেসব নেই। ভাল, ভাল তোমাদের এমনি মতিগতি। এ বেয়াড়া নিয়মে খাপ খাওয়াতে পারবে না তা'বলে ভজু। সে রইল তার নিজের মনে যেন খানিকটা গোঁজ হয়ে।

এমনি অবস্থায় একদিন হঠাৎ গভীর রাত্রে বাড়ীর চারদিকে সোরগোল শুনে ভজন ঘুম ছেড়ে উঠে দেখল, তাদেরই দরজায় লোকজন দাঁড়িয়ে, টর্চ লাইটের আলো জ্বলছে কয়েকটা, অতর্কিতভাবে অন্ধকার ঝোপঝাড়ে জ্বলে উঠছে আলো কিসের সন্ধানে। বাড়ীর চারদিকে লোকজন।

ভজনের হকচকানিটা কাটলে, সে দেখল, লোকজন নয়, পুলিশ ঘেরাও করেছে তাদের বাড়ীটা। জানালা দিয়ে এ দৃশ্য দেখা মাত্র ভজন ছুটে গেল আলো নিয়ে দাদার ঘরে। দেখল

দাদা নেই, দরজা খোলা। ঘরটা ছত্রাকার হয়ে রয়েছে। পালিয়েছেন নারায়ণ। কিন্তু কেমন করে, কোন্‌খান দিয়ে! বাইরে দেখল খিড়কির দরজাও বন্ধ। পাঁচিল টপকে? কিন্তু বাইরে তো পুলিশ।

ভাবতে ভাবতেই তাদের দরজায় করাঘাত পড়ল। ভজন তাড়াতাড়ি যুঁইকে নিয়ে ঘরটা ঠিক করে দরজা খুলে দিল। তার জিজ্ঞাসার কোন জবাব না দিয়েই পুলিশ ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে। বেরিয়ে এলেন হালদার। পুলিশ আরম্ভ করল খানা তল্লাসী রাত্রি দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। তল্লাসী আর জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর চলে গেল সবাই।

সেই চলে গিয়েছেন নারায়ণ, আর আসেননি। গত বছর মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার তিনদিন পরে আবার একবার হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পুলিশ এ বাড়ীতে, ভোর রাত্রে। হালদারের মেয়ে, ভজনের বোনের তখন প্রসব হয়েছে। বাড়ীতে আঁতুড় ঘর। সেই ঘরের কাপড়চোপড়ের মধ্যে চালান করে দেওয়া হয়েছিল নারায়ণের পরিত্যক্ত কাগজপত্র। বিছানার কাছে বসেছিলেন বকুল মা।

এ দেশী পুলিশ অফিসার সঙ্কোচ করেছিল আঁতুড় ঘরে ঢুকতে। কিন্তু ঢুকেছিল সাহেব অফিসার নিঃসঙ্কোচে, অবলীলাক্রমে। তার ইচ্ছে ছিল, প্রসূতির বিছানাটা উল্টে দেখবে সে।

কিন্তু বকুল মা ভজনকে ডেকে বলেছিলেন, সাহেবকে বলে দে, 'মেয়ে আর শিশুর যদি কোন ক্ষতি হয়, তবে সাহেবকেই তা শোধ দিতে হবে।'

সাহেব থমকে গিয়েছিল। এক গৌরাঙ্গী মহিলা, তার দিকে চেয়ে না থাকলেও দেওয়ালের দিকে ফেরানো তাঁর বিশাল দুই চোখের তীব্র কটাক্ষ যেন বিঁধছে তাকেই। তিনি বসেছিলেন প্রসূতির গায়ে হাত দিয়ে, এক পিঠ চুল এলিয়ে। সাহেব অফিসারটির মনে হল, বাংলা পোষাকে তাঁর সামনে বসে রয়েছে বুঝি শিল্পী রুবেনের মডেল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার জ্বলে উঠছিল একটা নেটিভ মেয়েমানুষের এরকম স্পর্ধা দেখে, আবার একটা ভয়ও ঘিরে ধরছিল তার মনে। পরে তার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল বাঙালী অফিসারের উপর। ধমকেছিল যে, সে কেন বলেনি একটা জমাদারনিকে নিয়ে আসার কথা।

কয়েকদিন পর আবার হামলা হয়েছিল ভজনের দোকানে। কিছুই তারা পায়নি, মাঝখান থেকে লাভ হয়েছিল, বুড়ো গোলক চাটুজ্জে ছাড়া দু'তিনদিন দোকানে খদ্দের আসা ছেড়ে দিয়েছিল।

দিন পনর পর সংবাদ এসেছিল, নারায়ণ গ্রেপ্তার হয়েছেন। বন্দী হয়ে আছেন আলিপুরের প্রেসিডেন্সী জেলে।

এ সময়ে ভজনের জীবনও একটা যেন মোড় নিতে বসেছিল। মনে হয়েছিল, একটা বিশ্বাস এসেছে তার মনে। নারায়ণের ফেলে যাওয়া কাজ তাকেই শেষ করতে হবে, একথাটা যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিল তার বুকের মধ্যে। রীতিমত সমিতিতে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল সে। তার উপর অনেকের বিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধা ছিল তার সাহসিকতার উপর। কিছুদিনের জন্য চায়ের দোকানের ব্যবসা প্রায় উঠে যেতে বসেছিল। রথীন সুনির্মল এরা তাঁর সহকর্মীর মত, ছায়ার মত ঘুরত তাঁর সঙ্গে।

কিন্তু বেশীদিন গেল না। কয়েকটা ঘটনার জন্য থামতে হল ভজুকে। এ সময়টাতে কয়েক মাস অনুপস্থিতির পর যুঁই এল বাপের বাড়ী থেকে।

এ সে যুঁই নয়, যার ঠোঁটে ভজন দেখেছিল মৃণ্ময়ীর হাসি। এ সে যুঁই নয়, ফুলশয্যার রাতে

ঘুম ঘোরে যার সারা মুখে ছিল ক্লান্তি ও তৃপ্তির আবেশ মাখানো। সেই উৎসবের রাত পোয়াতে যুঁইয়ের মনে হয়েছিল, সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে এক ভিড় করা নরকে এসে হাজির হয়েছে। সেদিনও বাড়ীতে অনেক লোক, কিন্তু চুপচাপ। একটা ফিস্‌ফিসানি ও টেপা হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরে ঘরে, উঠোনে, পাতকোর পৈঠায়, খিড়কির দরজায়। যুঁইয়ের মুখটা যেন জ্বলন্ত প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ার মত হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সে অন্ধকারে এক অসহ্য বিস্ময়ের ছটফটানি। সে যেন ভুলে গিয়েছিল, কোথায় এসেছে সে, কি হয়েছে তার। টের পেল না, ভেতরে তার কয়েকদিন আগের কুমারী কিশোরীটি নিঃশব্দে হাহাকার করে কেঁদে উঠেছে।

কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা তার। সে কাঁদেনি। বাপের বাড়ী গিয়ে বলেনি কোন কথা। জিজ্ঞাসা করেনি কাউকে কিছু। দিন চলে গিয়েছে। গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে ঘুমন্ত ভজনের মুখের দিকে। সে মুখ ঘুমন্ত নয়, জাগ্রত নয়, যেন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। কেন ? কি হয়েছে? যুঁইকে কি তার ভাল লাগেনি! কি তোমার ভাল লাগে, কোনদিন তো তুমি বলনি, জানাওনি আগে। যুঁইয়ের যা ছিল, সে তো সবই নিয়ে এসেছে। সে নিজে ছাড়া তার তো আর কিছু ছিল না। নিজেকে তো তার কোনদিন মন্দ মনে হয়নি; তার সবটুকু তোমারই জন্য নিয়ে সে বসে আছে। তবে? তবে তোমার কি হয়েছে?

বছর ঘুরে গিয়ে ছেলে এল যুঁইয়ের কোলে, কিন্তু নিজেকে সঁপে দেওয়া তার হল না। সেই অস্থির মানুষটিকে ভালবেসেছে সে, কিন্তু সে ভালবাসা জয় করতে পারেনি তাকে। সে হল যেন পটে আঁকা বিষাদ রাগিণীর মত।

সেই সময় বাপের বাড়ী থেকে এসে সে দেখল, বিশৃঙ্খল সংসার। শ্বশুর আরও নিস্পৃহ, ভাসুর জেল বন্দী। বকুল মা বিষণ্ন ও বিরক্ত। চায়ের দোকান বন্ধ। স্বামী কি এক দুর্বোধ্য অস্থিরতায় ছট্‌ফট্ করে ঘুরছে। হয়তো অতিরিক্ত মদ খাওয়া শুরু হয়েছে।

সেইদিনই বিকেলে সে ঘুগ্‌নি তৈরী করে দিল দোকানের জন্য। ভজন একমুহূর্ত নির্বাক থেকে তাড়াতাড়ি গিয়ে দোকান খুলে বসল।

মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন হালদার। তাঁর বোতল থেকে ভজনের মদ খাওয়ার কথা জানতে পেরে ফুলশয্যার পরদিন তাঁর গোঁফের ফাঁকে একটা অদ্ভুত হাসি খেলে গিয়েছিল। তারপর থেকে প্রায়ই দেখা যেত, তাঁর মদের বোতল কেমন করে রোজই ভজনের ঘরে চলে যায়। ভজনও সে বোতলের অভ্যর্থনা করতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সেটা বেশীদিন চলেনি। আবার আপনা থেকেই সে থেমে গিয়েছিল। বিশেষ, বাড়ীতে পুলিশের হামলার পর থেকেই এদিকে একেবারে ঢিলে দিয়েছিল সে।

সেবারে যুঁই ফিরে আসতেই হালদার ধরে বসলেন ভজুকে। অনেক নথিপত্র ঘেঁটে বার করলেন খানকয়েক কাগজ। কাগজগুলো কয়েকটা বেনামা দলিলের নকল। আসলগুলো সংগ্রহের আশ্বাস দিয়ে তিনি ভজনকে মামলা করতে বললেন। এ বিষয়ে, যুঁইকেও প্ররোচিত করতে ছাড়লেন না।

বকুল মা আচমকা সংসারের সমস্ত দায়িত্ব যুঁইয়ের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন নিজের সংসারে। তাঁর কর্তব্য ফুরিয়েছে। আজ আর তাঁর অভাবে অচল হয়ে থাকবে না সংসার। যতদিন দরকার ছিল, ততদিন ছিলেন।

সমস্ত ব্যাপারগুলো এমনভাবে ঘটে গেল যে, ভজন কিছুদিন অসাড় হয়ে রইল একেবারে। এদিকে সংসার অচল। তারপরে হঠাৎ একদিন সে দোকানে বসে বাঙ্গালীর সঙ্গে মদ খেল। খেয়ে বাড়ীতে এসে চীৎকার করে জানিয়ে দিল, সে নীচু জাতের এঁটো খেয়েছে।

হালদার ভেবেছিলেন, এই সুযোগ। তিনি যেমনি কথাটা আবার পাড়তে এলেন, ভজন পরিষ্কার বলে দিল, 'কোথায় মন্তর দিচ্ছ? পরের পেছনে লাঠি দেওয়া, ভজুর দ্বারা হবে না বুঝেছ? যাদের পরামর্শ দাও, তাদের বলোগে, আমাকে ব'লো না।'

এতদিন পরে প্রকৃতপক্ষে হালদারের জীবনের সমস্ত আশা নিভে গেল। আর একবার স্ত্রীর মুখ মনে পড়ল। সেই দুর্জয় হাসি ভরা মুখ। সে হাসি যেন তাকে চীনা সার্কাসওয়ালার শানিত ছুরির বেষ্টনীর মধ্যে আটকে রাখল। নিপুণ খেলোয়াড়ের মত আর বেরিয়ে আসতে পারলেন না। এমনকি, তাঁর বকুলফুলও চলে গিয়েছেন। এক ফোঁটা মদের জন্যও কারুর দ্বারস্থ হওয়া চলবে না। নারায়ণ তো কবেই ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। একটু আশা যদিও হয় যে, সে যদি পুলিশের হাতে লাঞ্ছনায় আবার মোড় ফেরে। কিন্তু সে অনেক দূরের কথা। আর আছে বউমা যুঁই। কিন্তু সে ভজুর স্ত্রী। ইচ্ছা থাকলেও স্বামীর অমতে সে কিছুই করতে পারবে না।

নিজের উপরে হালদারের বিরক্তির সীমা ছিল না। দিবারাত্র তার সুযোগ সন্ধানের মাঝে, তিনি আশা করেছিলেন, সুরথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় কোন একটা দিক দিয়ে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করবেন। সে সময়ে কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বের প্রতিযোগিতায় বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন তাঁর কাছে। কিন্তু ভজনের জন্য সেই ভদ্রলোককে তাঁর পূর্ণ সম্মানটুকু পর্যন্ত তিনি দিতে পারেননি। দেশবন্ধুর স্বরাজী প্রতিনিধিকেই হালদার আশ্বাস ও ভরসা দিয়েছিলেন যার সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্কে কোন কথাই চলে না। এই প্রতিনিধি যুবক অবিবাহিত ডাঃ প্রধান চন্দ্র রায়। দেশবন্ধুর নামাঙ্কিত জয়তিলক এঁর কপালেই ছিল।

কথা দিয়েছিলেন একে হালদার এবং মর্যাদা রেখেছিলেন কথার। কিন্তু হালদারের কপালে ক্ষোভের রেখা এঁকেবেঁকে উঠল, নিজেকে শুধু ধিক্কার দিলেন। নিশ্বাসে নিশ্বাসেই আয়ু ক্ষয়ে গেল তাঁর এ বয়সের প্রতীক্ষিত বসন্তের।

সেই সময়টাতে ভজনও উঠে পড়ে লাগল তার নতুন দোকানের জন্য। একটি একটি করে গহনা দিয়ে নিজেকে নিরাভরণা করেছে যুঁই। তাতে তার প্রাণে আপশোস ছিল না, সে তার গচ্ছিত সমস্ত কণাটুকুও তুলে দিয়েছে ভজনের হাতে। দেবতার পুজো দেওয়ার মত দিয়েছে। ভজনও খরচ করেছে তার ধূলিকণাটুকু। ভোটের সময় স্বরাজী দলের কাছ থেকেও সে কিছু পেয়েছিল। সবই ঢেলে দিল সে তার দোকানের পায়ে। দোকান প্রতিষ্ঠার পরও কেটে গিয়েছে তিনটি বছর।

ভজন গাইছে, 'ডুব দে রে মন জয় কালী বলে।' গাইছে না, জড়ানো গলায় অদ্ভুত সুরে আবৃত্তি করছে। হঠাৎ মনে হয় একটা কালা ব্যাং বর্ষার আভাস পেয়ে উল্লাসে ডাক ছেড়েছে।

বাংলার দক্ষিণে জেলার উত্তর মফঃস্বলের একটা জংশন স্টেশন। ভজুদের বাড়ী থেকে আধমাইলটাক উত্তরে। সন্ধ্যাবেলার ভিড়ে চারদিক গুলজার। তার মাঝখানে ভজনের গলার স্বর কারুর কানে গেল না।

শীতের আমেজ পড়েছে। শীত আসছে। হাওয়া নেই। রেল ইঞ্জিনের ধোঁয়া, রাস্তার ধুলো,

আশেপাশের দোকান ও বাড়ীর উনুনের ধোঁয়া যেন ভারী কুয়াশার মত ছড়িয়ে রয়েছে। আকাশে তারা উঠেছে, ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট।

ষ্টেশনের তিনটে প্ল্যাটফরমেই আলো জ্বলে উঠেছে। যাত্রীর ভিড় আর কোলাহলে মুখরিত ষ্টেশন। সামনের প্ল্যাটফরমে মৌরসী পাট্টা গেড়েছে কতকগুলি বিদেশী ভবঘুরে ভিক্ষুক। পুলিশের শাসানি আর রুলের গুঁতো ওদের তাড়াতে পারেনি। সারাদিনের পর ওরা এসে জড়ো হয়েছে মেয়ে পুরুষ যোয়ান বাচ্চার দল। শুরু হয়েছে দৈনন্দিন চেঁচামেচি, পাওয়া না পাওয়ার হিসেব নিকাশ। এ সময়টাতে ট্রেনে যাতায়াত বেশী, বেশী তাই যাত্রীর ভিড়। কলকাতার চাকুরে দৈনিক যাত্রীরা ফিরছে। ব্যস্ত পশ্চিমা কুলিরা ছুটাছুটি করছে এদিকে সেদিকে।

এক নম্বর প্ল্যাটফরমের গায়ে প্রশস্ত রক। প্ল্যাটফরমের সঙ্গে পার্টিশন দিয়ে সেটা এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যেন রকটার সঙ্গে ষ্টেশনের কোন কারবার নেই। কেননা রকটা সিঁড়ি, রাস্তার উপরেই। কাজেই ষ্টেশনে দরকার থাক বা না থাক, এ ছুটির সময়ে ও সন্ধ্যাবেলার ঘরছাড়া মানুষের দল এই রকের ওপরে বসে বসে কেউ বাদাম ভাজা চিবোচ্ছে, কতকগুলো হয়তো প্রবাসী ছেলে পার্টিশনের রেলিং এর উপর ঝুঁকে রয়েছে গাড়ী দেখবার জন্য। কারখানার পশ্চিমা প্রবাসী মজুরেরা কয়েকজন এক কোণে বসেছে গামছা পেতে। গান ধরেছে সরু তীব্র গলায়, টেনে টেনে, কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। কোলাহলের মাঝে এ গানের সুর যেন মৃত্যু কলরবের মধ্যে কার টেনে টেনে কান্নার মত। রকের উত্তরদিকে চায়ের দোকান দক্ষিণ ঘেঁষে টিকিট ঘর। তার পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছে ওভার ব্রীজে ওঠার কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়িটা এমনভাবে পাঁচিলের আড়ালে পড়ে গেছে, তার নীচেই রাস্তা-মুখো খোলা রকটা উইংস-এর পরেই যেন প্রশস্ত নাট্যমঞ্চ। এখুনি কে নেমে আসবে, কিছুই বোঝা যায় না। তুমি যখন ভাবছ, এবারে এক রূপসী মেয়ে নেমে আসবে তখন দেখা গেল রেল কলোনী ঘুরে একটা বিড়াল নিরাপদে এল রকে।

রকের নীচেই রাস্তা। ইট ভাঙ্গা খোয়া বাঁধানো রাজপথ। পথের ধারে, ষ্টেশনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ী। জোড়া হিসেবে ছটা ঘোড়ার দুটো মাদী। সে দুটোই সবলা। তাদের চোখের পল্লবগুলো বড় বড়, চকিত চাউনি, উৎকর্ণ কান নড়ে নড়ে উঠছে, ঝাপটা মারছে লেজ দিয়ে। মর্দাগুলো রুগ্ন, ঘেয়ো, চোখগুলোতে পিচুটি ভরা। মাছির দৌরাত্ম্যে চোখ বুজে খালি ঝিমোচ্ছে। তা' বলে সাজগোজের বহর কম নয়। ঘোড়ার গলায় চামড়ার বকলসে চকচকে ঘুংগুরের মালা, তার উপরে দু'পয়সাওয়ালা রঙিন চট ফেঁসোর মালা পরিয়েছে যাত্রার দলের সং-এর মত। ছাই দিয়ে মাজা ঝকঝকে বিলিতি লোহার শিরস্ত্রাণ রয়েছে মাথায়।

ঘোড়ার জলদানিটার পাশে পাঁচিলের গায়ে লেখা রয়েছে ইংরাজীতে 'ফাইভ্ হর্স ক্যারেজেস্।' রকের সিঁড়ির উত্তর পাঁচিলে লেখা আছে 'ট্যাক্সি ক্যাব স্ট্যান্ড ফর্ থ্রি।' ভুনু গাড়োয়ানের মতে ট্যাক্‌সি ইস্‌টেন্ডটা কোম্পানী ফালতু রেখেছে। ওটাও ঘোড়ার গাড়ীর আস্তানা করলেই ঠিত হত। কারণ, এ শহরে পাঁচখানার বেশী ঘোড়ার গাড়ী আছে, ট্যাক্সি বোধ হয় একখানার বেশী নেই। অবশ্য কল মিলের সাহেব সুবোদের আছে প্রাইভেট গাড়ী। তার জন্য আছে প্রাইভেট আস্তানা। পার্থক্যটা যাকে বলে বাজারী আর ঘরোয়া।

ট্যাক্‌সিটার চেহারাও বাজারের মত। দাঁত খিচনো বুড়োর মত হেড্‌লাইটের দুটো ড্যাবা

অথচ ঝাপসা দাগ ধরা চোখে যেন গাড়ীটা উল্টোদিগের দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। ওয়াটার-প্রুফের হুড়টায় তালি পড়ে পড়ে এখন আর ওয়াটার নয়, ওটা তালি প্রুফ হয়ে গিয়েছে। কাছাকাছি কয়েকটা চটকল আছে বলে সপ্তাহের শেষে ক'দিন গাড়ীটাকে কম দেখা যায়। যে সব সাহেবের গাড়ী নেই, তারাও কোন কোন ছুটির দিন এই গাড়ীটাতে কলকাতা যায়। তা ছাড়া তেমন দু'একটা বিয়ে অথবা মরণাপন্ন রোগীকেও গাড়ীটা কালে কচিৎ বয়ে বেড়ায়। বাদ বাকী দিন, এখানকার মতই ধুলো মলিন জঞ্জালের মত পড়ে থাকে।

আরও খানিকটা উত্তরে একটা মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখে মনে হয় রাস্তার ধারে একটা পান বিড়িওয়ালার চৌকো গুমটিঘর। ওটা বাস। গাড়ীটার লাল রং, গায়ে সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে 'পুষ্পময়ী'। এখানে বাস রুট বলে কিছু নেই, অন্যান্য গাড়ীর মত ওটা রিজার্ভেই চলে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার রোজকার মতই সন্ধ্যাবেলা অনুপস্থিত। বড় গাড়ীটার ড্রাইভার নীচে দাঁড়িয়ে হর্ন টিপছে আর চীৎকার করছে। জনা তিনেক লোক জুটেছে তার এতক্ষণে। সেই পরিমাণে চীৎকার করছে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা।

চীৎকার ও সন্ধ্যাবেলার ভিড়ে সমস্ত অঞ্চলটাই যেন একটা বাজার হয়ে উঠেছে। রাস্তার অপরদিকে, পশ্চিমে কতকগুলো সারি সারি দোকান। সবই প্রায় ময়রার ও পানবিড়ির দোকান। সেই দোকানগুলিতেও ভিড়।

তার মধ্যে যে দোকানটি এক নজরে চোখে পড়ে, সেটা একটা এখনকার আমলের হালফ্যাসানের রেস্টুরেন্ট। ষ্টেশনের ঠিক উল্টোদিকেই রাস্তার উপরে সবচেয়ে বড় সাইনবোর্ডটায় লেখা রয়েছে, শ্রীমতী কাফে। সেই সাইনবোর্ডটা যেন অল্পবয়সী গেঁয়ো বরের মাথায় একটা মস্ত টোপরের মত হয়েছে। হরফগুলো প্রায় এক ফুট লম্বা। খুব ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কাফে কথাটার ঠিক পরেই ছোট্ট ক'রে পেন্সিল দিয়ে লেখা রয়েছে 'র'। লেখক রসিক নিঃসন্দেহে, সাহসীও বটে। শ্রীমতী কাফের নীচে ছোট ক'রে লেখা রয়েছে, স্থাপিত ইং ১৯২০ সাল।

কাফের সামনে চওড়া বারান্দা। বারান্দার পরেই সুদৃশ্য দরজাটা দেখবার মত। ঘরটার সামনের দিকে দেয়াল নেই, দুটো বড় বড় পাল্লার দরজা। মেহগিনি কাঠের ফুল কাটা দরজা। নক্‌সা কাটা আলমারীর মত দরজার উপরের অর্ধেক কাচ লাগানো। কাচের চারপাশে ফ্রেমের কারুকার্য সুরুচিসম্পন্ন। সেই কাচের দুদিকে বাংলা ও ইংরাজীতে লেখা রয়েছে, শ্রীমতী কাফে। ভিতরে আসুন। প্রোঃ শ্রীভজনানন্দ হালদার। চৌকাটের গায়ে ডান কোণের দেয়াল ঘেঁসে কাউন্টার।

ঘরটা মাঝারি। দেয়ালের ফুট তিনেক, তিনদিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো। তাতে চাঁদমালার রং-এর নক্‌সা। তার উপরেই দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা রয়েছে ঘরটার তিনপাশ জুড়ে শ্বেত পাথরের টেবিল। দরজা বরাবর দেয়ালে একটা পুরনো আমলের দেয়ালঘড়ি। ঘড়িটা দামী। সেটাও মেহগিনি কাঠের নিখুঁত নক্‌সা কাটা ফ্রেমের মধ্যে চোখ সওয়া রুপোর গোল পাতের উপর সময়ের অংক লেখা রয়েছে। পেন্ডুলামে দুলছে একটা নরকঙ্কালের মুণ্ডের ছবি। ঘড়িটার ঠিক উপরেই গদা চক্র ও শঙ্খ পদ্মধারী একটা নরনারায়ণের ছবি রয়েছে। আরও কতকগুলো বিলিতি প্রিন্টিং রয়েছে। সবই মনোরম ল্যান্ডস্কেপ। এগুলো রঙিন। তাছাড়া বিলিতি

অনুকরণের কয়েকটা দেশী ল্যান্ডস্কেপের ছবি রয়েছে সসের কাজ করা। আর দুখানি বিলিতি আয়না রয়েছে দুদিকে।

ঘরটার তিনদিকে সারি সারি ফোল্ডিং চেয়ার পাতা। ইলেকট্রিকের তিনটি বাত্তি জ্বলছে দুধের মত সাদা চিনেমাটির শেডের মধ্যে। শেডের গায়ে লেখা রয়েছে শ্রীমতী কাফে। সেই আলো পিছলে পড়ছে লাল চকচকে মেঝের উপর।

পেছনে রয়েছে আর একটা ফালি ঘর। সেটার সরঞ্জাম ও আয়োজন, সবই যেন সামনের ঘরটাকে সব দিয়ে থুয়ে ফকিরের মত পড়ে আছে। বলা চলে, রঙ্গমঞ্চের আড়ালে রং ও ধড়া চূড়া ছাড়া একটা অবহেলিত অন্ধকার জায়গা। এ ঘরটায় রেস্টুরেন্টের নিজস্ব সরঞ্জাম কিছু কিছু থাকে। ঘরটার ধরনধারণ দেখে মনে হয়, এ ঘরটাকেও মালিক সাজাবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। কলের মুখ লাগানো জলের পিপে রয়েছে এক কোণে। একটা লম্বা সরু টেবিলে ছড়ানো রয়েছে কয়েকটা এঁটো চিনেমাটির প্লেট, পিঁয়াজ কুঁচো, পাঁউরুটির গুঁড়ো, ঘুগনির শুকনো দানা। টেবিলের তলায় রয়েছে এলোমেলো কয়েকটা খালি বোতল। মদের বোতল।

তার পেছনের ঘরটাতেই রান্না হয়। এটা ঠিক ঘর নয়, টিনের শেড আর ছিটে বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া একটা অন্ধ খুপ্‌রি বিশেষ। মেঝেটা কাঁচা, এবড়োখেবড়ো। একদিকে ঘুঁটে আর কয়লা, একটা মাটির জলের জালা, কাপ প্লেট ধোয়ার জায়গা, অন্যদিকে উনুন। উনুনের পাশে জাল আলমারীতে খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

ঘরটার পেছনের কোলেই কাঁচা নর্দমা। পেছন দিকে যেতে হলে ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে নর্দমাটা পেরুতে হয়। নর্দমার পাশে স্তূপাকার হ'য়ে আছে নোংরা রাবিশ। কারণ নর্দমাটার পরেই যে থমকানো অন্ধকার ছোট জায়গাটুকু রয়েছে, তারপরের এলোমেলো চালাগুলো স্থানীয় বাজারের আলো এখানে এসে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কেবল সন্ধ্যাবেলার গোলমাল শোনা যাচ্ছে। বাজারের কলকোলাহলের মধ্যে আশ্চর্যরকমভাবে দু' একটা গলা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। মনে হ'চ্ছে, কাছে দাঁড়িয়েই কেউ যেন বলছে, 'সুদের কারবারে বাপ পিতা মো' কেউ নেই! আসলটা তো ফাঁকি, সুদটা হল হকের ধন। আরো সাড়ে তের গণ্ডা চাই।' তারপরেই একটা ঝনাৎকার শোনা যায় একগোছা কাঁচা পয়সার।

বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে, ঘড়িটার ডানদিকে রয়েছে দেশবন্ধু সি. আর. দাশের একখানা ছবি। ছবিটার নীচে লেখা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত মর্মোক্তি :

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

আর একটা বড় ফ্রেমের মধ্যে ছোট ছোট চারখানা ছবি রয়েছে। র‍্যাফেলের মা ও ছেলে, মেরী মাতা, রবীন্দ্রনাথ ও সিরাজদৌল্লা। এ চতুষ্টয়ের একত্র সমাবেশ কেন, তা এ কাফের মালিক ভজনানন্দ ছাড়া অন্যের পক্ষে বলা শক্ত।

ভজনানন্দ, ভজন, ভজু, নেকো হালদারের ছেলে, গ্রাজুয়েট, নারাণ হালদারের ভাই ভজুলাট। সবাই জানে, তার সব বিষয়েই একটা বিশেষ বক্তব্য থাকে। তার শিক্ষার প্রতি সকলের সম্ভ্রম আছে, কিন্তু একটা দোষে সব মাটি করেছে। ভজন আর সে ভজু নেই। সে আজ মদ্যপ, চব্বিশ ঘণ্টা তাকে মদ রাহু গ্রাস ক'রে রাখে। এ অঞ্চলের শিক্ষিত ও মাননীয় কয়েকজন সুরাসক্ত ব্যক্তি মারাত্মক পোড় খেয়েছে তার কাছে। একসঙ্গে মদ খেতে গিয়ে

ভদ্রলোকদের হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে হাটের মাঝে। তা ছাড়া সে চিরকাল দুর্বিনীত, দুর্মুখ, তাই বন্ধুহীন।

অনেকদিন থেকেই আজ তার ভজুলাট নাম সার্থক হয়েছে। এই যে সে মাতাল হ'য়ে ঘুরছে কাফের ভিড়ের মধ্যে, তাতে তার জীবনের প্রতি যত অবহেলাই ফুটে থাক, মনের তলের সৌখিন মানুষটা আজ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার সিল্‌ক্‌ টুইলের কলারবিহীন, শক্ত আমেরিকান কফের খাটো জামা (খাটো জামা-ই বর্তমানের ফ্যাসান), কালো সরু পাড়ের কোলে জলচুড়ি আঁকা দিশি ধুতির লুটনো কোঁচা, তার তলায় আন্ডার-ওয়্যারের আভাস। পায়ে গ্রেসকিডের জুতো, গলাবন্ধের কাছে একটি মাত্র পানপাতার ছাঁচে সোনার বোতাম, কানের উপর থেকে নিখুঁত ক'রে কামানো মুখ, আজকে আর এসব তার এখন-তখনের জন্য নয়, সর্বক্ষণের। আজকে তারকা চিহ্নিত ম্যাগনাম সাইজ ক্যাপস্টান তার তীক্ষ্ণ রক্ত রেখায়িত ঠোঁটের একটা অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। ভজুলাট বাজারে গেলে, বেচনেওয়ালা বলে, এতক্ষণে এল একটা খানেওয়ালা।

মনে হতে পারে ভজনের পরিবর্তন হয়েছে। এটা যদি পরিবর্তন হয়, তবে তা অভাবিত নয়। জীবনে তার নতুন ক'রে কোন ছন্দ বাঁধা হয়নি, পেছনে গড়ে ওঠেনি একটু নিরাপত্তা। তার অসহায় মনের বেগ একটা অন্ধ পাখীর মত নিরুদ্দেশের পথে উড়ে চলেছে। যুক্তি তর্ক কারণ অকারণ তার কাছে তুচ্ছ। অনেকদিন আগের শ্মশান থেকে ফেরার সেই অভিশপ্ত জীবটিই যেন আজও ছুটে চলেছে। সেদিন সে ভেবেছিল, একজনকে তার চাই, যার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে শান্তি পাবে। তার জীবনের অদৃশ্য লোক থেকে উঠে আসা সমস্ত সংশয়কে ঘুচিয়ে দেবে।

কিন্তু রাত পোহাল না ফুলশয্যার, পথের আলো হঠাৎ বেঁকে গেল অন্যদিকে। সেদিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে সে দেখল, তার পথ হারিয়েছে। সেই রাতেরই উন্মাদনার পরিণতি এই শ্রীমতী কাফে।

ভেবেছিল সে, এর নাম দেবে যুঁই কেবিন। কিন্তু আসল যুঁইয়ের যেমন সাড়া ছিল না, তেমনি কোন সাড়া পেল না ভজন নিজের মনে। আশ্চর্য। অতীতে বা ভবিষ্যতেও যার কোন ভালবাসার পাত্রী নেই, বর্তমানেও যুঁইকে ভালবাসা দিতে গিয়ে যা থিতিয়ে গেল, তার সেই অস্থির মনটাকে একটা ঝাপসা চেহারায়, কে যেন হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে চলেছে। তার কোন স্পষ্ট মূর্তি নেই, হাসি নেই, চোখ নেই, শব্দ নেই। তার কোন নাম নেই। শুধু ভজন যখন নিজের সঙ্গে কথা বলে, তখন বলে, কে তুমি শ্রীমতী। জীবনটা তো ছেড়ে দিয়েছি তোমারই হাতে। আর তোমার কি চাই।

এই শ্রীমতী কাফে তার এই কল্পলোকের শ্রীমতী। শ্রীমতীর পেছনে ফ্যাসানদুরস্ত কাফে কথাটা জুড়ে দিয়ে এটাকে সে রেষ্টুরেন্ট করেছে। কিন্তু এ শুধু তাই নয়। একে সে সাজিয়েছে তার সর্বস্ব উজাড় করে। এরই পায়ে ঢেলে দিয়েছে সে তার সব ধূলিকণাটুকু, তার অস্থির প্রাণের মমতা বিবেক ও বুদ্ধি। এই তার প্রিয়া ও প্রেয়সী, তার জীবন। মানুষের কিছু না থাক তবু কিছু চাই। সেই কিছু তার শ্রীমতী কাফে।

অন্য কোন কিছুতে তার গর্ব নেই, গর্ব তার শ্রীমতী কাফেকে নিয়ে। আর সত্যি বলতে কি কলকাতার এ দূর শহরতলীতে এরকম আর একটা দ্বিতীয় রেষ্টুরেন্ট নেই। বাহুল্য হবে না একে অদ্বিতীয় বললে। দশ বারো মাইলের মধ্যে সবাই চেনে শ্রীমতী কাফেকে।

ভজন বলে, পরাধীন যখন থাকতেই হবে তখন তার মধ্যে আর নতুন বেড়াজালের সৃষ্টি না করে একদিকের স্বাধীনতা তো বজায় রাখা যাবে। বড় সাহেব ছোট সাহেবের দয়াও নেই, চোখ রাঙ্গানিও নেই। এখানে লাট বেলাট যা-ই বল, সবই ভজন।

ছেলে ছোকরারা সুযোগ পেলে শ্রীমতী কাফেতে এসে একটু ফষ্টিনষ্টি করে খাওয়াটাকে একটা বিশেষ কিছু মনে করে।

প্রতি মুহূর্তে একে ধোয়া মোছার অবসর নেই। শ্রীমতী কাফে সবসময় ঝকঝকে তকতকে, ফিটফাট ভজুলাটের ফুটফুটে বিবিটির মত পোষাকি বাহারের জেল্লায় উজ্জ্বল। একে ভজু নিজের হাতে সাজায়, দাঁড়িয়ে থেকে পরিষ্কার করায়। সময়েতে জল ন্যাতাটি নিজের হাতে না বুলোলে তার স্বস্তি হয় না। মফঃস্বলবাসী অনেকের শ্রীমতী কাফেতে হঠাৎ ঢোকা যেন এক মহা ফ্যাসাদ ছিল। কেননা এর পরিবেশ ও সজ্জা এক মুখে আমন্ত্রণের হাসি আর মুখে গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন এখানে ঢোকার আগে খদ্দেরকে তার ক্লাশটা বেছে নিতে হবে।

তা ছাড়া স্বয়ং ভজুলাট কাউন্টারে। তার মস্ত চেহারা ও চোখ দেখেও কাউকে কাউকে পেছিয়ে যেতে হয় বৈকি। এমন অনেক অল্পবয়সী ছোকরা আছে, যারা স্রেফ্ চোরের মত খেয়ে উঠে পড়ে। সেটা শ্রীমতী কাফের দোষ নয়, খদ্দেরের ভাগ্য।

স্থানীয় অনেকে অবশ্য এটাকে ভজুলাটের চাটের দোকান আখ্যা দিয়েছে। ভজু বলে, 'চাটের দোকান হতে পারে কিন্তু কোন্ রসের, সে জানে রসিকজনেরা। তা ছাড়া সাধ্যি থাকে, ব্যাটারা মদের পাঁট নিয়ে একবার এসে প্রমাণ করে দিয়ে যাক এটা চাটের দোকান।' সত্যি, তেমন সাহস ছিল না চাটের দোকান আখ্যাদাতাদের।

শ্রীমতী কাফেতে এখন সন্ধ্যাকালীন ভিড় লেগেছে। ভিড় করেছে মফঃস্বলের সৌখিন যুবকেরা। রামপাখীর মাংস খাবে, অর্থাৎ মুরগীর। যাকে বলে ফাউলকারি। স্থানীয়ভাবে হিন্দুভদ্রলোকদের সেজন্যও একটা বিদ্বেষ ছিল শ্রীমতী কাফের উপর। একে তো ভজুলাট মাতাল, তায় আবার তার দোকানে যত ম্লেচ্ছ খাবারের কারবার। এ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেক যুবকের কাছেও ভজুলাটের দোকান রীতিমত পরিত্যাজ্য। বাজী ধরে মুরগীর মাংস খেয়ে শ্রীমতী কাফের কোলে অনেকে অন্নপ্রাশনের ভাত রেখে গিয়েছে। অভিভাবকেরা ছেলেদের শ্রীমতী কাফেতে আসার কথা শুনলে রীতিমত কণ্টকিত হন। একে তো জাত নেই, ছেলেরা এখানে এলে নাকি আবার একেবারে বিগড়ে যায়। তাছাড়া আছে পাঁঠার মাংস, ভজন বলে মটন কারি। চপ, কাটলেট, ঘুগ্‌নি, তেল ঝালের রসান দেওয়া মুখরোচক সব খাবার। ভজন আর কিছু না হোক, জন-রসনার আদিম রুচিটা সে বোঝে। খাবার তৈরী করে সে নিজের হাতে। এ হাতটার কেউ বদনাম করতে পারেনি আজো।

খদ্দের ছাড়া অখদ্দেরেরও ভিড় হয়েছে। হীরেন আর কৃপাল তাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যাকালীন আড্ডা জমিয়েছে যথাপূর্বং নস্যির টিপ বাগিয়ে ধরে। পয়সা দিয়ে কিছু খাওয়া দূরে যাক, উল্টে দু কাপ চা খেয়ে যাবে বিনা পয়সায়।

পেছনের ঘরে, জলের পিপের সামনে চওড়া বেঞ্চিটাতে আশ্রয় নিয়েছে একটি ইউ, পি-র ছেলে। আশ্রয় নেয়নি, আত্মগোপন করেছে। কানপুর থেকে কিছু রিভলবারের পার্টস নিয়ে আসতে হয়েছে তাকে তার দলের কাজে। ছোটখাটো ছেলেটি, শক্ত শরীরে কলিদার পাঞ্জাবী

আর পায়জামা পরা একটা রুক্ষ সহজ সৌন্দর্য রয়েছে তার। নাম তার সুরজ সিং। এসে পৌঁছুতেই এ অঞ্চল থেকে বেরুবার তার সমস্ত পথ পুলিশ আটকে ফেলেছে। নিশ্চয়ই সংবাদ পেয়েছে পুলিশ তার আসার কথা। রথীন সুনির্মলের দল কোথায় রাখি কোথায় রাখি করে আর কোথাও ঠাঁই পেল না, এনে তুলেছে শ্রীমতী কাফেতে। তবে সুরজ সিং হল অন্তরালের মানুষ। তার সঙ্গে শ্রীমতী কাফের এ খোলা রঙ্গমঞ্চের কোন সম্পর্ক নেই।

এসব অখদ্দেরের ব্যাপারে ভজনের হাত নেই, এটা আবার শ্রীমতী কাফের ভাগ্য। ভজন বলে, এরা অখদ্দের নয়, অখাদ্যের দল। এরা বললে শোনে না, দুর্ব্যবহার করলে আপনি কেটে পড়বে। কিন্তু সেটুকু ভজন, আর যাদের সঙ্গে হোক ওদের সঙ্গে পারবে না করতে। এসেছেন গোলক চাটুজ্জেমশাই যথারীতি তাঁর থেলো হুঁকোটি হাতে নিয়ে। তাঁর বয়স ও সঙ্গী থেলো হুঁকোটিকে এ যুগের শ্রীমতী কাফের দুর্জয় ষ্টাইল যেন চোখ রাঙ্গিয়ে শাসায়। যেন বলতে চায়, আদ্যিকালের বুড়োটার কি একটু লজ্জাও করে না। চাটুজ্জেমশাই এসব ফ্যাসান দেখে হাসেন আর মনে মনে বলেন, যতই তোমার গা জ্বলুক, ঘরের গিন্নি বিবি সাজলে কি আর মানুষটা বদলায়। দোকানটা যে গাঁয়ের ভজুলাটেরই। তাঁর লাট-মেজাজী পড়শী নাতির।

সন্ধ্যাকালের এ জমাটি আসরে তিনি ফেঁদেছেন মাছ ধরার গল্প। গল্প তো নয়, সে যেন গান ধরা। ধরলে আর ছাড়েন না, শ্রোতারা বিশ্বাস করুক বা না করুক, না শুনে উঠতে পারে না।

রাস্তার হট্টগোলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে শ্রীমতী কাফের কলকোলাহল। রাস্তার আর দোকানের ভিড় যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। কেবল পুষ্পময়ীর হর্নের গাধা চেঁচানোর মত শব্দ ও গাড়োয়ানদের বিচিত্র ভাষার চীৎকার রাস্তার গণ্ডগোলকে বাড়িয়ে তুলছে বেশী করে।

ভজন মুখ গুঁজে পড়েছিল টেবিলের উপর। মুখ তুলে সে তাকাল টেবিলের দিকে। শ্রীমতী কাফের মালিক। টানা চোখ জোড়া তার লাল হ'য়ে উঠেছে। চাউনিটা ঢুলুঢুলু। টেবিলের উপর ছড়ানো কতকগুলো পয়সার দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে দৃষ্টিটা তার ট্যারা হ'য়ে উঠল। এমনিতেই তার ঠোঁট দুটো যেন রক্ত রেখায় বেঁকে থাকে। এখন এ্যালকোহলের চড়া ডিগ্রিতে তার গালে আর ঠোঁটে যেন রক্ত ফেটে পড়েছে। এ বয়সেই মেচেতা পড়েছে তার চোখের কোলে। কপালে পড়েছে দুটো সুস্পষ্ট রেখা।

সন্ধ্যার ঝোঁকেই পানের মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়ে গিয়েছে। মাথাটা দুলছে যেন হাওয়ায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে উঠে বলে উঠল,

এ কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালে
তারা জ্বলে কার ভালে।

তারপর আপন মনে জিজ্ঞাসা করল, 'কার ভালে হে!'

নিজেকে দেখিয়ে বুক ঠুকে বলল, 'এই আমার ভালে, ভজুলাটের বুয়েছ বাছা।'

পরমুহূর্তেই টেবিলে একটা চাপড় মেরে হাঁক দিল, 'বি-শে।'

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বিশে। বিশ্বনাথ। শ্রীমতী কাফের চাকর। খাবার পরিবেশন আর কাপ ডিস্ ধোয়া তার কাজ। লোকটার বিশাল শরীরে ছোট একটা মাথা যেন বসিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। মুখটা দেখলে গডুর পাখীর চেহারা মনে পড়ে যায়। ছোট্ট ছোট্ট চোখ দুটোতে তার

নিয়ত ব্যস্ততা। এদিকে ওদিকে দেখে আর চোখ পিটপিট করে, থেকে থেকে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে।

ভজনের ডাকে সে সাড়া দিল না, নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়াল।

ভজন রক্ত চোখ কুঁচকে বলল, 'কি খাচ্ছিলি ভিতরে বসে?'

বিশে চকিতে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত সরু গলায় বলল, 'মাইরী বলছি, কিছু খাইনি ঠাকুর।'

ব্যাপারটা নতুন নয়, মিথ্যে নয়। বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কয়েকজন হেসে উঠল খালি।

বিশের কাজে বিশেষ গণ্ডগোল ছিল না! একটা কারবারেই সব মাত ক'রে দিয়েছে। ভজন অনেক সময় তাকে রেগে বলে, 'ব্যাটা হাড় হা-ভাতের বাচ্চা।' সত্যি, বিশে যেন সবসময়েই নর্দমার রাত্রিচর ছুঁচোটার মত নোলা ছুঁকছুঁকিয়ে বেড়াচ্ছে। কতদিন ভজন তাকে ধরে ফেলেছে এটা সেটা খাওয়ার সময়। ধরা পড়লে বিশে বলে, এটুস্ চেখে দেখছিলুম। ডিসে ঘুগনি বেড়ে দেওয়ার সময় যে দু' এক ফোঁটা পড়ে যায় বিশে সেটুকুও বাদ দেয় না। চপ কাটলেটের ভাঙা টুকরো পড়ে থাকলে তো কথাই নেই। তবুও তাকে খেতে দিতে ভজনের কার্পণ্য ছিল না।

বিশের কথায় বিশ্বাস হল না ভজনের। বলল, 'হা দে দিকিনি আমার মুখে।'

ব'লে সে খাড়া নাকটা বাড়িয়ে দিল। বিশে বারকয়েক ঢোক গিলে হা দিল।

অমনি ভজন মত্ত গলায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'হারামজাদা মদ খেয়েছিস্?'

বিশে যেন ছ' মাসের শিশুর মত ডুকরে ককিয়ে উঠল, 'মাইরী ঠাকুর, মাইরী খাইনি। বিশ্বাস কর। তুমি নিজে মদ খেয়েছ তাই তোমার নাকে—'

'তাই আমার নাকে গন্ধ লেগেছে?' ব'লে ভজন তাকে টেনে নিয়ে গেল গোলক চাটুজ্জের কাছে। 'বল্, ঠাকুর্দার পায়ে হাত দিয়ে বল্, কিছু খাস্‌নি?'

বিশে খুন করতে পারে, কিন্তু বামুনের পায়ে হাত দিয়ে মিছে কথা ব'লে জ্যান্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে পারবে না। থমকে দাঁড়িয়ে একটা ভীত নেড়ি কুকুরের মত চোখ পিটপিট করতে করতে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল সে। কুঁইকুঁই শব্দের মত তার গলায় খালি শোনা গেল, 'এটুস চবের টুগরো—মাইরী....।'

গোলক চাটুজ্জে তাঁর আপিমের নেশায় আধ-বোজা চোখ তুলে বললেন, 'এবারটা ওকে ছেড়ে দাও দাদা। ফের চুরি ক'রে খেলে রাক্ষসটাকে তাড়িয়ে দিও।'

'তুমি তাই বলছ দাদু?'

'হ্যাঁ দাদা।'

'যা ব্যাটা, বামুনের কথা আর ঠেললুম না।' বলে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাতাল হ'তে পারি, তা বলে এ শর্মাকে ফাঁকি দিতে এখনো আর এক জন্মো ঘুরে আসতে হবে। বেটা রোজ চুরি ক'রে খাবে, এও কি আমার ছিরিমোতি কাফের কপাল?'

চাটুজ্জে বললেন, 'তবে শোন বলি এক খাইয়ের গল্প।'

কয়েকজন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'মাছের গল্পটা তো শেষ হয়নি।'

'হয়নি?' হুঁকো মুখে চাটুজ্জে খল্‌খল্ করে হেসে উঠলেন। চোখ বুজে বললেন, 'সে মাছ বুঝি এখনো খেলছে? ভুলে যাই। সাঁজবেলার মৌতাত কিনা।'

অমনি এক কাপ চায়ের অর্ডার হ'য়ে যায় তাঁর জন্য! হুঁকো নিভে গেলেও চায়ের কথা

শুনে উৎসাহের ধোঁয়া আপনি ছাড়তে আরম্ভ করেন চাটুজ্জে, 'তা' পরে, মাছ তো সেই খেলতে লেগেছে, খেলতেই লেগেছে। কি রে বাবা! এ যে যশোদার নন্দদুলালের চেয়েও এক কাঠি সরেস, খেলা আর থামে না। সন্ধে হ'য়ে গেল, রাত হল, অন্ধকার নেমে এল, জোনাকি পিটপিট্ করতে লাগল চারিদিকে, ঝিঁঝি ডাকতে লাগল। ঘেমে জল হলুম। মাছ আর ওঠে না। তা'পরে......।' তপ্ত চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে মুহূর্ত চুপ থেকে হঠাৎ বললেন, 'মাছ যখন উঠল, হেঁ হেঁ, কি বলব ভায়া পুকুরে এককোঁটা জল নেই।'

হাসির হর্‌রা পড়ে গেল। সত্যি মিথ্যে যাচাইয়ের কোন প্রশ্ন নেই এখানে। শ্রোতাদের কাছে এটুকু পড়ে পাওয়া ষোল আনা।

এদিকে যাদের মন নেই তারা হল হীরেন আর কৃপাল। আর একজন জুটেছে, নাম তার ললিত মুখুজ্জে। সে একজন ঘোরতর মুসলিম বিদ্বেষী। কংগ্রেসের প্রতি তার কোন সমর্থন নেই। তবু নিজের যুক্তিগুলোকে শানাবার জন্য ঘোরে সে এদেরই পেছনে পেছনে।

হীরেন আর কৃপালের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, সাম্প্রতিক অবস্থা। দু'বছর মদের দোকানে পিকেটিং-এর ফল অত্যন্ত গুরুতর হয়েছিল। শুধু পুলিশ নয়, শ্রমিকরাও পর্যন্ত তাদের লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে। হীরেনের কপালে লাঠি পড়েছিল একটা বুড়ো ধাঙ্গড়ের। সে প্রায় পনেরদিন চুঁচুড়ার হাসপাতালে ছিল। হাসপাতাল ফেরত ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তাকে কৃপাল সভামঞ্চে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, হীরেন যায়নি। গৌরববোধ দূরের কথা, তার রীতিমত লজ্জা করেছিল।

মদের দোকানে পিকেটিং-এর কথা সেইজন্য চাপা ছিল। হীরেন সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছে হরিজন সেবায়। তাদের আজকের আলোচনার বিষয় হল মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন।

কৃপাল বলল এক টিপ নস্যি নিয়ে, 'ভোট তো তোমার হরিজনেরা দেবে না, দেবে ভদ্রলোকেরা। দেশবন্ধুর ফাইভ্ বিগ গানস্ ব'লে তুমি ঠোঁট ওল্টালে কি হবে, প্রধান রায়কে আনিয়ে বক্তৃতা দেওয়াতে তোমার আপত্তি কি?'

হীরেনের চোখে মুখে একটা শান্ত বুদ্ধিমত্তার ছাপ। সে তুলনায় কৃপালকে মনে হয় খানিকটা আমুদে ও অর্বাচীন। যেন তার প্রতিটি মুহূর্ত ফূর্তির হাওয়ায় ঠাসা। তার কথায় কোন গাম্ভীর্য বা তীব্রতা নেই, আছে উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস ও গলার জোর।

হীরেন বলল নাক কুঁচকে, 'প্রধান রায়ের কথা আসছে কি করতে, আমি বুঝি না। তোমার ওই সারদা চৌধুরীকে দাঁড় করানোর ব্যাপারেই আমার আপত্তি আছে। লোকটা যদি কংগ্রেসের সভ্যও হত, তবু না হয় কথা ছিল। বৃটিশ সরকারের পা-চাটা সে চিরকাল। তাকে তুমি'—

কৃপাল মনে মনে গরম হয়ে উঠল। বলল, 'তোমার ওই নসীরাম ঘোষই-বা কি একেবারে সাধুপুরুষ। সারদাবাবুর সম্পর্কে তো আমাদের কমিটিরও মত আছে। আপত্তি খালি তোমারই। কি হয়েছে, না, নসীরাম ধার্মিক। ধম্মো ধম্মো করেই তুমি গেলে। কংগ্রেসের সভ্য তো সেও নয়।'

হীরেন বলল, 'তাহলে আমার কথা বলাই বৃথা। কমিটি যখন মতামত দিয়েছে। কিন্তু নসীরামও দাঁড়াবেন। আমরা সমর্থন করি বা না করি, উনি একলাই সব করবেন বলেছেন।'

মাঝখান থেকে ললিত তড়বড় করে চেঁচিয়ে উঠল, 'বিজয় বাঁড়ুজ্জে ইজ্ দি ফিটেষ্ট্ ম্যান—আমি বলছি। এই সারা জেলায় যদি কোন খাঁটি হিন্দু থেকে থাকে, হিন্দুর সম্মান যদি কেউ রাখতে পারে, তবে বিজয় ব্যানার্জ্জি। আমি তোমাদের কাছে এ্যাপিল করছি যে'—

কৃপাল প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভোট ফর—সারদা চৌধুরী।'

অমনি একটা হট্টগোল পড়ে গেল। শ্রীমতী কাফের সবাই আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের আলোচনায় মেতে উঠল নিজেদের মধ্যে। দেখা গেল, তিনজন প্রার্থী সম্পর্কে অদ্ভুত সব কেলেঙ্কারীজনক ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করেছে সবাই। অর্থাৎ ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড় গোছের ব্যাপার।

. ওদিকে ভজন নেমে গিয়েছে রাস্তায়। একটা ঘোড়ার গাড়ীর কাছে গিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে, এ্যাই ঘেয়ো পক্ষীরাজের বাবা, নেবে আয়। নেবে আয় বল্‌ছি!

পক্ষীরাজের বাবা অর্থাৎ ভুনু গাড়োয়ান। ভুনুকে এ অঞ্চলের গাড়োয়ানদের সর্দার বলা যায়। সন্ধ্যার ঝোঁকেই ভাঁড়খানেক তাড়ি গিলে সে তখন থেকে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু এ পর্যন্ত একজন আরোহীও তার জোটেনি। অন্যান্য গাড়ীগুলো ইতিমধ্যে দু একবার সোয়ারী নিয়ে যাতায়াত করেছে, আরোহীরা ভুনুর অবস্থা দেখে আর কাছে এগোয়নি। মাতাল গাড়োয়ানের গাড়ীতে উঠে প্রাণটা আর দিতে ইচ্ছে করে কার।

ভুনু এলিয়ে পড়েছিল, গাড়ীর ভেতরে আসনের উপর। ভজনের ডাক শুনে সে নেমে এল তার বিশাল শরীরটা নিয়ে। তাড়ির নেশায় তার মুখটা বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো লাল। বলল, 'পক্ষীরাজ মত্ কহো লাটবাবু, এ আমার রাজারাণী আছে।'

'রাজারাণী!' ভজন হা হা করে হেসে উঠল। তার মত্ত হাসিতে রাস্তার লোক জুটে গেল সেখানটায়। অন্যান্য গাড়ীর গাড়োয়ানেরাও এসে ভিড় করল মজা দেখবার জন্য।

ভজন সবাইকে ঘোড়া দুটোকে দেখিয়ে বলল, 'ঘেয়োনী নয় চুলকোনি নয়, এই যে রাজারাণী।'

সবাই হেসে উঠল। ঘেয়ো মরদা ঘোড়াটার গায়ের চামড়া কেঁপে কেঁপে উঠল। রাতেও কয়েকটা মাছি কামড়ে পড়ে রয়েছে তার গায়ে। মাদী ঘোড়াটা চোখ পাকিয়ে কান খাড়া করে ল্যাজের ঝাপটা দিল কয়েকবার। বোধ হয় রাজারাণীর নাম শুনে তারা সচকিত হয়ে উঠেছে।

ভুনু তার মত্ত ক্রুদ্ধ চোখে একবার তাকাল শ্রীমতী কাফের দিকে কিন্তু সেটাকে গালাগাল দেওয়ার হঠাৎ কোন ভাষা খুঁজে পেল না সে।

ভজন দুই হাত জোড় করে বলল, 'কোন্ মুলুকের রাজারাণী বাবা! আরবের না অস্ট্রেলিয়ার?'

ভুনু নিরুত্তরে গাড়ীর উপরে গিয়ে বসল! ভজন এখানে আসা অবধি প্রায় রোজই তার পেছনে একবার করে লাগে। আবার সময়তে ডেকে নিয়ে খাওয়ায়ও। লোকটাকে ভুনু ভাল বোঝে না। কিন্তু তার রাজারাণীর উপর বিদ্রূপ কটাক্ষ সে সহ্য করতে পারে না। লাটবাবুকে ডেকে কোনদিন সে তার গাড়ীতে ওঠাতে পারেনি। তার মনের সবচেয়ে দুর্বল স্থানটিতে ভজন পা দিয়ে থেঁতলে কথা বলে। আর তাও কিনা এতগুলো লোকের সামনে। তারই সামনে দাঁত বের করে হাসছে অন্যান্য কোচোয়ানেরা। আজকের ব্যাপারটা তার কাছে এতই হৃদয়হীন মনে হল যে সে একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। লাগাম হাতে নিয়ে সে খালি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'লাটবাবু, ওই বাহার ভড়ংওয়ালা ঘরটা তোমাকে খিলায়, আর এই ঘোড়া আমাকে খিলায়। এ আমার রাজারাণীর বাড়া বুঝেছ?' বলে সে লাগামে এক হ্যাঁচকা টান দিতেই ঘোড়া দুটো মুখে মুখ ঠেকিয়ে রাস্তায় উঠে এল। তারপর চাবুকের শিস্ শুনে আচমকা ছুটতে আরম্ভ করল।

সবাই হেসে উঠল, কিন্তু ভজন আর হাসল না। সে ডাকল, 'ভুনু, ফিরে আয়। শুনে যা।'

ভুনু শুনতে পেল সে ডাক। সত্যি, ওই গলার স্বর যেন তার মনটাকে কেমন একরকম করে বেঁধেছে। লাটবাবু তাকে ঘৃণা করে না, এটা সে বিশ্বাস করে। তবু সে ফিরল না। কেবল তার গাড়ীর চাকা ও ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভেসে এল পেছন থেকে।

ভজন হঠাৎ ধমকে উঠল, 'ব্যাটারা দাঁত বার করে হাসছে, হটাও সব।'

সবাই সরে পড়ল এদিকে ওদিকে। ভজন ফিরে এল তার ঘরে। শ্রীমতী কাফেতে। ভুনুর 'বাহার ভড়ং' কথাটা বারবার তার কানের মধ্যে বাজতে লাগল যেন বহু মানুষের বিদ্রূপাত্মক হাসির মত। এ কি শুধু বাইরের ভড়ং। এই শ্রীমতী কাফের কি আর কিছুই নেই!

রাত্রি বাড়তে আরম্ভ করেছে। খালি হয়ে গিয়েছে শ্রীমতী কাফে। রয়েছে শুধু হীরেন আর কৃপাল। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বাইরের ধোঁয়াটে ভাবটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ধুলো আর ধোঁয়ার ছড়াছড়ি এখন নেই সন্ধ্যাবেলার মত। পূর্ব উত্তর ঘেঁষা একটা হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডা আর জলো হাওয়া।

আকাশে হেমন্তের পাতলা কুয়াশা। মেঘ করেছে আকাশে। ম্লান মুখগুলো দেখা যাচ্ছে শুধু বড় বড় তারার।

কৃপাল বলল হীরেনকে, 'তা' হলে তুমি কাল যাবে কলকাতায়?'

হীরেন চমকে উঠল। সে যেন কিসের ভাবে সর্বদাই তন্ময়। বলল, 'হ্যাঁ, যাব। আগামী সপ্তাহে প্রফুল্ল ঘোষ আসবেন এখানে। সভাটা প্রধানত অস্পৃশ্য বিরোধিতার উপরেই হবে।'

কৃপাল বলল, 'সে জানি। কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল তো। বাড়ীতে কোন গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

হীরেন বলল, 'না তো।' তারপর একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর গলায় সে বলতে আরম্ভ করল, 'সম্প্রতি তুমি দেশের কথাটা ভেবে দেখেছ! অবশ্য আমি বিশ্বাস করি গান্ধীজী নিশ্চয়ই এ অচল অবস্থা দূর করবেন। কিন্তু আমরা তাঁর আদর্শ থেকেও অনেক সরে যাচ্ছি। টেররিষ্টদের কথা বাদ দাও, তারা শীগ্‌গিরই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু, নবীন গাঙ্গুলী নাকি রুশ বিপ্লবের কথা বলতে আরম্ভ করেছে, টেররিজমে সে সুবিধে করতে পারল না।'

কৃপাল বলল, 'তা যদি বল, তবে জহরলালও তো বিলেত থেকে ফিরে এসে রুশ বিপ্লবের কথা বলছেন।'

হীরেন এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিল, 'কিন্তু তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি বলে একটা আলাদা সংগঠন করার কথা বলেননি। ওয়ার্কার্স এ্যান্ড পেজেন্ট পার্টি কি তুমি বলতে চাও এ দেশের মাটিতে কিছু করতে পারবে? এ দেশকে যারা বোঝেনি তারাই বিদেশীদের আন্দোলনের অনুকরণ করতে চাইছে। গান্ধীজীর আদর্শকে এরা কেউ বোঝেনি। আমরা নিজেরাই তার জন্য দায়ী। আমরা আমাদের সততাকে বজায় রাখতে পারিনি কৃপাল। ভেবে দেখ, দু'হাজার গজ সুতো না কেটেও আমাদের অনেক মহারথী কমিটির সভ্য হওয়ার সুযোগ নিয়েছে।'

এবার কৃপালের আঁতে ঘা লাগল। কয়েক বছর আগে গান্ধীজী কংগ্রেসকে এরকম একটা নির্দেশ দিয়েছেন যে, মাসে দু'হাজার গজ সুতো না কাটলে কেউ কমিটিতে যেতে পারবে না। কৃপাল এভাবে তার যোগ্যতা যাচাই করতে পারেনি। সে কমিটির সভ্য হয়েছে মহকুমা

কংগ্রেসের মাসে দু'হাজার গজ সুতো না কেটেও। তা বলে কি সে কোন কাজই করেনি! তার কি কোন যোগ্যতাই ছিল না!

সে বিকৃত মুখে তীব্র গলায় বলে উঠল, 'এরকম প্যাঁচ কষছ কেন বল তো? তোমার মতলবটা কি?'

হীরেন তাড়াতাড়ি কৃপালের হাত ধরে বলল, 'ছি ছি ছি, আমি তোমাকে কিছু বলিনি। আমি বলছি, আমরা গান্ধীজীর আদর্শ কেউ অনুসরণ করতে পারিনি। আমরা তাঁর নির্দেশমত গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছি না। সাইমন কমিশনের ইতরোমি দেখে গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদীকে আর একবছর মাত্র সময় দিয়েছেন, তারপরেই পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনে আমরা ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি। এই একবছরের মধ্যে আমাদের তৈরী হতে হবে। অহিংসার পথে আমাদের সমস্ত দমন-নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কৃপাল, তুমি জান, আমি ধাওড়ায় মেথরদের কাছেও যাই। তাদের অশিক্ষা ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ মোচনের জন্য.......'

'থাম্, মাইরী থাম্।' ভজন হঠাৎ দুহাত তুলে, আধবোজা চোখ মেলে জড়ানো গলায় বলল, 'একটা কথা তোরা আমাকে বলতে পারিস্?'

একটু সঙ্কুচিত হয়ে হীরেন বলল, 'বল!'

'তোদের খাওয়া আসে কোত্থেকে বলতে পারিস্। তোদের পিণ্ডি গিলতে দেয় কে, বল্। বলে যা।' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল, যেন, না বললে ছাড়বে না।

কৃপাল আর হীরেন মুখ চাওয়াচায়ি করে উঠে দাঁড়াল। কৃপাল বলল, 'আবার আমাদের পেছনে কেন বাবা। রাত হয়েছে, এবার আমরা যাচ্ছি।'

'তাই এস বাবা। যাবার আগে চারটে পয়সা দিয়ে যাও। অনেকবার তো গিলেছ চা।'

হীরেন তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পয়সা বার করে দিল। এ ব্যাপারে রাগের কোন প্রশ্নই ছিল না। কেননা, ভজনকে তারা চিনত। কিন্তু তার মুখের চিন্তাচ্ছন্ন ভাবটা কাটল না। ছোট একটা থলের মধ্যে তার তুলো আর তক্‌লি, খান দুয়েক প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি ভাষার বই বগলে নিয়ে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। কৃপাল চলে গেল। হীরেন তখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল।

রাত নিঝুম। রাস্তা খালি। দূরে দূরে জ্বলছে কেরোসিনের টিমটিমে বাতি। বড় বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে বোবা নিশ্চল নিশাচরের মত। রাত একটু বেশী হয়েছে। পুলিশের চোখে পড়লে আবার কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য হয় তো থানায় যেতে হবে। তা ছাড়া, গুপ্তচর ওত পেতে আছে কয়েকদিন, শ্রীমতী কাফের পেছনে আত্মগোপনকারী ওই ছেলেটার জন্য। কি নাম তার? সুরজ সিং। তার সঙ্গে কথা বলেছে হীরেন। আশ্চর্য ছেলেটার কি অদ্ভুত ধারণা। কখনো বলছে, হ্যাঁ, গীতায় আমার বিশ্বাস আছে, নরনারায়ণই আমার পথদ্রষ্টা। আবার বলছে, রুশ রেভ্যুলিউশনের মত আমরাও শ্রমিক আন্দোলন করব। বলে, মীরাট কন্‌সপিরেসি সাকসেস্ হলে স্বাধীনতা পাওয়া যেত। বলে মুজঃফর আমেদ, ডাঙ্গে......

না! সে পথে নয়। চড়ার বুকে এসে গঙ্গার বান বেশী লাফালাফি করে। আমাকে যেতে হবে আরও তলায়, সেই যুগ যুগান্তের হারিয়ে যাওয়া ভারতের আত্মার সন্ধানে। যেখানে অস্পৃশ্যতা নেই, অশিক্ষা নেই, যেখানে করুণাময় আমাদের সকলের হৃদয়ে সমানভাবে অধিষ্ঠিত। সেই হবে আমাদের নবভারতের জয়যাত্রা। সে নিশি পাওয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অন্ধকারে পথ চলতে আরম্ভ করল।

ভজন ড্রয়ার খুলে সমস্ত পয়সা পকেটে নিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল। হাসি পেল তার হীরেনের পয়সা চারটের জন্য। বলল, 'ব্যাটা আমার পরে রাগ করেছে বোধ হয়।'

ডাকল, 'বিশে।'

বিশে এল। তেমনি সন্ত্রস্ত, সঙ্কুচিত। শরীরটা এমন শক্ত যে দেখলে মনে হয় যেন মার খাওয়ার ভয়ে বেঁকে আছে সবসময়।

'আর কিছু খেয়েছিস?'

সরু গলায় তাড়াতাড়ি বললে বিশে, 'না, মাইরী বলছি, না।'

মাইরী বলাটা তার অভ্যাস। অভ্যাসটা পাত্রাপাত্র মানে না। আপনি বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। ভজন পকেট থেকে চারটে পয়সা বের করে তাকে দিয়ে বলল, 'নে ব্যাটা চারটে পয়সা। ও আমার হজম হবে না। তোর তো গরহজমের বালাই নেই।'

বিশে প্রথমটা ভয়ে ভয়ে হাতটা মুঠো করতে পারল না। যেন বিষ দিয়েছে কেউ তার হাতের চেটোয়। তারপর হঠাৎ হি হি করে হেসে বলল, 'খাবার জন্য দিলে ঠাকুর? ময়রার দোকান যে এ্যাকোন বন্ধ হয়ে গ্যাচে।'

সেকথার কোন জবাব দিল না ভজন। বাড়ীর কথা ভাবছে সে। যুঁই এখানে নেই। কিছুদিন হল সে বাপের বাড়ী গিয়েছে তার তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিতে। তার বিবাহিত জীবনের আজ সাত বছর, ইতিমধ্যেই তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে যুঁই।

যুঁই। হয়তো এখন ঘুমোচ্ছে। না, ঘুমোচ্ছে না, ওর বাপের বাড়ীর সেই দোতলার দক্ষিণ সীমান্তের ঘরটায় খাটের উপর কাত্ হয়ে শুয়ে আছে হয়তো। চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বাগানের অন্ধকারে। হয় তো কষ্ট হচ্ছে, ঘুম নেই চোখে। চোখের কোল বসে গিয়েছে, এলিয়ে পড়েছে হাত পা। অসহ্য ক্লান্তি তার। হয় তো গৌর নিতাই তার দুই ছেলে ঘুমোচ্ছে কোলের কাছে পড়ে। আর যুঁই ভাবছে....। থেমে গেল ভজনের মন। ভাবল, না, আমার কথা ভাববে না যুঁই, ভাবছে তার অভিশপ্ত জীবনের কথা। তার জীবনের বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার কথা। তার বুদ্ধি ছিল, হৃদয় ছিল, সর্বোপরি তার যৌবন আজও আছে। সমস্তটাই ব্যর্থ হয়েছে তার আর একটা ব্যর্থ মানুষের হাতে পড়ে।

এ্যালকোহলের মত্ততা ঝিমিয়ে আসছে ভজনের। হুস্ ক'রে একটা নিঃশ্বাস পড়ল। ব্যর্থ। নিজের সঙ্গে তার বোঝাপড়া কোনদিনই হল না। কিন্তু যুঁই হয় তো কিছু চেয়েছিল। গ্রাজুয়েট স্বামী পেয়েছিল সে, নিজের তার কিছু শিক্ষা ছিল। কিন্তু আজ! নিঃশব্দে, বিনা প্রতিবাদে সে আত্মদান করেছে একটা মাতালের কাছে। অপমান, ঘৃণায়, অভিশাপে জ্বলে উঠেছে তার বুকের মধ্যে!

ধ্বক্ ক'রে উঠল ভজনের প্রাণটা। সে অভিশাপ বুঝি সারা জীবন পুড়িয়ে মারবে তাকে। যুঁইয়ের সেই অপলক চাউনি, নীরবতা আর ক্লান্তি। প্রতিবেশিনী বউদের সঙ্গে কোথাও তার পার্থক্য নেই। সকলের মত সেও অসুখী, সংসার রঙ্গমঞ্চে বধূবেশে সেও অভিনয় করে চলেছে। প্রেয়সী আর মায়ের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয়। তার চেয়ে যুঁই কি তাকে ছেড়ে যেতে পারে না!

অমনি তার বুকের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে উঠল, না না, পারে না। এ হয় তো ভালবাসা নয়, তবু এ ব্যর্থ জীবনে সে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না যুঁইকে। নিয়ত অষ্টপ্রহর তার যুঁইকে চাই। এ যে তার মনের ও দেহের স্বভাব।

টেবিলের উপর হাতাতে হাতাতে ভজন বলে উঠল,

এ ফুল ফোটার হল না অবকাশ
কুঁড়ির ঝরে ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস।

চমকে উঠল ভজন। মনে হল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু কেউ না। হাসল ভজন। ভাবল, ডাকবে। দাদা তো জেলে। ক'দিন গিয়ে দেখে এসেছে সে আলিপুরে। বাবা হয় তো এখনো পাথরের মূর্তির মত বাইরের বারান্দায় আরাম কেদারায় চুপ করে বসে আছেন। যেন সারাদিনই দুঃস্বপ্ন দেখেন। যেন খনার কাহিনীর সেই জিভ্‌হীন মিহিরের মত তিনি নিঃশব্দ, এক জোড়া চোখে শুধু দেখেন সব। আর বকুল মা। এতক্ষণ হয় তো চলে গিয়েছেন ভজনের ভাত বেড়ে রেখে। যুঁইয়ের চলে যাবার পর থেকে আবার আসতে হয়েছে। আশ্চর্য পরিবর্তন বকুল মায়ের! তাঁর সে গাম্ভীর্য আজকাল আর নেই। তাঁর সশব্দ হাসির তীব্র ঝঙ্কার যেন মানুষের বুকে বেঁধে। তার সঙ্গে পোষাকেরও পরিবর্তন হয়েছে। সাজতে যে তিনি এত ভালবাসতেন, তা কে জানত। কথায় কথায় তিনি গান গেয়ে ওঠেন। কেবল মাঝে মাঝে দেখা যায়, হালদারের কাছে বসে বসে, এক নাগাড়ে টানা সুরের মত তিনি ভজনের মায়ের কথা বলে যান। তাঁর সইয়ের কথা। তাঁদের যৌবনের কথা।

তাল নেই, লয় নেই এ জগতের। ভজন হাতের ঝাপটায় মনের ভাবনাকে ঝরিয়ে দিতে চাইল। টলতে টলতে পেছনের ঘরে গিয়ে বেঞ্চির তলা থেকে বার করল বোতল। শূন্য সব কটাই, কেবল একটাতে একটুখানি আছে। সেটুকু গলায় ঢেলে দিল সে।

সুরজ সিং বলল, 'শুনহেন।'

অর্থাৎ শুনুন। বাংলা বলতে শিখেছে সে। বয়সের চেয়েও মুখটা তার কাঁচা মনে হয়। মনে হয় কিশোর বালক।

ভজন ঘাড় কাত্‌ করে বলল, 'বলহেন।'

একটু অপ্রস্তুত হল সুরজ। বলল, 'হামার মিল চার্জটা'—

তার হাতে কয়েকটা টাকা চকচকিয়ে উঠল। ভজন ভ্রূ কুঁচকে একবার টাকা কটা দেখে বলল, 'কোথা পেলে!'

'সুনির্মল দিয়েছে।'

সুনির্মল। হেসে উঠল ভজন। ও তো বাপের পয়সা চুরি করে দিয়েছে। ওটা কাউকে দিয়ে দিও। আর তোমার মিল চার্জটা আমার ব্যয়ের অঙ্কে লেখা থাকবে। সাহেব মারা দলের কাছ থেকে শ্রীমতী কাফে পয়সা নেয় না।

সুরজ সব কথা না বুঝে একটু বোকা বনে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরে যেতে যেতে ভজন আবার বলল, 'চলি সূর্যি, এবার চাঁদ হয়ে রাত জাগো। চারদিকে বড় বিছে আরশোলার ভিড়। বুঝেছ? একটু সাবধানে থেকো।'

তারপর বিশেকে বলল, 'বিশে, খোকাবাবুকে খেতে দে।'

অনেক রাত। কত রাত ঠাহর পাওয়া যায় না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল সুরজ-এর। প্রথমে মনে হল ইঁদুর আর ছুঁচো ঘুরে বেড়াচ্ছে বেঞ্চির তলায়, তারই ঘট্‌ ঘট্‌ শব্দ হচ্ছে। মিশমিশে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। ঘট্‌ ঘট্‌ শব্দটা ভারী পায়ের শব্দ মনে হচ্ছে! দুপ দাপ আর খস্‌ খস্‌ শব্দ। হয় তো একাধিক লোক এসেছে।

মনে হতেই সুরজের পলাতক বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল। চকিতে কোমরের থেকে রিভলবার বার করে সে এক মুহূর্ত প্রতীক্ষা করল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিটেবেড়ার ঘরে পড়তেই মনে হল, পেছনের ঝাঁপটা আধ খোলা, কাছেই একটা মানুষের মূর্তি। সর্বনাশ। পথরোধ করেছে সুরজের। সামনের দরজায় তালা বন্ধ। ধরা পড়তে হবে!

মরিয়া হয়ে সুরজ উঠে বসল। হয় তো একটা কিছু ঘটে যাবে এখুনি, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। ঝাঁপের দিকে রিভলবার তাগ্ করে সুইচ্টা টিপে দিতেই, মনে হল তার চোখের সামনেই ভেসে উঠল একটা ভীষণ দর্শন জানোয়ার। গোলাকার ভীত দুটো ছোট ছোট চোখ, আর হাঁ করা মুখের মধ্যে একরাশ কি সব খাবার।

পরমুহূর্তেই সুরজ দেখল, জানোয়ার নয়, বিশে। খেতে খেতে মাথা দুলাচ্ছিল। বাতি জ্বলতে দেখেই থেমে গিয়েছে, আর একটা ভীত চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে তার মুখ দিয়ে।

কথা বেরুল না সুরজের মুখ দিয়ে। ভয়মুক্ত হয়েছে তার মনটা, কিন্তু মানুষের এমন খাবার দৃশ্য জীবনে সে আর কোনদিন দেখেনি। তাড়াতাড়ি সে রিভলবারটা লুকিয়ে ফেলল। বলল, 'বিশ্বনাথ।'

বিশে অভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি আড়ষ্ট মুখটা নেড়ে খাবারগুলো গিলতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা লুকিয়ে রাখা কয়েকটা চপ আর কয়েক টুকরো মাংস। খেতে খেতেই বলল, 'শুয়ে পড় খোকাবাবু। তোমার বাবা এলে আমি বলব, মাইরী বলব।'

তারপর খাওয়াটা শেষ হতেই সে হঠাৎ প্রায় কেঁদে উঠে সরু গলায় ডুকরে উঠল, 'মাইরী খোকাবাবু, ঠাকুরকে বলো না যেন, মাইরী ঠেঙ্গিয়ে আমার আঁটা ওড়াবে। কি করব, শালা নোলা আমার মানে না।'

সুরজের মনটা ভীষণ দমে গিয়েছে। একবার খালি মনে হল, যদি সে গুলি করত! লোকটা খেতে খেতেই শেষ হত। বলল, 'শুয়ে পড়। বলব না।'

বিশে ঢক ঢক করে সেরখানেক জল খেয়ে নিঃশব্দে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল তার মাদুরে। বারকয়েক চোরা চোখে তাকিয়ে দেখল সুরজকে।

সুরজ আলোটা নিভিয়ে দিল। আজ রাত্রেই সে পালাবার কথা ভাবছে। এরকম একটা জায়গাতে আত্মগোপন করে থাকাটা তার কাছে আর সুবিধে বলে মনে হচ্ছে না। একে রেষ্টুরেন্ট, তায় ষ্টেশনের ধারে। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। তা ছাড়া, তার কাজও শেষ হয়েছে। এবার শুধু নিরাপদে পৌঁছুনো।

ভোর রাত্রে পুলিশের ডাকাডাকিতে বিশের ঘুম ভাঙ্গল। চোখ ঘষে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল গুঁপো সেপাই তার দিকে কট্মট্ করে তাকিয়ে আছে। প্রথমেই তার মনে হল কালকের খাওয়ার ব্যাপারে ভজনঠাকুর তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুলিশ ডেকেছে। দেখল, সেই খোকাবাবুও নেই।

তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে ভীত হতভম্ব চোখে সে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই একজন যুবক পুলিশ অফিসার বিশেকে ডাকল। বিশে দেখল পালাবার কোন উপায়ই নেই। সে হাত জোড় করে সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

যুবক পুলিশ অফিসারের বোধ হয় হাসি পেল বিশেকে দেখে। বলল, 'তোমার মনিব কোথায়?'

'এঁজ্ঞে বাড়ীতে।'

'তাকে নিয়ে এস।'

বিশে ছুটল ভজনকে ডাকতে।

ভজন যখন এল, তখন ষ্টেশন এলাকাটা পুলিশের ভিড়ে থম্থম্ করছে। ভজনের রাত্রের মত্ততা কেটেছে, ঝিমুনিটা কাটেনি। বিশের কাছে শুনে নিয়েছে সে, সুরজ ঘরে নেই। মনে মনে ভাবছে, 'পাঁচ পয়সা বরাত্ করলাম মা কালী, ছোঁড়াটাকে পার করে দিস।'

তাকে দেখে পুলিশ অফিসারটি বলল, 'একটা সার্চ ওয়ারেন্ট আছে।'

ভজন বলল, 'কার? আমার না শ্রীমতী কাফের?'

অফিসারটি হাসল। বলল, 'উভয়েরই। আপনার এখানে ইউ পি'র কোন লোক সেল্টার নিয়েছিল?'

ভজন অফিসারটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মশাইয়ের কি ঠাট্টা করা হচ্ছে আমার সঙ্গে? নাকি নেশাটা আমি একলাই করেছি?'

অফিসারটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একজন এস, আই-কে তল্লাসীর নির্দেশ দিয়ে সে ভজনের চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল। ভজন তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'উঁ হুঁ হুঁ ওটি করবেন না। ওটা প্রোপাইটারের চেয়ার। বিশে, বাবুকে চেয়ার এগিয়ে দে।'

ছোকরা অফিসারের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। চেয়ারে না বসে সে নিজেও তল্লাসীতে লাগল।

ভজন আবার বলল, 'কাপ ডিসগুলো ভাঙ্গবেন না।'

অফিসারটির মুখ দিয়ে প্রায় হুকুমের সুরে বেরিয়ে এল, 'আপনাকে সেকথা না বললেও চলবে।'

ভজন বলল, 'ভগবান জানে!....'

রাস্তায় ভিড় হয়েছে। দেখছে সবাই শ্রীমতী কাফের তল্লাসী। নানান জনে বলাবলি করছে নানান কথা। ভিড় করেছে গাড়োয়ান, রাস্তার কাজে ঝাড়ুদার মেথর, ষ্টেশনের রেলওয়ে ষ্টাফ আর কুলি, আশেপাশের দোকানদার আর পথচারীরা। বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে, বোমা নাকি পাওয়া গিয়েছে দুটো। কেউ বলছে, 'ভজুলাটের দাদা জেল ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছেন।' কেউ বা ঘোষণা করছে, 'ভজুলাট নিজেও একজন! হুঁ হুঁ বাবা ওসব রক্তবীজের ঝাড়। মাতাল হ'য়ে পড়ে থাকলে কি হবে।'

পুলিশ ভিড় হটিয়ে দিচ্ছে, সরিয়ে দিচ্ছে লোকজনকে। একটা ডালপুরীওয়ালা বেচবারা ছল ক'রে চেঁচাচ্ছে, 'ডালপুরী চাই, ডালপুরী তরকারী।' কাফের ভিতরে বিশে কালকে ভজনের দেওয়া আনিটা হাতে নিয়ে ঘষছে, আর ডালপুরীর হাঁকটা তাব মর্মে গিয়ে একেবারে জিভের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা জল জমে উঠছে।

ষ্টেশনের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে হীরেন। সে রোজকার মত আজও আসছিল শ্রীমতী কাফেতে। পুলিশ দেখে, সরে গিয়ে সিঁড়িতে উঠেছে। কাছে পড়ে গেলে বলা তো যায় না। উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে পড়তে কতক্ষণ। কিন্তু সে বিরক্ত হয়েছে ভজনের উপর। কেন সে এসব ঝামেলা পোয়াতে যায়। তা ছাড়া হীরেনের মনটার মধ্যে ছটফট করছে। উৎসুক চোখে সে দেখছে রাস্তার দিকে। তার আবিষ্কৃত ভারতের আত্মা এই সময়ে রোজ আসে। সেই পবিত্র

অথচ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অস্পৃশ্য অথচ অকলঙ্ক হৃদয়। অশিক্ষিত তবু বুদ্ধিদীপ্ত ললাট তার। প্রভাতী সূর্যের মত তার হাসি। কৃতজ্ঞতা তার দুই চোখে। কণ্ঠে তার 'নমস্তে বাবুজী' ধ্বনি যেন মন্দিরের পবিত্রতা ব'য়ে নিয়ে আসে। সে কোথায়?

রথীন আর সুনির্মল মিশে আছে ভিড়ের মধ্যে। তাদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। সুরজের কাছে শুধু রিভলবার নয়, কয়েকটা কাগজপত্রও রয়েছে। সেসব পেলে, নবীন গাঙ্গুলীর অস্ত্রাগার শুদ্ধ ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

খানিকটা দক্ষিণে ভিড় করেছে নাড়ুপুরোতের গলির মেয়েরা। নাড়ুপুরোতের গলি মানে বেশ্যাপল্লী। অকাল নিদ্রাভঙ্গে তাদের কোটরাগত চোখ লাল। তারা আভাসে জেনেছে, ভিড় দেখে ভিড় করেছে। মজা দেখবার জন্য নয়। লাটবামুনকে তারা মহামানব বলে জানে। দেহজীবিনীর পুলিশের ভয় নয়, প্রতিবেশিনীর উৎকণ্ঠা তাদের মনে।

ভজন ভাবছে সুরজের কথা। ছোকরা যদি গঙ্গা পেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এযাত্রা বেঁচে যাবে। যেতে পেরেছে, নাকি কাছাকাছি কোথাও আটকে পড়ে আছে।

তল্লাশী শেষ হল। ওলটপালট করে দিয়েছে শ্রীমতী কাফের সর্বাঙ্গ। অগোছাল এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত জিনিসপত্র। কিন্তু একটা কাগজও পুলিশ হস্তগত করতে পারল না।

ছোকরা অফিসারটি বলল অমায়িকভাবে, 'অনেক সময় wrong report-এ আমাদের এসব করতে হয়। উভয়পক্ষেরই হয়রানি, কিছু মনে করবেন না।'

ভজন জবাব দিল, 'মনে কিছু না করা খুব শক্ত। ভাবছি শ্রীমতী কাফের কপালটার কথা।'

সার্চ ওয়ারেন্টে ভজনের একটা সই করিয়ে পুলিশদল বেরিয়ে গেল। সারিবদ্ধভাবে মার্চ ক'রে তারা এগিয়ে গেল উত্তর দিকে। লেফট্—রাইট—লেফট্! ....

ভজন বলল, 'বিশে, উনানে আগুন দিয়ে ঘর সাফ কর।'

কিন্তু বিশে ততক্ষণে ডালপুরীওয়ালার কাছ থেকে আর একটু তরকারি বাগাবার জন্য সব উদ্ভট গল্প শোনাতে আরম্ভ করেছে তাকে। সেই উদ্ভট গল্প শোনবার জন্য আবার তার কাছে ভিড় করছে একদল লোক।

ভিড়টা তখনো থমকে আছে। সকালবেলার খদ্দেররা কেউ দোকানে ঢুকছে না। দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ে ও সংশয়ে। স্টেশনের টিকেট-কালেক্টার আর গুড্‌স-ক্লার্ক। তাদের মাসকাবারি বন্দোবস্ত শ্রীমতী কাফের সঙ্গে। পকেট ফাঁক প্রাণ চা চা করছে। কিন্তু পুলিশ-ভীতি কাবু ক'রে দিচ্ছে।

প্ল্যাটফরমের মাথার কালো শেডের আড়াল থেকে সূর্য উঠছে। রক্তবর্ণ সূর্য, স্পষ্ট মনে হচ্ছে সেটা ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠছে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার আলো। ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীমতী কাফের দরজায় দেয়ালের পাথরে।

সেইদিকে তাকিয়ে ভজন আপন মনে বিড়বিড় ক'রে ব'লে উঠল,

কিরীটিনং গদিনং চক্রিনঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।

বাইরে এসে চেঁচিয়ে বলল, বোমা নয়, পিস্তলও নয়, সূর্য ধরতে এসেছিল। সে তো আকাশে, ওই যে। বলে, আকাশের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিল।

ভিড়ের জনতা ফিরে তাকাল পূর্বদিকে। অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল পরস্পরে।

সুনির্মল গা টিপল রথীনের। অর্থাৎ সুরজ পালিয়েছে। বুঝল সে কথা হীরেনও। সে এসে বসল তার রোজকার জায়গাটিতে। কিন্তু থলে থেকে বার করতে ভুলে গেল তকলি আর তুলো। মনটা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। সে আসেনি, হয় তো আসবে না এই পুলিশের হাঙ্গামায়।

কিন্তু ভজনের মুখে চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। সে বুঝেছে, শ্রীমতী কাফেতে কদিনের জন্য খদ্দেরের আনাগোনায় ভাঁটা পড়বে। নিজের উপরে বিরক্তি এল তার। দোকানটা হয় তো উঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু খদ্দের নিয়ে তো জীবনধারণ সম্ভব নয়। আর যারা তার জীবনে রয়েছে, তারা না ছাড়লে সে কি করে ছাড়বে তাদের! এসবে তার বিশ্বাস নেই সত্য, কিন্তু এরা ছাড়া এ দেশে আর আছে কারা? তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় শ্রীমতী কাফেতে সে টাঙ্গিয়েছে তার দাদার দেবতা চক্রধারী নরনারায়ণের ছবি। সেই নারায়ণের শিষ্যদের সে কোথায় যেতে বলবে!

বিশে উনুনে আগুন দিয়েছে। ভজন বেরিয়ে গেল। বকুল মা সব জানবার জন্য অপেক্ষা করছেন। বাড়ী থেকে সে বাজারে যাবে।

রাস্তার ভিড় কেটে গিয়েছে। চলে গিয়েছে যে যার কাজে। শুধু ট্রেনের যাত্রীর আনাগোনা আর গাড়ীর গাড়োয়ানের চীৎকার।

এমন সময় এল হীরেনের সেই ভারতের আত্মা। বছর বিশ বাইশ বয়সের এক পশ্চিমা মেয়ে, পশ্চিমা ধরনের কুঁচি দিয়ে উল্টো দিকে ফর্সা শাড়ী পরেছে সে। মাজা মাজা রং, রুক্ষ চুল, মাঝারি গড়ন। মুখে তার শঙ্কা, তবু হাসছে—কালো সরল চোখে তার ভয়, জিজ্ঞাসা ও ক্ষমা প্রার্থনা। গলায় মাদুলি, সে মিউনিসিপ্যালের ঝাড়ুদারণী, নাম রামা।

হীরেনের মনে পড়ে একবছর আগে সদ্য জেল প্রত্যাগত সে এমনি বসেছিল, এইখানটিতে এই সময়ে। এই মেয়েটি এসে ভিক্ষা চাইল। হীরেন চোখ তুলে দেখল। ময়লা পোশাক পরা একটি মেয়ে। এমনি তার জীর্ণ দশা যে, তার পক্ষে লজ্জা নিবারণ করাও সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠেনি। তার পিচুটি ভরা চোখে শিশুর সারল্য। ময়লা দাঁতের মাড়ি বেরিয়ে পড়েছে তার বাঁকা কুঞ্চিত ঠোঁটের ফাঁকে। সে ঠোঁটে ক্ষুধার কান্না। সারা গায়ে খড়ি উঠেছে চুলকে চুলকে। জট পাকিয়ে গিয়েছে মাথার চুল। হীরেনের আজন্ম সংস্কারাচ্ছন্ন চোখ নত হয়ে এসেছিল তার খোলা বুকের সারল্য দেখে। জেল থেকে ফিরে মনটা তার ভার হয়েছিল। সেদিন আচমকা বেদনায় ভরে উঠেছিল তার বুকটা। মনে হয়েছিল গান্ধীজীর সেই নিরন্ন, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসী এসে আজ দাঁড়িয়েছে তার সামনে। জিজ্ঞেস ক'রে সে জেনেছিল মেয়েটি বিহারের নট জাতীয়া। এখানে একটা ইঁটখোলায় কাজ করতে এসেছিল সে স্বামীর সঙ্গে। স্বামী মারা গিয়েছে, সে বেকার, ভিক্ষাবৃত্তি ধরেছে।

হীরেন তার জন্য কাজ যোগাড় ক'রে দিয়েছে মিউনিসিপ্যালিটিতে। তাকে শুনিয়েছে গান্ধীজীর বাণী, শিখিয়েছে পরিচ্ছন্নতা, বুঝিয়েছে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, নির্দেশ দিয়েছে তকলিতে সুতো কাটার।

সেদিনের সেই রামার কিছু পরিবর্তন হয়েছে বৈকি। সে ফিটফাট হতে শিখেছে, প্রত্যহ সুতো কেটে দিয়ে যায় এই সময়ে শ্রীমতী কাফেতে, হীরেনের হাতে। হীরেন তাকে শোনায়, এই ভারতবাসীর কি হবে, কি তার ভবিষ্যৎ।

হীরেনের অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে প্রত্যহ এখানে এসে রামার সঙ্গে দেখা করা। রামা না এলে উৎকণ্ঠা বোধ করে সে। দুশ্চিন্তা হয় মনে।

সত্যি, অনেক পরিবর্তন হয়েছে রামার, কিন্তু তাকে থাকতে হয় ঝাড়ুদার বস্তিতে। ইতিমধ্যে বস্তির অনেকেই তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। অনাচার মনে করেছে অনেকে তার এ পুরুষহীন একলা জীবনকে। এমনকি পঞ্চায়েতে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, একথাও বলেছে।

কিন্তু রামার মনে থেকে থেকে কেবলি মনে হয়, এই কি তার জীবন! তাই যদি, তবে কোন্ সে বস্তু যে তার হৃদয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বিচিত্র বন্ধনের সৃষ্টি করেছে। তার মনে, চলায়, কথায়, ব্যবহারে, তার সবখানি জুড়ে ঘিরে রয়েছে পদে পদে আড়ষ্টতা। এক এক সময় এ যেন তার কাছে অভিনয়ের মত ঠেকে। খানিকটা-বা উপকারী হীরেনের মর্যাদার জন্যই। তবু হঠাৎ সে কোন কোন দিন বেধড়ক তাড়ি পান করে ফেলে, ঝাড়ুদার বস্তির হট্টগোলে মেতে যায়, হাসি গানে রঙ্গ ক'রে যুবকদের সঙ্গিনী হ'য়ে ওঠে। পড়ে থাকে তার তুলো তকলি ও অবসর সময়ে সুতো কাটা, উল্টে পাল্টে পড়ে থাকে হীরেনের দেওয়া বর্ণপরিচয়। এসবের পর দু'একদিন তার শ্রীমতী কাফেতে আসা হয় না।

তখন হীরেন যায় ঝাড়ুদার বস্তিতে। বুঝতে পারে সমস্ত ব্যাপারটা। তার রাগ হয় না, বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠে। বেদনা অনুভব করে। ভয় হয়, যেন তার হাতে গড়া প্রাসাদটা ভূমিকম্পে টলমল করছে চোখের সামনে। রামাকে কেন্দ্র করেই এই ঝাড়ুদার বস্তিতে সে পরিচিত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে সে ঝাড়ুদার বস্তিতেও সবাইকে নিয়ে সভা করে, তাদের বোঝায়। সে যখন আসে, তখন সবাই ঘিরে ধরে। বোঝা যায়, সবাই তাকে মান্য করে, গান্ধীজীর চেলা বলে।

রামার মধ্যে সম্প্রতি নতুন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এ বিশ্বের সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়, হীরেনের চোখকে তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না। রামার চোখ মুখে আজ বিচিত্র ভাব ও হাসি। সে ভাব ও হাসির নাম জানে না হীরেন। তবু বোঝে, রামার অজান্তেই শিশুর দেয়ালার মত তার চোখে মুখে হৃদয়ের নতুন ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। হীরেনের জীবন-দর্শন ছাড়া আরও কিছু পেয়েছে সে। সে পাওয়া যেন এক মহা সর্বনাশের মত ভয় ধরিয়ে দিয়েছে হীরেনের বুকের মধ্যে। তার এত ভাব ও ব্যাকুলতা এই জন্যই। দুর্বল মুহূর্তে হীরেন বারবার আবৃত্তি ক'রেছে,

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মোনহনু বিধীয়তে,
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সে মনে মনে চীৎকার ক'রে উঠেছে, না না কোন ইন্দ্রিয় আসক্তি আমার হৃদয়কে বাতাসের নৌকার মত উন্মার্গগামী করেনি। এ যে আমার আদর্শ, আমার কর্তব্য। তাকে কেমন ক'রে আমি পদদলিত হ'তে দেখব।

রামা ভয়চকিত চোখে শ্রীমতী কাফের ভেতরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নমস্তে বাবুজী!'

হীরেন গম্ভীর মুখে হাসল। করুণ হাসি। বলল, 'নমস্তে। তোমার ডিউটি শেষ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে এসেছ?'

রামা বলল উৎকণ্ঠিত গলায়, 'না বাবু, বহুত ডর লেগেছে পুলিশ দেখে। হামার দিল্ রোতা রাহা। শোচলাম, হামার বাবুজীকে পুলিশ পাকড়ে লিয়ে যাবে।'

রামার চোখ ছলছল করে উঠল, তবুও ভয়মুক্ত হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

হীরেনের বুকের মধ্যে বেজে উঠল এক মিঠে তাল ও রাগিণী। তার সারা চোখে আলো ফুটল রামার চোখে জল দেখে। তার উৎকণ্ঠায়, তার গলার স্বরের বেদনাভরা উক্তি, 'হামার

দিল রোতা' 'হামার বাবুজী' বুকটাকে ভরে দিল তার। মনে মনে ভাবল, মিথ্যে তার আশঙ্কা। তারই আদর্শে গড়ে উঠেছে রামা। সে বলল, 'পুলিশ একজনকে খুঁজতে এসেছিল। কিন্তু, আজ না হোক, একদিন তো আমাকে যেতে হবে রামা।'

দু' ফোঁটা জল জমে উঠল রামার দুই চোখে। বলল, 'সচ্ মগর বাবুজী, হামার দিল চৌপাট হোয়ে যাবে।'

দিল চৌপাট হ'য়ে যাবে! হীরেনের হৃৎপিণ্ডের রক্তধারায় কথাটা বাংলা অনুবাদ হ'য়ে আকণ্ঠ ভরে দিয়ে তাকে মুহূর্ত নির্বাক ক'রে দিল। তার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনের নানান সমস্যা ও চিন্তার মধ্যে এক নতুন স্বাদ এনে দিল ওই ক'টি কথা। দু ফোঁটা জল। হ'ল-ই বা সে ঝাড়ুদারণী, নীচ জাতীয়া অবাংগালিনী, সে যে আমারই শিষ্যা। হ্যাঁ শিষ্যা। ভাবল, হায়! মানুষ কত বড় কিন্তু সে কত সামান্য বস্তুর কাঙ্গাল।

কিন্তু এখানে থামা যায় না। রামার ওই অতল কালো চোখে যে সে দেখতে পেয়েছে যুগপৎ করুণা ও আগুনের শিখা। সে যে নবভারতের নায়িকা। মৃৎশিল্পী যে মূর্তি নিজের হাতে তৈরী করে খড় মাটি দিয়ে, সেই মূর্তির পায়ে একদিন তারই পুষ্পাঞ্জলি পড়ে! হীরেন তার কল্পনা-চোখে দেখতে পেল, গান্ধীজীর পাশে দাঁড়িয়েছে রামা। রামা যুগেশ্বরী।

শ্রীমতী কাফের ঘড়িতে কিশোরী গলার কলহাসির মত ঠুং ঠুং ক'রে বেজে গেল ন'টা। হীরেন চমকে উঠল। হৃদয়াবেগের রাশ টেনে ধরল সে। চোখ তুলে দেখল, রামা তার দিকে ব্যগ্র চোখে তাকিয়ে আছে।

রামা। আবার একটু চমকাল হীরেন। রামার গা' থেকে একটা কিসের সুগন্ধ ভেসে আসছে। দেখল, তার এলো খোঁপায় বাসি ফুল, কানে পরেছে নতুন রুপোর দুল। সে ভেবে পেল না, রামার দেহের প্রতিটি রেখা হঠাৎ এত তীব্র, জীবন্ত হয়ে উঠল কেমন ক'রে।

রামা বলল, 'বাবুজী, আপনার খারাপ তবিয়ত হয়েছে।'

হীরেন বলল, 'না।' তারপর একটু থেমে বলল, 'তোমার সুতো এনেছ রামা?'

রামা মাথা নীচু করে সঙ্কোচে হাসল। বলল, 'বানাবার ফুরসত মিলে নাই বাবু!'

মুহূর্তে হীরেনের সারা মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

লজ্জা ও সঙ্কোচে চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ রামা। তারপর খানিকটা অস্বস্তির হাসি হেসে বলল, 'ওরা সব পাকড়কে লিয়ে গেল।'

'পাকড়কে!' উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল হীরেন, 'কোথায়?'

'রামলীলা শুনতে।' বলেই উৎসাহ ভরে বলে উঠল, 'বহুত্ বড়িয়া খেল বাবুজী!' বলেই হঠাৎ কি মনে পড়তে খিল খিল করে হেসে উঠল।

হীরেন দেখল, তার সামনে রামা নেই, এক অপরিচিতা উচ্ছৃঙ্খল বেদে নট-নারী। সে হাসছে। যে হাসিতে আকাশ চমকায়, বাতাস থমকায়, পাথরকে কথা বলায়।

হীরেন উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র গলায় ডাকল, 'রামা।'

'বাবুজী।'

'তোমার উপর আমার কত ভরসা। আমার নয়, সারা বস্তির, তোমার আপনার, তোমার পর, সকলের, তোমার দেশের। সে ভরসা তুমি ভেঙ্গে দিতে চাও?'

হাসি থামল। লজ্জা ও বিস্ময় ফুটল রামার চোখে। নিরুত্তরে তাকিয়ে রইল হীরেনের দিকে।

হীরেন বলে চলল, 'তুমি ঝাড়ুদার বস্তিতে থাকতে পার কিন্তু তোমার পথ আলাদা। তুমি গঙ্গা, ওইসব নোংরা খাল নালাকে তুমি তোমার পথে টেনে নিয়ে আসবে, তোমাকে সমুদ্রে যেতে হবে কিন্তু তুমি যে গঙ্গা হ'য়ে খালের পথ ধরেছ। ও পথ তোমার নয়, তুমিই যে ওদের শেখাবে।'

রামার ভ্রূ-লতা বেঁকে উঠল দুর্বোধ্য বিস্ময়ে। বলল, 'সচ্ বাবুজী।'

হীরেনের গলা ভাবাবেগে কেঁপে উঠল, সে বলেই চলল, 'তোমাকে আমি দেখতে চাই সকলের আগে। তুমি সারা দেশকে পথ দেখাবে।'......

বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত হীরেনের মুখ থেকে কথা বেরিয়ে আসতে লাগল। রামা নীরব। সে বুঝেছে, বাবুজীকে সে দুঃখ দিয়েছে, তখলিপ বাড়িয়েছে। লজ্জায় ও ব্যথায় সে নির্বাক হয়ে রইল। হীরেনের সব কথা সে বুঝল না। কেবল চুপ ক'রে শুনে গেল।

পরে বলল 'বাবুজী, হামার গোস্তাকি হয়েছে। হাম আপকো দিল দুখায়া। বাবুজী, এ্যায়সা আর না হবে।'

হীরেন নীরবে তাকিয়ে রইল রামার দিকে।

এমন সময় দেখা গেল ভজন আসছে বাজার থেকে। শুধু বাজার থেকে নয়, এর মধ্যেই কোথা থেকে মদ গিলে এসেছে সে। তেমন বিশেষ টলছে না, আপন মনে হাসছে সে। তার সারা মুখটা আগুনের মতো লাল হয়ে জ্বলছে। হাসিটা বাঁকা না ব্যথার, ঠাওর পাওয়া যায় না।

ভজনকে রামার বড় ভয়। না, এ বাবু তাকে কোনদিন অপমান করেনি, তাড়িয়ে দেয়নি। তবুও ভয়। এ বাবুর হাসি কথার মানে সে কিছুই বুঝতে পারে না। এ বাবু মাতাল, দিলদার, এক একসময় মনে হয় যেন একটা যোয়ান ঝাড়ুদারের মত সাদাসিধে। কিন্তু গান্ধীর চেলা নয়, গম্ভীর নয়। হাসে আর বলে, 'কি রে বেটি ক'গজ এগুলি?' অর্থাৎ কত সুতো কাটা হল। কখনো বলে, 'তুই ঝাড়ুদারণী না রজকিনী রামী, ঠাওর করতে পারছি না।' একথা বললে সে দেখে, তার বাবুজী হীরেনের মুখটা কালো হ'য়ে যায়। হীরেনও অস্বস্তি বোধ করে ভজনের কথায়। বলে, 'ভজন, আর যা-ই কর, এখানে আর তুমি অমন ক'রে সার্থক কাজের চেষ্টাকে ভেঙ্গে দিও না।' ভজন বলে, 'মাইরী, ভাঙ্গা ছাড়া কিছু গড়তে পারলুম না এ জীবনে। তোরা গড়, আমি দেখব।' তারপর হাত-জোড় ক'রে বলে,

'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ।'

'মা, দু' পিস্ পাঁউরুটি খেয়ে যা। এ অবোধ সন্তানের গোস্তাকি নিস্‌নে। কিন্তু দোকানটা মাঝে মাঝে ঝাড়ু দিয়ে যাস।'

রামা এখানে অনেকদিন ঝাড়ু দিয়েছে এবং খেয়েছে, কিন্তু বুঝেছে বাবুজী তাতে দুঃখ পান। তাই তার খেতেও সঙ্কোচ। হীরেন জানত, এসব কাজে মানুষকে কত কি শুনতে হয়। বিশেষ, ভজনের উপহাস ধরতে গেলে এ বিশ্বে কিছুই করা যায় না।

ভজনকে আসতে দেখেই রামা বলল, 'কাল সবেরে ফির আসব বাবু। অখুন যাই।'

হীরেনও তাড়াতাড়ি বলল, 'যাও।'

রামা ফিরতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে হেসে কি যেন ভাবল এক

মুহূর্ত। তারপর বলে ফেলল, 'বাবুজী, আপনি এক রোজ ঝাড়ুদার বস্তিতে খাবেন বলেছেন। সবকোই বলছে, এ হামলোগকা পাপ।'

হীরেনের মুখে আবার সেই হাসি ফিরে এল। বলল, 'না রামা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কোন জাত নেই। তোমরা যে অস্পৃশ্য নও, এটুকু প্রমাণ করার জন্যই আমি তোমাদের হাতে খাব, তোমাদের সকলের সঙ্গে। সে হবে আমাদের সার্বজনীন চড়ুইভাতি। এতে তোমাদের লজ্জার কিছু নেই।'

তবু যেন একটু দ্বিধা হাসল রামা। হেসে চলে গেল। ঘোমটা খোলা। খসা আঁচল। শক্ত মাঝারি শরীরটা তার পেছন থেকে যেন হাওয়ায় দোলা সদ্য বেড়ে ওঠা গাছের চারাগাছের মত। আচমকা একটা নিঃশ্বাস পড়ল হীরেনের। ভজন বারান্দায় উঠেই বলে উঠল,

'বসন্ত হ'রেছে মোর প্রাণের স্বাদ,
কি বা জ্বালা যাহা ছুঁই, সবই বিস্বাদ।'

বলেই চড়া গলায় হাঁকল, 'বি—শে!.....'

হীরেন তাড়াতাড়ি ভেতর দিকের কোণে একটা চেয়ারে বসে, তুলো তক্‌লি বার করে সুতো কাটতে আরম্ভ করল। বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল তার কপালে।

বিশে এল না, তার জবাবও পাওয়া গেল না। ভজন বলল, 'হারামজাদা গেল কোথায়?' বলে সে নিজেই ঘরের মধ্যে ঢুকেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আজ মেরে ফেলব খোক্কোসের বাচ্চাটাকে।'

বিশে এই অল্প অবসরের ঝোঁকেই কয়েকটা আলু সেদ্ধ ক'রে সবে ছাড়াবার উদ্যোগ করছিল। ভজনের আওয়াজ পেয়ে লুকোতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে। ভজনের শক্ত হাতে ঘাড় ধরা অবস্থায় তাকে দেখাচ্ছে যেন, নোংরা দাঁতে, পিটপিটে চোখে একটা সন্ত্রস্ত কালো উল্লুক। নিস্তেজ গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে হুম হুম রবে।

ভজন বলল, 'কি করছিলি?'

বিশে বলল, সরু সুতো-কাটা গলায়, 'তোমার চবের আলু সেদ্ধ করছিলুম।'

'চবের আলু সেদ্ধ? তবে লুকোচ্ছিলি কেন?'

এক মুহূর্ত চুপচাপ। হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বিশে ভজনের পা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাইরী ঠাকুর বড় ক্ষুদা জেগেছিল, মাইরী। মেরো না, আমাকে ছাড়িয়ে দেও ঠাকুর মাইরী।'

'ছাড়িয়ে দেব' বলে অবাক হ'য়ে হঠাৎ হা হা হা ক'রে হেসে উঠল ভজন।—'ব্যস্‌, হার মানিয়েছিস্‌ আমাকে। তবু তুই খাওয়া ছাড়তে পারবিনে, এই তোর সাফ কথা। এর পরে আর কথা কিসের। আলু সেদ্ধ করেছিস্‌, এবার নুন নে, পেঁয়াজ নে, পাঁউরুটি কাট, তারপরে খা। তোকে ছাড়ব না, ব্যবসাটা তুলে দেব।'

বলে সে সামনের ঘরে গিয়ে বসে হীরেনকে বলল, 'তুমি রাজনীতি করেছিলে, আর ও ব্যাটা আমার কবর খুঁড়ছে। হীরেন!'

ভজন গম্ভীর গলায় ডাকল। হীরেনের তক্‌লিতে সুড় সুড় ক'রে খানিকটা সুতো পাকিয়ে গেল অন্যমনস্কতার জন্য। ভাবল না জানি আবার কি বলবে ভজন। বলল, 'কি বলছ?'

'বলছি, চিচিং ফাঁক মানে কি, বলতে পার?'

হীরেনের চোখে মুখে ভয় দেখা দিল, কি বলতে চায়, মাতালটা? বলল, 'অর্থাৎ?'

হেসে বলল ভজন, 'অর্থাৎ বলতে পারলে না। চিচিং ফাঁক মানে, সোনাদানা আর মোহর হে। আর দোকান ফাঁক মানে কি জান?' হীরেন তবুও তাকিয়ে রইল।

ভজন বলল, 'পুলিশ ঘুরে গেছে দোকানে। খদ্দেররা আমার সব ভারতমাতার বড় বড় স্যাম্পেল। দোকান ফাঁক তুমি বুঝবে না। তুমি হয়ত ভাবছ দেশনেত্রী তৈরীর কথা।

এবার সুযোগ পেয়ে হীরেন বলে উঠল, 'তোমারই তো দোষ।'

ভজন বুঝল এ আবার হীরেন ও সুরজদের সেই দলাদলির রাগ। তাই দোষ বিচারে ওরা চিরদিনই সিদ্ধহস্ত। বলল, 'সে ভাবে যদি বল, তুমিও ছাড়া পাবে না বাবা। কিন্তু, এ সংসারে দোষী কে, তা কি আমরা কেউ জানি?' বলতে বলতে ভজন টেবিলের উপর মাথাটা পেতে দিল। হীরেনও কেমন অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে রইল, সামনে ষ্টেশনের দিকে। চমকে উঠল তার মনটা। ষ্টেশনের রকে ঝাড়ু দিচ্ছে একটা মেয়ে। কিন্তু রামা নয়, আর কেউ। মনটা তকলি, সুতো, শ্রীমতী কাফে সব ছেড়ে হারিয়ে গেল হীরেনের।

দুপুর নামছে। রাত্রে একটু শীত লাগে। দুপুরের রোদ যেন ঘা'য়ের মত জ্বলে। রোদ চড়ছে, ঝিমিয়ে আসছে সব। কমে গিয়েছে ট্রেনের যাতায়াত। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘুমাচ্ছে কুলি আর যাত্রীরা। ঘোড়ার গাড়ী একটাও নেই। জলদানিটা থেকে উপছে পড়ছে জল। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে যাকে বলে একটা খোদাই ষাঁড়। বোধ হয় ভাবছে ঘোড়ার জলদানিতে বে-আইনী মুখ দেওয়াটা তার ঠিক হবে কিনা। চতুষ্পদীয় হ'লেও গরু ঘোড়ায় তফাৎ আছে তো!

আকাশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে উঠে আসছে সাদা সাদা দলা দলা মেঘ। যেন কোন খেলোয়াড় অদৃশ্যলোক থেকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে বুড়ির মাথার পাকা চুল। সেদিকে তাকিয়ে একটা পাগল কি যেন বলছে, ফিস্‌ফিস্ ক'রে হাসছে, আবার কখনো রেগে উঠে শাসাচ্ছে। কালো অসুরের মত চেহারা, মাথাটা বারো মাসই প্রায় কামানো, গলায় আবার তুলসীর মালা। পাগলামী ছেড়েও যখন মাঝে মাঝে কুলিগিরি ধরে, তখন যাত্রীদের লাঞ্ছনার আর অন্ত থাকে না। ওকে সবাই বলে কুটে পাগলা।

ভজন যখন মাতাল হয়ে পড়ে, তখন কুটে পাগলা হা হা করে অট্টহাসি হেসে বলে, 'ব্যাটা বাবু পাগলা।' সে যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে ওরকম করছে, তখন অদূরে অশ্বত্থ তলার কাজহীন মুচিটা নিরালার টিকটিকির মত জিভা ঠোঁটের কাছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। হাসি পাচ্ছে না, ভাবছে, কুটিয়া পাগলার নিশ্চয়ই কোন সেয়ানা ধরমবাবা আছে। নইলে অমন অপদেবতার সঙ্গে কথা বলছে কি করে।

রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে আসছে। নেমে আসছে দুপুরের নিঝুমতা।

হীরেন সুতো কাটছে না। বাড়ী যেতে মন চাইছে না। বাড়ীতে অবশ্য মন তার কোনদিনই টেঁকে না। না, সেখানে অভাব অনটন নেই। বরং সবাই জানে, নিয়োগী বাড়ীর অফুরন্ত ঐশ্বর্যের কথা। নইলে হয় তো এমন করে তার পক্ষে বেরিয়ে পড়া সম্ভব হত না। কিন্তু সেই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের কারণে অকারণে ঝগড়া বিবাদ, এক পাল ভ্রাতৃবধূর গহনা ও মাৎসর্যের নোংরামি তার সহ্য হয় না। তাদের বিরাট অন্দরমহলে, অনেক জোড়া সুন্দর চোখ, সম্পর্কের

ঠাট্টার আড়ে প্রশ্রয়ের হাসি ও রাখঢাকহীন কথা কোনদিন তার মনটাকে একটুও টানেনি, টলায়নি। উপরন্তু সেই পরিবেশ তার মনে একটা ঘৃণার উদ্রেক করেছে। খাওয়ার সময় মেয়েরা ভিড় করে থাকলে, তার খাওয়া পর্যন্ত হয় না।

অথচ সামান্য রামাকে তার মনে হয়েছে এদের চেয়ে অনেক মহৎ, অনেক বড়। মনে মনে বলল হীরেন এখানে সৌন্দর্য রূপে নয়, গুণে। চেহারায় নয়, চরিত্রে। তা না হলে, রামার সৌন্দর্য তো নিয়োগী বাড়ীর বাছা বাছা ঝিয়ের কাছেও টিকবে না। কিন্তু রামা তার আবিষ্কৃত ভারতের নিপীড়িত আত্মা। এখানে দেখার প্রশ্ন নেই, অনুভবের সাধনা। রামা তার আদর্শের সৃষ্টি। এই আত্মাকে সে সঠিক পথে নিয়ে যাবে, এই তার পণ। সেইজন্যেই মনটা কেবলি ঘুরে ফিরে এক কথাই ভাবছে। না, সে থামবে না। সে এগিয়ে যাবে তার পথে। কৃপাল হয় তো শীঘ্রই বিয়ে করবে। এমনকি সে লুকিয়ে সিগারেট পর্যন্ত খায়। তার কাছে দেশ সেবা অন্য রকমের হলেও হীরেন কোনদিন সে জীবনের দিকে ফিরেও তাকাবে না। হীরেন তার জীবনকে বিসর্জন দেবে, এই নিরন্ন অস্পৃশ্য দেশবাসী, ওই দরিদ্র নারায়ণ কি চরণো মে!

ভিতরের চালাঘরটায় উনুনের পাশে বিশে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মত। ঘরটা দিনের বেলাও আধো অন্ধকার। পেছনের নর্দমার ধারে জমে উঠেছে রাবিশ, তরকারির ফেলে দেওয়া আবর্জনা। মাছি ভ্যান ভ্যান করছে, পোকা কিলবিল করছে নর্দমায়।

বিশের হাতে তখনো আলু সেদ্ধ কটা রয়েছে। ঘেমো হাতের ময়লা লেগেছে সেগুলোতে। ঠোঁটের পাশে লালা চকচক করছে। সে হতভম্বের মত অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে, আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না। ভাবলেশহীন মুখে প্রায় আস্ত গিলে খাওয়ার মত আলু কটা সে খেয়ে ফেলল। তারপর হঠাৎ অবিশ্বাস্য রকমভাবে তার চোখে চক চক করে উঠল কয়েক ফোঁটা জল। ঠোঁট দুটো কুঁচকে মুখটা সে উপর দিকে তুলে ধরল ছুঁচোর মত। বিশে কাঁদছে না ছুঁচোর মত খাবারের শোকে তার ছুঁচলো ঠোঁট কাঁপছে, ঠিক বোঝা গেল না।

এই অবস্থায় খানিকক্ষণ থেকে সে হঠাৎ একেবারে সামনের ঘরে গিয়ে ভজনের পা জড়িয়ে ধরল। ডাকল, 'ঠাকুর।'

ভজন মাতাল নয়, কিসের ঘোরে যেন মগ্ন ছিল। চোখ বুজেই বলল, 'আবার কি খেয়েছিস?'

বিশের গলাটা যেন একটু মোটা হয়ে উঠল, 'কিছু না!'

'তবে?'

'দোকানটা তুমি তুলে দিও না ঠাকুর। আমাকে ছাইড়ে দাও।'

ভজন অবাক হয়ে তাকাল বিশের দিকে। হীরেনও তাই। তার নাকের পাশে একটা বিরক্তি ও ঘৃণার রেখা ফুটে উঠল।

বিশে বোধ হয় কান্নার জন্যই দোআঁশলা গলার স্বরে বলতে লাগল, 'ঠাকুর, তোমাদের বিশের মরণ নেই কেন, যদি বল, তবে বলি, এই অতটুনকালে খোলা উঠোনে ফেলে মা দুদিন, দু'রাত কোথায় হাওয়া হয়ে গেছল, আমাকে শেয়াল কুকুরে খায়নি, মাইরী। আমার ভাই বোন একটাও বাঁচত না বলে, শালা বাপটা পিটত আর বলত, এটা-ই ওগুলোকে খেয়ে ফেলে। ছোটকাল থেকে, এতবড়টা মাইরী আমি এই করে খেয়েছি। ধরবাবুরা আমার জিভ্ কেটে দিতে চেয়েছিল ছোঁচামির জন্য মাইরী। এজন্যে আমার বে' অবধি হল না। আমাকে তুমি তাইড়ে দেও ঠাকুর।'

হীরেন মুখটা ফিরিয়ে নিল। তার কি রকম অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তার সামনে একটা কুৎসিত-দর্শন প্রেত ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে। সে তার তুলো তক্‌লি গুছিয়ে উঠে পড়ল।

ভজন হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। সে কোনদিন ভাবতেও পারেনি, বিশে এমন সদা সত্য কথা বলে নিজেকে খুলে ধরবে। বিশের কথাগুলো শুনতে শুনতে তার কেমন একটা ভয় ধরে গিয়েছে। বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল থালায় বাড়া ভাত, মাছ-তরকারি। মনে হল, তার ক্ষুধার সময়, কে যেন তার থালাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হল, বুঝি তাকেও একদিন পাড়ায় পাড়ায় এমনি ছ্যাঁচড়াবৃত্তি করে ঘুরে বেড়াতে হবে। মনে পড়ল তার দুটো ছেলে হয়েছে। আরও একটা কিছু হবে। হয় তো একদিন ওরাও এমনি বিশের মত দারুণ ক্ষুধায় মানুষ থেকেও অমানুষ হয়ে উঠবে। সেইদিন!......কিন্তু যুঁই। কোমলে কঠিনে ধরিত্রীর চেয়েও সহ্যশীলা যুঁই যে ওদের মা। হলই বা। এ ধরিত্রীর বুকেও কি দুর্ভিক্ষ হয় না!

পরমুহূর্তেই মনে হল, কেন ভাবছে সে একথা। সে ভজন, ভজুলাট। তার ছেলে হবে বিশে, এ কোন্ চিন্তা পেয়ে বসেছে তাকে। সে তাকিয়ে দেখল, বিশে তার দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

ভজন বলল, 'তোকে তাড়াব না বিশে, দোকানটাকে যদি তোর এত মায়া, তবে এটাকে বাঁচিয়ে খাস্। খাস্, যা তোর প্রাণে চায়। ভজুলাট লাভের বরাত করেনি কিন্তু বাঁচতে চায় রে, বাঁচাতে চায়।'

বলে সে উঠে পড়ল। কেমন যেন একটা জ্বালা ধরে গিয়েছে তার মনে। মনে হচ্ছে, তাকে যেন একটা জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পিটছে, তাড়া করছে কেউ। সে ঝড়ো বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এই দিনটাতে সত্যি স্থানীয় অনেকেই শ্রীমতী কাফেতে পা বাড়াল না। আই, বি, ডিপার্টমেন্ট আচমকা এতই তৎপর হয়ে উঠল যে, সারাদিন প্রায় ডজন খানেক নতুন মুখ এদিকে ওদিকে উঁকি ঝুঁকি মেরে বেড়াল। জনাকয়েক চা-ও খেয়ে গেল।

ভজন প্রায়.সারাটা দিন মদে ডুবে রইল। দোকানের খাবার পর্যন্ত তৈরী করল না। বিশে ভাবল, অপরাধটা তারই। তার সারাদিনের টুকটাক্ খাওয়ার খেলাটা ভাল জমল না। তাছাড়া মনটা তার কি রকম থতিয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা শ্রীমতী কাফে তেমনি জমজমাট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারা খদ্দের নয়। আশেপাশের সমস্ত রাজনীতিক বন্ধুরা একত্র হয়েছে। আসেনি খালি রথীন সুনির্মলের দল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কৃপালের সঙ্গে বিতর্ক হয়েছে তাদের। গত বছরের আগের বছর মাদ্রাজ কংগ্রেসে ডাক্তার আন্সারীর সভাপতিত্বে যে সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে স্থানীয় কোন আন্দোলনে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি তাদের সাহায্য করেনি। হীরেন ছিল জেলে। সে জেল থেকে এসে দেখল, কথাবার্তা নেই, হরতাল করাটা একটা দেশের রাজনৈতিক ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বছরেই একমাসের মধ্যে সুনির্মল হাই স্কুলে তিনবার ধর্মঘট করেছে, দু'মাস জেল খেটে এসেছে। রথীন পুলিশের মার খেয়েও সায়েস্তা হয়নি। বিচিত্র ওদের আন্দোলন। মাঝখান থেকে লাভ হয়েছে, কয়েকজন নিরীহ মজুর হাজত বাস করে এসে

চাকরি খুইয়ে বসে আছে। তারা এখন নেতা হয়েছে। হাসি পেয়েছে হীরেনের। যাদের কোন শিক্ষা দীক্ষা নেই, তাদের দিয়ে এসব ক্যারিকেচার খেলানো কেন?

এইসব আলোচনাতেই আজকের আসর জমে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদ ও ট্রেড্ ইউনিয়ন, এই দুটি বিষয়ের উপর বৃটিশ সরকার একেবারে নির্দয়। বিশেষ, আজকেই শ্রীমতী কাফেতে এ রকম একটা পুলিশি হাঙ্গামা ঘটে যাওয়ার দরুন, আলোচনাটা এদিকেই বইছে। কেবল জওহরলাল পন্থী কয়েকজন নীরব। কৃপাল হীরেনের মত, একটু বয়স্কদের সঙ্গে তাদের ঠিক জমছে না। মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার কংগ্রেস সভ্যরা প্রায় সকলেই আজ হাজির। বোঝা যাচ্ছে না, এটা শ্রীমতী কাফে না কংগ্রেসের অফিস।

বিশে অবাক হয়ে এদের কথাগুলো শুনছে। ভেতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এমনভাবে শুনছে, যেন তার সামনে কেউ দুর্বোধ্য উর্দু আরবী ভাষায় কথা বলছে। এরা চা, খাবার, জল, কিছুই চায় না। শুধু কথা। এত কথা মানুষ বলতে পারে!

ভজন এতক্ষণ ছিল না। হঠাৎ এল উর্ধ্বশ্বাসে। মত্ত অবস্থায়। এসেই থম্‌কে দাঁড়াল বারান্দায়। একে তো তার চোখ দুটো কটা। তারপরে যখন নেশায় ওই চোখে রক্ত উঠে আসে, তখন মনে হয় একটা হিংস্র সিংহ তাকিয়ে আছে। সে সকলের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'বাঃ, এই তো মানিয়েছে। একেবারে সভাস্থল করে তুলেছ বাবা। ফিরে এসে দেখব, পুলিশের থানা বসে গেছে। বিশে!'

বিশে নিঃশব্দে ভজনের কাছে এসে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে একটা চাপা খুশির ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, এতক্ষণে এই কথাখেকো বাবুগুলো একটু সায়েস্তা হবে।

ভজন বলল, 'সব বাবুকে এক কাপ করে চা দে। পয়সা নিতে ছাড়িসনে যেন। খালি ঠাকুর্দার কাছ থেকে পয়সা নিসনি, বুঝলি?'

বিশে খালি বলল, 'হুঁ!'

ঠাকুর্দা মানে গোলক চাটুজ্জেমশাই। তিনি যথানিয়মে এসেছেন কিন্তু আজকের আসরে তিনি উপেক্ষিত। নিছক ঝিমুনোর বরাত।

ঘর শুদ্ধ লোক সব নিশ্চুপ। বিশেষ নবীন কংগ্রেস কর্মীরা তো প্রায় তটস্থ। বোঝা গেল, এখানে আইন অমান্য সম্ভব নয়।

ভজন গিয়ে দাঁড়াল ভুনুর গাড়ীর কাছে। হাতে তার একটা কাগজ। কাগজ নয়, চিঠি। চিঠি দিয়েছেন যুঁইয়ের বাবা, ভজনের শ্বশুর। দিয়েছেন ভজুর বাবা হালদার মশাইকে, গালাগাল দিয়ে। ঠিক গালাগাল নয়, হালদার মশাইয়ের নিস্পৃহতার দরুণ ছেলের বউয়ের তিনি খবর নেন না। মেয়ের অযত্ন হয়েছে, সেই অজুহাতে তিনি লিখেছেন, এ বয়সে আপনার একটু প্রকৃতিস্থ হওয়া উচিত। চিঠির কথাটা কানে শোনা মাত্র ভজন পাগলের মত ছুটে এসেছে। শ্বশুরবাড়ী প্রায় দশ মাইল দূর। আর এখুনি কোন ট্রেনও নেই। অথচ ভজনের কুষ্ঠিতে লেখা নেই কোন বিষয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকা। চুপ করে থাকা মানে, ব্যাপারটা তার কাছে জুড়িয়ে যাওয়া। এখুনি কিছু না করলে, হয় তো এ জীবনে আর হবে না।

ভুনুর মাদী মরদা দুটো ঘোড়াকেই গালাগাল দিলেও সে তাকেই গিয়ে বলল, 'দ্যাখ ভুনু, বউ আনতে যেতে হবে এখুনি শ্বশুরবাড়ী। তোকে হতে হবে আজ আমার সারথী। যাকে বলে একেবারে কেষ্টঠাকুর, বুঝলি? আমি হলাম অর্জুন। কিন্তু তোর ওই ঘেয়ো পক্ষীরাজকে.....'

ব্যস। এক কথায় বেঁকে বসল ভুনু। বলল, 'পঙ্খীরাজ মত্ কহো লাটবাবু, কহো, রাজারাণী।'

বোঝা গেল, কালকের রাগটা তার এখনো যায়নি। ভজন তার আগুনের মত লাল মুখটা ভুনুর কাছে এগিয়ে নিয়ে বলল, ঘোড়া যখন রাজারাণী হয়, তাকেই বলে পঙ্খীরাজ। না হয় তোর পঙ্খীরাণীও আছে। কিন্তু, আজ ওদের আসল রাজারাণী হতে হবে। পারবি?

ভুনু অতশত বুঝল না। সন্ধ্যার ঝোঁকেই পুরো দু ভাঁড় খালি করে সে বুঁদ হয়ে বসেছিল। একটাও প্যাসেঞ্জার আসছে না দেখে সে মনে মনে প্যাসেঞ্জারেরই বাপান্ত করছিল। এখন লাটবাবু এসে তার গাড়ীতে উঠতে চাইছে দেখে প্রথমটা সে বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল, তার রাজারাণীকে দিল হালাল করা দিল্লেগীর এটা একটা কায়দা ভজুলাটের।

কিন্তু মস্ত ঘোরালো চোখে সে লাটবাবুর দিকে এক মুহূর্ত সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝল, ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়। তবুও তাজ্জব হল সে এই ভেবে, সকালে যার দোকানে পুলিশ ঘুরে গিয়েছে, দোকানে যার দোস্ত ইয়ারদের আড্ডায় ঘু ঘু চরতে বসেছে, সে কিনা এই রাত্রে যেতে চায় শ্বশুরবাড়ী, বউ আনতে। তাও কিনা আবার ভুনুর গাড়ীতে। ভাবল, লাটবাবু শুধু মাতাল নয়, তার ঘরওয়ালী মনিয়ার মতই এ বাবুও দুর্বোধ্য। মনিয়া তার বউ।

কিন্তু সেসব ছেড়ে ওই আসল রাজারাণী হতে হবে কথাটা তার ঝিম মারা মগজে চট করে ধরে গেল চুম্বক লোহার মত।

সে মোটা গলায় প্রায় হুকুমের সুরে খালি বলল, 'অন্দরমে আপনি বসে যাও লাটবাবু।'

সারথীর চেয়ে অবশ্য ধনুর্ধারীর অবস্থা ভাল নয়। ভজুলাট হুমড়ি খেয়ে কোন রকমে গাড়ীর মধ্যে পড়তেই বোঁ করে একটা পাক খেয়ে ভুনুর রাজারাণী ছুটল দক্ষিণে। দক্ষিণে দীর্ঘ বাঁক সড়ক। খোয়া বাঁধানো রাজপথ। এবড়োখেবড়ো। বর্ষায় গাড়ী চলে চলে দুপাশ নীচু হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে পাথুরে খোয়া মাথা উঁচিয়ে আছে। যেন বিদ্রূপ করে হাসছে পথচারী জানোয়ার ও গাড়ীর চাকার উদ্দেশ্যে! অন্ধকার। হালকা কুয়াশা আর ধোঁয়া ছড়িয়ে আছে। হেমন্তের রাত্রে হাওয়া-শূন্য কুয়াশা আর ধোঁয়া যেন ঝুলছে মাকড়সার জালের মত। বেঁটে বেঁটে কাঠের পোস্টের মাথায় টিম টিম করে জ্বলছে কেরোসিনের বাতি।

কিছুক্ষণ পর ভজুর মনে হল, সত্যি বুঝি সে পঙ্খীরাজে করে উড়েই চলেছে। গাড়ীটার ঘড় ঘড় মড় মড় শব্দের মধ্যে সে খালি শুনতে পাচ্ছিল একটা তীক্ষ্ণ শিস্ আর জোড়া ঘোড়ার খুরের কদম ছুটের জোড় মেলানো শব্দ। মাঝে মাঝে গাড়ীটা কাত হয়ে উলটে পড়ার উপক্রম করছে, কখনো এমনভাবে লাফিয়ে উঠছে যেন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল বুঝি। এমন কি, কয়েকবার 'গেল গেল' চীৎকার তার চড়া নেশাটা মাটি হবার উপক্রম করল। 'গেল গেল' করে চেঁচাচ্ছে রাস্তার লোক।

প্রথমটা ভজুর মনে হল, বোধ হয় নেশার জন্য এরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু বাইরের দিকে চোখ পড়তে সে দেখল, অবিশ্বাস্যরকম তীব্র বেগে তার দৃষ্টি থেকে সব হারিয়ে যাচ্ছে। এই দুর্ধর্ষ গতি দেখে সে একবার ভুনুর ঘেয়ো রাজারাণীর চেহারা দুটো ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু তার চোখের সামনে ভেসে উঠল দুটো শক্তিশালী, মাংসল, কেশর উঁচনো ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি। ওই নির্জীব ঘোড়া দুটোর এত ক্ষমতা কোত্থেকে হবে!

শ্বশুরবাড়ীতে এসে যখন পৌঁছুল ভজন, এতখানি উত্তেজনার পর শ্বশুরের উপর রাগটা তার কেমন পড়ে গেল। আর এসেই শুনল কিছুক্ষণ আগেই যুঁইয়ের এক ছেলে হয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে বাড়ীর সবাই ঘিরে দাঁড়াল ভজনকে। হঠাৎ কেউ কথা বলতে পারল না। ভজনের মুখ লাল। রক্ত ফেটে পড়ছে যেন। উত্তেজিত। ঘর্মাক্ত। চোখ তো নয়, বুকের অন্তস্থল বিদ্ধকারী দুটো ঝকঝকে বর্শাফলক।

এই কিছুক্ষণ আগেই এই বাড়ীর সকলে একটা উদ্বেগের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। অনায়াসে প্রসব করেছে যুঁই। তারপরেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত যে এল, সে কিনা যুঁইয়ের বর।

'জামাইবাবু, মেজদির ছেলে হয়েছে।' বলল যুঁইয়ের এক বোন। ভজনের বিবাহিতা শালী।

ভজন শুনেছে। আবার শুনে ফিরে তাকাল শালীর দিকে। শালী সুন্দরী। যুঁইয়ের মত স্বাস্থ্য, গায়ের রং ফরসা। সুন্দরী, কিন্তু ধার নেই। হাসছে, সসম্ভ্রমে। ভয়ে ভয়ে।

কাউকে প্রণাম করার কথা মনে হল না ভজনের। জিজ্ঞেস করল না শ্বশুর মহাশয়ের কথা। শালীকে বলল, 'তোমার মেজদিকে একবার দেখব, নিয়ে চল।'

সবাই অবাক হল, হাসল নিঃশব্দে। নবজাতককে নয়, একেবারে মেজদিকেই!

শালাজ ঠাট্টা করল, 'খালি হাতে?'

ভজন বলল, শালাজের দিকে তাকিয়ে, 'সেইজন্যই তো মেজদির ছেলে দেখতে চাইনি। দেখা মানুষকে দেখতে চেয়েছি। দেখবার জন্যই এসেছি।'

বাতি দেখিয়ে শালী নিয়ে চলল ভজনকে আঁতুড়ঘরের দিকে। রান্নাঘরের পাশে, বাড়ীর পেছনে, বাগানের খিড়কির দরজার ধারে। পেছনে এল আরও কয়েকজন।

আঁতুড়ঘরের দরজা ভেজানো। ভেতরে ধাইমার কথা শোনা যাচ্ছে। যুঁই আধশোয়া, আধ বসা। সে ক্লান্ত, কিন্তু সবলা। কোলের কাছেই, একরাশ কাপড়-চোপড়ের ভেতর থেকে একটা মুখ উঁকি মারছে। একটা লাল রবারের পুতুলের মুখ। ধূসর রোঁয়া ভরা এক চিমটি মাথা। কোঁচকানো ভ্রূ। ঠোঁট নড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে যুঁই হাসছে। হাসতে হাসতে কি ভেবে অবাক গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় সামনে তাকিয়ে দারুণ বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হল, তার অন্তর্যামী তাকে একটা খেলা দেখাচ্ছে। এ কি করে সম্ভব! সে যে মনে মনে এই মানুষটির কথাই ভাবছিল। মনে মনে কথা বলছিল। কত কথা। মনের সে নিগূঢ় কথা যে এক অন্তর্যামী ছাড়া আর কাউকে বলবার নয়। এই অবুঝ নবজাতককে সাক্ষী রেখে যে সে বলছিল প্রাণের কথা। ভাবছিল, সে এখন কোথায়? বুঝি কোথাও পড়ে আছে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। আর তুই যে সংসারে এসেছিস্ বাছা, সে সংবাদ সে কারুর কাছেও পাবে না আজ। কিন্তু আমি আর পারিনে বাপু এমনি করে তোদের এ সংসারে আনতে। তাকে আমি বলব! বলব!

ভজনের দিকে তাকিয়ে তার লজ্জা হল, হাসি পেল, অভিমান হল, কান্না পেল। আচমকা তার বুকের ভেতর থেকে যেন যুগ যুগান্তের বিরহ পাষাণ ভার নেমে গেল। এক রক্তক্ষয়ী বেদনার উপশম হতে না হতে, ভজনের ঘন সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল তার মন। কী লজ্জা! হায়! কি বিচিত্র মানুষের মন, কি অদ্ভুত মতি!

পরমুহূর্তেই মনে হল, ভজন যে অন্তর্যামী। ছি ছি ছি, সে যে সবই জানতে পারছে। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে ক্লান্ত শরীরে নিজেকে গুছোবার চেষ্টা করতে লাগল যুঁই।

ভজন বলল, 'থাক্, থাক্, এখন ওসব থাক। আমি এখুনি যাব।'

পেছনে ফিরে শালাজকে বলল, 'বউদি কাউকে বলুন এক গামলা জল বাইরে দিয়ে আসতে। রাজারাণীর তেষ্টা পেয়েছে। আমাদের ভুনু কোচোয়ানের ঘোড়ার ওই নাম। নাম সার্থক। এতক্ষণে মরে গেল কিনা, তাই-বা কে জানে।'

হঠাৎ ভজন লক্ষ্য করল প্রায় সকলের নাকে কাপড় চাপা। ও! মদ খেয়েছে ভজন। মদের গন্ধ লেগেছে সকলের নাকে। মনে পড়ল, এই নিয়ে এখনো যুঁইয়ের সঙ্গে তার বিবাদ। মদের প্রতি তার বড় ঘৃণা। যুঁইয়ের বাবার চিঠিতে সে ইঙ্গিত অনেকবার দেওয়া হয়েছে।

ভাবতে ভাবতে ভজনের মনে সেই অপমানবোধটা আবার মাথা তুলল। শালীর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার বাবা কোথায়?'

শালী বলল, 'মেজদির ছেলে হওয়ার পর বাবা তার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছেন। বেড়াতে, পাশা খেলতে।'

যুঁই বলল একটু-বা দাবীর সুরে, 'আজকের রাতটা থেকে যাও না। গৌর, নিতাই রয়েছে।'

গৌর, নিতাই ভজনের দুই ছেলে। ভজন বলল, 'না।' তারপর হঠাৎ যুঁইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি মাতাল। তোমার বাবা অসন্তুষ্ট হবেন। যুঁই, তোমার বাবাকে দুটো কথা বলতে এই রাতে এসেছিলুম। দেখা পেলুম না। তোমারও শরীর খারাপ, তবু ব'লো। ব'লো আমার বাবাকে আর উপদেশ দেওয়ার সময় নেই। আর, আমি নিজের যত্ন ভাল জানিনে, তাই হয় তো পরের যত্নও বুঝিনে। আমাদের বাড়ীতে তোমার নিজের যত্নের ভার নিজে না নিলে, তোমার আদরের জায়গা তোমাকেই বেছে নিতে হবে, সে স্বাধীনতা তোমার আছে।'

শালী অবাক্। অন্তরালে শাশুড়ী সন্ত্রস্ত। যুঁইয়ের বিস্মিত কান্নায় বুক ভ'রে উঠল, জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলছ এসব কথা?'

'তোমার বাবা জানতে চেয়েছিলেন।'

বলে সে ফেরবার উদ্যোগ করতেই যুঁই ডাকল, 'শোন।'

ভজন দাঁড়াল। যুঁই জিজ্ঞেস করল, 'বাবা কেমন আছেন?'

বাবা মানে শ্বশুরমশায়। জবাব দিল ভজন, 'ভাল।'

'ভাসুর ঠাকুরের কোন সংবাদ এসেছে জেল থেকে?'

'না। আমি তিন দিন পরে যাব, ইন্টারভিউ করতে।'

'আর তোমার......'

যুঁই থেমে গেল। শ্রীমতী কাফের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গেল যুঁই। ওই শ্রীমতী কাফের প্রতি বরাবরই তার বড় বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে, যেন ওই কাফেটা তার সতীন। কোনদিন জিজ্ঞেস করেনি, আজ জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বড় বাধো বাধো ঠেকল, প্রসঙ্গ পাল্‌টে বলল, 'বাবার হয় তো কোন কারণে মন খারাপ হয়েছিল। তাই কিছু লিখেছেন। তুমি চলে গেলেও বাবা দুঃখ পাবেন।'

ভজন বলল, 'উপায় নেই যুঁই। আমাকে যেতে হবে।'

শাশুড়ী আড়াল থেকে এসে বললেন, 'না থাকো, কিছু না খাইয়ে তোমাকে কেমন ক'রে ছাড়ব বাবা?'

ভজন বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমার সময় নেই। আমি আর একদিন এসে খেয়ে যাব।'

ভজনের গলার স্বর শুনে মনে হয়, এর পরে আর কথা চলে না। যুঁইয়ের মনের নিগূঢ়ে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই মাতৃহীন শিক্ষিত ছেলেটিকে তিনি স্নেহের আঁচলে বেঁধে রাখবেন। পারেননি। সে বাঁধা পড়ার নয়। তাঁর পেটের সেরা যুঁই তাকে বাঁধতে পারেনি।

ভজন আবার ফিরল। শাশুড়ীর উপস্থিতিতে লজ্জা না করেই বলল, 'যুঁই নিজে নিজেকে দিন রাত ধিক্কার দিই, অপরে দিলে সইতে পারিনে। তবু যদ্দিন বেঁচে থাকব, তোমাদের ভাবনা কাউকে ভাবতে হবে না।' হেসে উঠে বলল, 'লোকে যে আমাকে ভজুলাট বলে।' বলে সে এগিয়ে এল।

যুঁইয়ের চোখের কোণে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠল। না, ভজনের কথায় নয়। ভজনের চলে যাওয়ায় এক নিতান্ত সাধারণ মেয়ের প্রেমের কান্না উথলে উঠল তার। এমনি করেই ভজন বারবার তার বুকে হাহাকার তুলে দিয়ে গিয়েছে। তার ঠোঁট নড়ল। কি বলল, বোঝা গেল না।

এ বাড়ীতে যেন একটা ঝড় ব'য়ে গেল। ভজন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থেমে এল।

ভজন বাইরে এসে দেখল, ঘোড়া দুটো ছোলা আর জল খাচ্ছে। ভুনু গাড়ীর ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। মানুষ ও বাতি দেখে ঘোড়া দুটো ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে উঠল, চক্ চক্ করে উঠল তাদের দুটো সন্ত্রস্ত চোখ।

ভজন ডাকল, 'ভুনু সারথী।'

ভুনু বেরিয়ে এল। একবার তাকিয়ে দেখল ভজনের পেছনে তার আত্মীয়দের, শালীকে দেখে ভাবল লাটবাবুর বউ। সে ঘোড়া দুটোর মুখের কাছ থেকে ছোলার পাত্র নিয়ে রেখে দিল তার আসনের নীচে। তারপর পরম আদরে ঘোড়া দুটোর গায়ে হাত বুলতে লাগল।

ভজন বলল, 'ভুনু হাজারবার মানি, এ তোর আসল রাজারাণী! জীবনে কোনদিন এমন ঘোড়ার গাড়ী চাপিনি। তুই কি মন্তর জানিস্?'

ভুনুর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। মাদী ঘোড়াটা তার ঘাড়ের উপর দিয়ে এমনভাবে মাথাটা এলিয়ে দিল, দেখে ভুনুর বুকের মধ্যে টন্ টন্ ক'রে উঠল। মনে হল তার মস্ত চোখ ফেটে এসে জলে পড়বে। ঘোড়ার মাথাটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বহুত্ তখ্‌লিফ হুয়া হ্যায়, না রাণী!.....মেরা রাণী! ....ক্যয়া বে রাজা চল্‌নে কো তবিয়ত মাংতা? লাটবাবু মান গিয়া, তুম্ দুনো রাজারাণী হ্যায়। বহুজীকে উঠতে বল লাটবাবু।'

কিন্তু ভজন বুঝল। কেমন করে যেন সে যুঁইয়ের প্রতিটি ঠোঁটের সঙ্কেতও বুঝতে পারে। বেরুতে গিয়ে সে শালীর দিকে ফিরে বলল, 'কোথায় আছে গৌর, নিতাই, চল তো দেখে আসি।'

শালীর ঠোঁটে বিদ্যুতের মত হাসির ঝিলিক খেলে গেল। বোধ হয় আশা হ'ল, জামাইবাবু থাকবে। কিন্তু কে সাহস করে একটা কথা বলবে ওই মুখের দিকে তাকিয়ে। মুখ নয়, আগুন!

সিঁড়ি দিয়ে উপরে এল ভজন শালীর সঙ্গে। দেখল ঘুমিয়ে আছে তার ছেলে গৌর আর নিতাই। ফর্সা আর কালো, পাশাপাশি দুই ছেলে। প্রথম ছেলে গৌর, সে পেয়েছে বাপের বর্ণ

ও মুখ। পিতৃমুখ ছেলে নাকি সুখী হয় না। মাতৃমুখ নিতাই। ছেলে তো নয়, যেন বাচ্চা মেয়ে যুঁই! নিতাই সুখী হবে তো!

ঘুমন্ত ছেলে দুটোর দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে টন্‌টন্ ক'রে উঠল ভজনের। ওরা যে মাতালের ছেলে। যার ভবিষ্যৎ নেই, তারই ছেলে। কি আছে ওদের ভবিষ্যৎ জীবনে। সে নিজে অভিশপ্ত, অভিশপ্ত তার শ্রীমতী কাফে। ওদের জীবনে শাপমুক্তি ঘটবে তো!

ভজন ওদের ঘুমন্ত গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। দমকা নিঃশ্বাস পড়ল ছেলেদুটোর।

ভজন উদ্‌গত নিঃশ্বাস চেপে বেরিয়ে এল! ওরা ভয় পাবে ওদের বাপকে দেখলে। কাঁদবে।

জামাইবাবুর এ নিঃশব্দ হাত বুলনো দেখে শালীরও বুকের মধ্যে অজান্তে মোচড় দিয়ে উঠল। তবু কথা তার বলতে বাধল। সে আলো নিয়ে নেমে এল সঙ্গে।

ভজন আর কোনদিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

'বহুজী যাবে না রে সারথী! এ যাত্রা হরণ করা হল না। বউ আঁতুড় ঘরে। তুই আর আমি-ই যাব।' ব'লে সে ভিতরে যেতে গিয়ে থেমে আবার বলল, 'ভুনু, তোর মত সারথী পেয়েছি, আজ তোর পাশে ব'সে যাব।'

ভুনু না ব'লে পারল না, 'তুমি সাথী পেলে, আর হামার রাজারাণীর জিন্দেগী চার সাল মে, দু' সাল বিত্ গেল। মগর আপসোস্ নেই।'

মনে মনে বলল, 'শালা একেই বোধ হয় বলে তেজপক্ষের বউয়ের ভায়ের মর্জি রাখা।' রাগটা অবশ্য তার নিজের উপরেই হল।

দু'জনেই তার উপরে গিয়ে বসল। গাড়ী চলল ট্যাঙস ট্যাঙস ক'রে।

সামনে অন্ধকার রাতও মন্দ হয়নি। আকাশের তারা হাসছে যেন ওড়নার আড়াল থেকে। জোনাকি জ্বলছে, উড়ছে।

ভুনু গাড়োয়ান আর ভজুলাট পাশাপাশি, গায়ে গায়ে ব'সেছে। কেউ কথা বলছে না।

পেছনে শাশুড়ী, শালাজ, শালী অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। অবাক কাণ্ড! এমন মানুষ তারা কোনদিন দেখেনি। আর যুঁই ভাবছিল, তবু তো সে এসেছিল। আশ্চর্য! এসেছিল আজকেই, এখুনি। যখন সে মনে মনে শুধু তাঁকেই ভাবছিল। সেই নিষ্ঠুর মানুষটিকে। সেইজন্যই এ কান্না রোধ করা যায় না।

দুদিন পর রাত্রি একটা বেজে গিয়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ। অন্ধকার। শ্রীমতী কাফের সামনে রাস্তাটা ফাঁকা। একটা ছেড়ে দেওয়া নির্জীব ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ীর আস্তানার কাছে পড়ে থাকা দু চারটে ছোলা চিবুচ্ছে।

শীত পড়ছে একটু একটু ক'রে। কেরোসিনের ল্যাম্প চিমনিতে হিম পড়ে ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠেছে।

বাতি জ্বলছে শ্রীমতী কাফের পেছনে। এত রাত্রে বাতি জ্বলে না, আজ জ্বলছে। বিশে বমি করার জন্য বাতি জ্বেলে উঠে এসেছে নর্দমার কাছে। আর উঠতে পারছে না। ওইখানেই মাটির উপর এলিয়ে রয়েছে। তার মাথা ঘুরছে। শিথিল হ'য়ে আসছে হাত পা।

শুধু বমি। বিশে প্রথমে চোখ বড় বড় ক'রে তাকিয়ে ভাবল রক্তবমি হচ্ছে। কিন্তু রক্ত নয়, খয়েরি রং-এর এক অসহ্য একটু স্বাদ-যুক্ত শুধু জল। ভীষণ দুর্গন্ধ। তার সঙ্গে আবার

একটা এ্যালকোহলিক ঝাঁজ। এক একটা উৎকট শব্দের সঙ্গে ভলকে ভলকে বমি আসছে তার।

মাথা আর ওঠানো যাচ্ছে না। সে একবার ওঠার চেষ্টা করল, পারল না। চূড়ান্ত সিদ্ধির নেশার মত তার মাথাটা ঘাড় থেকে যেন ছিটকে পড়বার উপক্রম করল। চোখের সামনে সব ঘুরছে, ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসছে। পেটের তলা থেকে যেন কোন ঘাপটি মারা জানোয়ার হঠাৎ মাথা তুলে সব উপর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ড শুদ্ধ গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

বিশের কোটরাগত চোখে ভয় দেখা দিল। সে দেখল, কে যেন বাতিটা কমিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকার হ'য়ে আসছে। প্রাণের ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল সে, 'ঠাকুর, ঠাকুর বাঁচাও।' সে চীৎকার তার নিজের কানেও পৌঁছুল না। তবু সে চীৎকার করছে। একটা গোঙানির শব্দ বেরুচ্ছে তার গলা দিয়ে।

হুড় হুড় করে কলের জলের মত ঠোঁটের কষ বেয়ে বিষাক্ত তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে। মাটিতে গড়িয়ে প'ড়ে তার গা ভিজে যাচ্ছে। মাটিতে গোঁজা মুখ মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে।

বিশের চোখের সামনে ভাসছে মস্ত বড় জামবাটির এক বাটি মাংস, অনেকখানি ডাল, আর এক থালা জল দেওয়া গলো গলো ভাত। মাংস আর ডাল ট'কো ট'কো। দিয়েছিল খেতে, বাজারের হোটেলের বামুনটা। চেয়েছিল বিশে, তাই দিয়েছিল। একবার মনে হ'য়েছিল সবই যেন পচা পচা। কিন্তু খাওয়া দেখলে সে গন্ধ মানে না। জিভের স্বাদ মানে না। শুধু খাবার। মাংস, ডাল, ভাত।

নাকের কাছে যেন কিসের সুড়সুড়ি লাগছে। সাড় আছে তার এখনো। সে দেখতে চেষ্টা করল; কিন্তু দেখতে পেল না। অন্ধকার হ'য়ে যাচ্ছে। কে আরও কমিয়ে দিচ্ছে বাতিটা।

ছুঁচো শুঁকছে তার নাকের কাছে। নির্ভয়ে চিক্‌চিক্ শব্দ করে, ছুঁচলো লাল্‌চে ঠোঁট কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে। ইঁদুর পালাচ্ছে তার গায়ের উপর দিয়ে। যার দাপটে এ ঘরে ইঁদুর ছুঁচোর দৌরাত্ম্য করার কোন যো ছিল না।

ভয়ের চেতনা স্তিমিত হয়ে আসছে বিশের। নতুন চেতনা আসছে। সে বাঁচতে চাইছে। সে যেন কেমন করে বুঝেছে যে, সে মরে যাচ্ছে। তাই সে বাঁচবার জন্য ভেতরে ভেতরে নিজেকে ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দিতে চাইছে।

মায়ের মুখটা মনে পড়ছে তার। মনে পড়ছে বাবার কথা, তার শৈশবের কথা। গঙ্গার ওপারে, মগরার কাছে এক গ্রাম। মুচিপাড়ার ছেলে বিশ্বনাথ। হারুমুচির প্রথম ছেলে। কালো, হোঁৎকা, এই এতবড় ছেলে। যেন কালো কুলো বাবা বিশ্বনাথটি। ছেলেকে কি করবে হারু? ঢুলি? ঢোল বাজাবে। ওমা! ছেলের হাতে পায়ে একটু ক্ষমতা হতে না হতে ছেলে আপনি আপনি বেরিয়ে গেল। খেতে পায় না যে! মা মারে, বাপে মারে। বাবা বিশ্বনাথ গঞ্জে হাটে ভিক্ষে মেগে বেড়ায়, এটা সেটা হাত ছাপিয়ে নিয়েই মুখে পুরে দেয়। মার খায়, তবুও। ঘরেও তাই। সেই রূপকথার পিঠের ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ গোনার মত। আড়ালে আবডালে লুকিয়ে দেখে, মা কি চড়িয়েছে উনুনে। পেট ভরে তো দেবে না। তাই চুরি করে খায়। বিশ্বনাথ নয়, বিশে রাক্ষস। বাপ মা মরে গেল, রইল খালি বিশে। অনেক ঘাট ঘুরে এখানে। এটার কি নাম! নাম জানে না দোকানের। বেরোয় না মুখ দিয়ে। খালি জানে ভজনকে। ভজন নয়, ঠাকুর, লাটঠাকুর।

মনে হল ঘুম আসছে বিশের। বমি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে ভাল হয়ে যাবে? বোধ হয় তাই। এ যাত্রা বুঝি বেঁচে গেল।

কি বলেছিল ঠাকুর কালকে। কালকে আবার তাকে বলেছিল ঠাকুর, 'বিশে পেটে যার ক্ষিদে, ওরা সবাই তোর মত রে। জন্ম থেকে না খেয়ে খেয়ে, ক্ষিদে তোর বাই হয়ে গেছে। একদিন কেটে যাবে এ স্বভাব।' বলেছিল, ক্ষিদে যার পেটে, তার যে ভগবানও নেই, জাত নেই, দেশ নেই। তার মনুষ্যত্বও থাকে না। আর কি বলেছিল, সেসব বোঝেনি বিশে। বোঝা যায় না। মাতালের কথা কিনা।

হঠাৎ বিশের কালো চামড়া কুঁচকে গা হাত পা বেঁকে উঠল। মনে হল, পেটের ভেতরে, যা কিছু আছে, সব দলা পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে। ছুঁচ বিঁধছে মাথার মধ্যে। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে।

না না, এ যাত্রাটা বাঁচতে দাও। আমার এ স্বভাব কেটে যাবে। আমি অন্য মানুষ হব। ভাল মানুষ, আর একটা মানুষ। এক জন্মে নতুন জন্ম হবে আবার। মানুষের মত। এখনো কত বাকি। মানুষের মত, বিয়ে-ঘর-সংসার।

মা এসেছে। মাগো! আমি আবার বাঁচতে চাই। উড়ে ঠাকুর, আর কোনদিন তোমার কাছে খেতে চাইব না, মাইরী লাট ঠাকুর! একবার তোমার খোক্কস, রাক্ষস, হারামজাদা, শুয়োর, হা-ভাতে বিশের কপালে পা ছুঁইয়ে দিয়ে যাও। এ যাত্রা রেখে দাও আমাকে।

বিশের গলা দিয়ে একটা অস্বাভাবিক আ আ শব্দ হতে হতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে তীব্র বেগে খয়েরী বিষাক্ত দুর্গন্ধ তরল পদার্থ কাঁচা এবড়ো-খেবড়ো মেঝেটাকে একেবারে ভাসিয়ে দিল।

হুস্ করে একটু হাওয়া এল। ঠাণ্ডা হাওয়া। বাইরে রাত কাবার হয়ে আসছে। পূর্ব দিগন্তে আকাশের কোল দেখা যাচ্ছে। ডাউনে একটা মেল ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীরা নামছে। উঠছে না কেউ শুধু নামছে। স্টেশনে কলরব শোনা যাচ্ছে।

শিশির পড়ছে। শিশির জমে উঠেছে শেষ রাত্রে স্টেশনের শেডে, রাস্তার ধারে, অশ্বত্থের পাতায়। পাতা থেকে টপটপ করে জল ঝরছে। শ্রীমতী কাফের বিরাট সাইনবোর্ডের গায়ে জমা শিশির বিন্দু থেকে ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়েছে।

রথীনের সঙ্গে আরও দুটি ছেলে ছড়িয়ে পড়েছে এদিকে ওদিকে। দেয়ালে দেয়ালে, গাছে গাছে, সেঁটে দিচ্ছে কাগজ। ছোট ছোট কাগজ, হাতে লেখা কার্বন কপি। তাতে লেখা রয়েছে, সম্পূর্ণ নতুন কথা। এ অঞ্চলের মানুষের চোখে কখনো এরকম ভাষা আর চোখে পড়েনি। লেখা রয়েছে,

আরউইনের প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসন কেবল ধোকাবাজী।

লর্ড আরউইন ধ্বংস হোক। সর্বহারা বিপ্লব ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আনবে। অস্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

বন্দেমাতরম্!

শ্রীমতী কাফের পেছনের ঘরে বাতিটা জ্বলতে লাগল। ঘরটা যেন একটা জেলখানার সেলের মত শ্বাসরোধী হয়ে উঠেছে। বোবার উৎকট চাউনির মত সমস্ত ঘরটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ঘুঁটে, কয়লা, জলের জালা, উনুন, মাকড়সার ঝুল, সব নিঃশব্দ আড়ষ্ট কিন্তু প্রাণবন্ত। বিশের বাঁচতে চাওয়ার তারা বোবা সাক্ষী।

সকালবেলা পুলিশ রথীনদের লাগানো কাগজগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলছে। জল ছিটা দিয়ে, কাটি দিয়ে, খুঁচিয়ে। টহল দিচ্ছে সেই অফিসারটি।

ভিড় হয়েছে শ্রীমতী কাফেতে, বিশের শব দেখবার জন্য। ডাক্তার এসেছে। পরীক্ষা করে বলেছে, কোন বিষাক্ত জিনিস প্রচুর পরিমাণে ওর পেটে গিয়েছিল। ষ্টমাক ডায়ালুট হয়ে গিয়েছিল। এও একরকমের কলেরা।

বাজারের হোটেলের উড়ে ঠাকুরটা এসেছে। আনমনে কোমরের দাদ চুলকোচ্ছে আর হাঁ করে সকলের কথা শুনছে। যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। কেবল মনে মনে ভাবছিল, 'পুণ্যিটা একেবারে মাঠে মারা গেছে। ব্যাটা মরে গেল।' ....তারপরেই যে ভাবনাটা মনে হল, সেটা সাংঘাতিক। বিশে অপঘাতে মরেছে। অতএব, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। ভয়ে সে চোখ সরিয়ে নিল বিশের মৃতদেহের উপর থেকে। তাকাল একবার ঘরটার আশেপাশে, উপরে নীচে। তারপর সরে পড়ল।

আশেপাশের দোকানদারেরা বলাবলি করছে, 'শালা ছোঁচাটা বোধ হয় কারুর কিছু চুরি করে খেয়েছিল।' হেসে ফেলছে কেউ কেউ।

হীরেনের কষ্ট হচ্ছে। কয়েকদিন আগেও লোকটার প্রতি তার মন বিরূপ ছিল। মনে হত ভাঁড়বিশেষ। বিশের কোন কথা তার বিশ্বাস হত না। এখন তার বুকের মধ্যে করুণার উদ্রেক হচ্ছে। বিশে তারই নিরন্ন অশিক্ষিত দেশবাসী।

রথীন আর সুনির্মল এসেছে। এসেছে প্রিয়নাথ। রথীন আর সুনির্মলের 'প্রিয়দা'। নারায়ণের বন্ধু, প্রায় সমবয়স্ক। কয়েকদিন হল, সে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার মতের সঙ্গে নারায়ণের মতের একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, একটা মস্ত বিরোধ আছে গান্ধীবাদের সঙ্গে। এ অঞ্চলে তার গতিবিধি সীমাবদ্ধ। সে ষ্টেশন ত্যাগ করতে পারে না স্থানীয় পুলিশের বিনানুমতিতে। কোনও শ্রমিক মহলে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এরা, আর কয়েকজন ছেলে মিলে বার করল বিশের মৃতদেহ। একটা উগ্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

বিশে তাকিয়ে আছে, অবাক চোখে। মুখটা খোলা, সামান্য ছুঁচলো হয়ে গিয়েছে। দাঁতগুলো মেলা। ঘাড়টা বেঁকে গিয়েছে। মাছি বসেছে মুখে চোখে।

হীরেন মনে মনে আওড়াচ্ছে,

অন্তকালে চ মামেব স্ময়ন্মুক্তা কলেবরম্।...

কিন্তু বিশের কি কোন দেবতা ছিল? সে শুধু বাঁচতে চেয়েছিল।

দুজন মেথর এসে ঘর সাফ করতে আরম্ভ করে দিল। ভজন ভাবছে, কি খেয়েছিল বিশে। এমন কোন বস্তু তো ছিল না তার ঘরে। কয়েক টুকরো রুটি, আর সামান্য ঘুগনির অবশিষ্ট। কিন্তু সে তো বিষাক্ত ছিল না। তবে হয় তো কোথাও চুরি করেই কিছু খেয়েছিল।

কিন্তু বড় বিশ্রী খাপছাড়া! একটা মানুষ মরেছে, অথচ কেউ কাঁদছে না। সে জানে না, বিশের ঘরের সংবাদ। কে আছে আর কে নেই। শুধু জানত সে বিয়ে করেনি। আর বাপ মা ছিল, আছে কিনা জানা নেই।

ভজন বাইরের সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল। অনেকে হাসছে নয় তো নির্বিকার মুখে চুপ করে আছে। বিশে বেঁচে থাকতে, তার চলা, কথা বলা, খাওয়া সব দেখে লোকে হেসেছে। তার মরা দেখেও সবাই হাসছে।

কার চাপা গলার স্বর ভেসে এল, 'দোকানটায় অভিশাপ লেগেছে।'

চমকে উঠল ভজন। অভিশাপ? সে তাকিয়ে দেখল সারা ঘরটা। অভিশাপ নয়, শ্রীমতী কাফে যেন শোকাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। ওইখানে চিরমুদ্রিত চোখ দেশবন্ধুর। আর একদিকে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ, সামনে তাকিয়ে আছে। গবাক্ষপথে কি যেন দেখছে তলোয়ারধারী সিরাজদ্দৌলা। ক্রুশে গাঁথা জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতার এক দারুণ ও মহাপরিণতির প্রতিমূর্তি যীশুখৃষ্ট। বিশ্বরূপে বিরাজিত র‍্যাফেলের মা ও ছেলে। আর ওই যে বিরাট ল্যান্ডস্কেপ দেখা যাচ্ছে, একটা বুড়ো বটের গোড়া ঘেঁষে পাক খেয়ে বেঁকে গিয়েছে একটা লাল রাস্তা। এঁকেবেঁকে মিশে গিয়েছে, দিগন্তে, যেখানে আকাশ ঠেকেছে। ধূ ধূ পথ আর আকাশ।

ভজনের মনটা যেন ঘরবিমুখ বাউলটার মত ছুটে গেল ওই পথে। হ্যাঁ, সে চলে যেতে চায় এই মুহূর্তে, অনেক দূরে। এ বিশ্বসংসারের বাইরে। শ্রীমতী কাফের অভিশাপে কি বিশে মরেছে? না। এ সংসারের অভিশাপে। অভিশপ্ত জগৎ।

বিশের মড়া নিয়ে সবাই বেরিয়ে গেল। কারা যেন বলাবলি করছে, ছি ছি, এরা আর জাতাজাত রাখলে না। কার মড়া কে বইছে। ঘর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ভজন বন্ধ করে দিল দোকান।

হীরেন বলল, 'বন্ধ করে দিলে?'

ভজন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বিশের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শ্রীমতী কাফে আজ বন্ধ।'

কৃপালও এসেছে। এসেছে আরও কয়েকজন। মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনের একটা বৈঠকের উদ্দেশ্যে তারা এসেছে।

কিন্তু সবাই চাক ভাঙ্গা মৌমাছির মত ছড়িয়ে পড়ল। বিমর্ষ, অপ্রস্তুত সবাই। অবাক! হেসে ফেলল কয়েকজন ভজনের কথা শুনে।

রামা আসছে, হীরেন দেখল। কত লোক রাস্তায়, কতরকম। কিন্তু সে দেখল শুধু একজন। ঘাগরার মত কুঁচিয়ে পরা তার শাড়ী, সামনে পেছনে দুলছে। মাঝারি শক্ত একটা মূর্তি। একটি কালো মুখ। নাক চোখ কিছু নেই। এলিয়ে পড়া ঘোমটা ছাপানো ধুলোরুক্ষ চুল।

ছোকরা পুলিশ অফিসারটি ঘুরে ফিরে এদের দেখতে লাগল, আর মনে মনে ভাবল, আশ্চর্য মানুষ এরা। কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু প্রিয়নাথবাবু মড়াটা কাঁধে করে কোথায় গেলেন? শ্মশানঘাটটা তো ওর এলাকার বাইরে। যাওয়ার পথে হয় তো আবার খানিকটা বিষ ছড়িয়ে যাবেন মজুর লাইনে। ওইখানেই তো মজুরদের লাইনটা পড়বে। সেও এগুল শ্মশানঘাটের দিকে।

বাঙালী সেপাই খুঁচিয়ে কাগজ তুলছে আর পড়ছে মনে মনে, 'আরউইন ধ্বংস হোক। সর্বহারা বিপ্লবী......বৃটিশ.....'বন্দেমাতরম্!' তারপর চকিতে তার নজরটা চলে গেল শ্রীমতী কাফের দিকে। সে শুনেছে, ওইখানেই নাকি এইসব কাগজগুলো লুকনো থাকে।

ডালপুরীওয়ালা হাঁকছে, চাই ডালপুরী......তরকারি। কিন্তু বিশের জিভের লালা চিরদিনের জন্য শুকিয়ে গিয়েছে।

ভজন এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ীর সামনে, তার পুরোনো দোকানের ধারে। এইখান থেকে শুরু। ঘরটা বেঁকে পড়েছে। ছিটেবেড়া এক এক জায়গায় পোকায় খেয়ে বড় বড় গর্ত করে ফেলেছে। কাঠের বোর্ডটা এখনো রয়েছে। ঝাপসা হয়ে গিয়েছে লেখাগুলো। খালি দেখা যাচ্ছে বড় হরফে,

চা। দরজায় কে যেন ইঁটের টুকরো দিয়ে লিখে রেখেছে, ১নং শ্রীমতী কাফে। নীচে, ভজুলাট, লাটের বাট।

ভজন হেসে ফেলল। হেসে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকল সে। ফাঁকা বাড়ীটা। আগে ফাঁকা মনে হত না, বিয়ের আগে। ছেলেপুলে হওয়ার আগে। এখন মনে হয়।

বকুল মা রাঁধছেন। হালদারমশাই জবুথবু হয়ে বসে আছেন রাস্তার দিকের বারান্দায়। ওইভাবে বসে থাকেন সারাদিন অনেক রাত পর্যন্ত।

ভজনের গলা শুকিয়ে গিয়েছে। ঘরে ঢুকে ছোট আলমারীটা খুলে, বোতল হাতে নিয়ে দেখল সেটা খালি। খালি? মাথায় আগুন ধরে গেল ভজনের। জ্বলন্ত চোখে একবার তাকাল হালদারমশাইয়ের ঘরের দিকে। বুঝতে দেরী হল না কে এটি নিঃশেষ করেছে।

বোতলটা দেয়ালে ছুঁড়ে ফেলল সে। ঝন্‌ঝন্‌ করে ভেঙ্গে ছড়িয়ে ছত্রাখান হয়ে গেল। তারপর চীৎকার উঠল, 'আজ থেকে কেউ যেন আমার ঘরে না ঢোকে, কোন জিনিসে হাত না দেয়। এর ফল ভাল হবে না বলে রাখলুম।'

বলে দুম্‌ দাম্‌ করে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

হালদার একটু নড়লেন না, ঘাড় বাঁকালেন না। বোতল ভাঙ্গার শব্দে একবার চমকালেন একটু, নাকের পাশে কোঁচ দুটো আর একটু গভীরতর হল। চোখ দুটো যেন ঠেলে এল খানিকটা। বারকয়েক ঢোঁক গিললেন।

বকুল মা এসে বোতলের ভাঙ্গা টুকরোগুলো একটা একটা করে তুলতে লাগলেন। বিস্ময়ের কিছু নেই, জিজ্ঞেস করবারও কিছু নেই। এ ঘটনা নতুন নয়।

কিন্তু সহ্য হয় না বকুল মায়ের। মা না হয়েও এত দৌরাত্ম্য কেন তিনি সহ্য করবেন। কেন আসবেন এ অপমানকর আসরে। হালদারমশাইয়ের দরজার দিকে তাকিয়ে অভিমানে বুক ভরে ওঠে তার। মনে মনে বললেন, 'আপনার জন্যই, শুধু আপনার জন্যই আমার এ দুর্দশা। ছেলেরা আমাকে কবেই ছেড়ে দিয়েছে, আপনি কার কাছে থাকবেন। চিরকাল এমনি কাজ করলেন যে, আজকে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ার পাথেয়টুকুও আপনার নেই। বুঝি সে সাহসও নেই। কি করে থাকবে; সইয়ের অভিশাপ যে....।' থেমে গেলেন বকুল মা। কি হবে সে কথা ভেবে। হালদার পারেননি, তিনি যে মুক্ত হয়েও কোনদিন খোলা আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারেননি।

ভজনের বিয়ের পর কিছুদিন কেমন একরকম মন হয়েছিল তাঁর। প্রায় রোজই কোথাও না কোথাও কীর্তন গান শুনতে যেতেন। নিজের বাড়ীতে আসর বসাতেন। গুণী গায়ক আর সৎ ব্রাহ্মণের ছেলেদের নিত্য সেবা ও ভোজনের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। তিনি নিজেও যেন বড় কাঙ্গাল হয়ে উঠেছিলেন। এ-রূপের উপরেও তিনি আপনার বৈধব্যের সাজের উপর চুরি করে নিজেকে সাজাতেন।

কিন্তু মন আপনা থেকেই বেঁকে এসেছিল। অপমানে লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিয়ে সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নিজে গান গাওয়া ধরলেন, বুকটা হালকা করার জন্য। লজ্জা সরমও অনেকখানি জলাঞ্জলি দিলেন। কি হবে ও পাপের বোঝা রেখে। প্রাণ খুলে হা হা করে হাসতে লাগলেন, গলা ছেড়ে কথা কইলেন। কে আছে কে নেই, তাও মানলেন না। লোকে ভাবল উলটো রকম। ভাবুক। লোকে আজ একরকম ভাবে, কালকে তা পাল্‌টে যায়। গাইলেন,

ওরে মন তোরে না রাখিব দেহের পিঞ্জরে।

সঙ্কোচ ঘুচিয়ে দিলেন হালদারের সামনে। কথা হাসি গানের আর মানামানি রইল না।

তবু কই মন তো দেহের পিঞ্জর ছেড়ে অসীমের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল না, বেরিয়ে পড়তে তো পারলেন না। ছড়িয়ে দিতে পারলেন না, নিজেকে অসীমের মাঝে। এই যে হাসির ঝঙ্কার, তা কেন মাঝে কান্নার রোল হ'য়ে ওঠে। জানিনে! মনে মনে বলেন, জানিনে। জানলে আর এমনটা হবে কেন?

বোতলভাঙ্গা তুলতে তুলতে বার বার মাথা নাড়তে লাগলেন। কেবলি যেন মনটা গাইল, যত আপদের সৃষ্টি করেছে ওই ছাইয়ের শ্রীমতী কাফে, না কি মুণ্ডু ওটার নাম। এ সংসারে যেন ওটাকে নিয়ে অশান্তি আরও বেড়েছে। ওটা যেন মানুষকে একটা পাগল করা পুরী, একটা যন্ত্র।

কলকাতা থেকে ফিরছে ভজন। আলিপুর জেলে দাদার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। শিয়ালদহে আসবার আগেই কয়েক পাত্র উজাড় করে এসেছে সে।

পকেট থেকে পয়সা বের ক'রে টিকেট কাটতে গিয়ে পা ঠেকে গেল কার গায়ে। বলল, 'কে বাবা। রাধে, পথ ছেড়ে দে। মথরোনগর আমার পথ চেয়ে আছে য্যা!'

আশেপাশের দু' একজন হেসে উঠল। বদ্ধ মাতাল।

ভজন ভাল ক'রে চোখ মেলে দেখল, পায়ের কাছে একটা ছেলে শুয়ে আছে। ধুঁকছে। রাধে নয়, এ যে কালো কেষ্ট ঠাকুরটি। উপোসী কেষ্ট। ধুলো মাখা, ছ্যাতলা পড়া, রোগা শরীর, কচি গালের চামড়ায় টান ধরেছে। চোখ বসে গিয়েছে।

ভজন বলল, 'ধুলোয় গড়াগড়ি করছ কেন বাবা? ঘর নেই?'

ছেলেটার মুখে কথা সরছে না। বোধশক্তি নেই। খালি শোনা গেল, বাবু।....

'আর বাবু বলে কাবু করতে হবে না। এ কলকেতায় আমার বাস নয়। বাড়ী কোথা?'

'চাট গাঁ।'

ভজন বলল, 'মগের মুলুকের ছেলে দেখছি। বাপ মা নেই?'

ছেলেটা কি বলল, বোঝা গেল না। কেবল চোখে জল দেখা দিল। ভজন ভাবল, বাপ মা নেই। বলল, 'এখনো জল আছে ওই চোখে? থাক্, মায়া কান্না রাখ! চা তৈরী করতে পারবে? মাংস চপ রাঁধতে পারবে?'

'পারব।'

ভেংচে উঠল ভজন, 'সব পারবে। কোনটিতে না নেই। ভজুলাটের ঠ্যাঙ্গানি খেতে পারবে?'

ছেলেটা বলল, 'বাবু?'

'বুঝতে পারলে না, না? আমার নাম ভজুলাট, ছিরিমতী কাফের প্রোপাইটার। বুঝেছ? তোমার নাম?'

'আজ্ঞে, চরণ।'

'চরণ! কার চরণ বাবা?'

ছেলেটা আবার এলিয়ে পড়ল! ভজন বলল, 'তা হলে দুটো টিকিটই কাটছি বাবা চরণ। এক ব্যাটা খেয়ে মরেছে, তোমার মরণ কিসে, তা ছিরিমতীই জানে। এ্যাই......এ্যাই খাবারওয়ালা।'

ভজন চেঁচিয়ে ডাকল খাবারওয়ালাকে। বলল, 'দেও, কিছু দেও চরণকে, কিছু গিলে নিক ব্যাটা।'

খাবারওয়ালা বোধ হয় মাতাল দেখে একবার থম্‌কাল। তারপরে চরণের সামনে বাড়িয়ে দিল এক ঠোঙ্গা খাবার।

চরণকে নিয়ে ভজু বাড়ীতে এল। বাড়ীতে আবার খাইয়ে রাত্রেই নিয়ে এল শ্রীমতী কাফেতে। বাতি জ্বেলে এক মুহূর্তে সে ভুলে গেল চরণকে। তার মনে পড়ে গেল বিশের কথা। পরশু দিন রাত্রে এই ঘরটাতে বিশে ছিল। আজ নেই। একটা উগ্র ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ যেন বলছে, বিশে মরে গিয়েছে।

চরণ হাঁ করে দেখছে সারা ঘরটা। উনুন, ঘুঁটে কয়লা, জলের জালা। মাতালবাবুটি তাকে কয়েকবার বলেছে, এ ঘরে একটা লোক মরেছে। কি ভাবে তা সে জানে না। শুনেছে, খেয়ে মরেছে। ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার নয়!

ভজু চরণকে একেবারে সামনের ঘরটা দেখিয়ে বলল, 'এই ঘরে তুই শুবি। ভোরবেলা উঠে উনুনে আগুন দিবি, ঘর সাফ করবি, বুঝেছিস। জীবনে ক'বার চুরি করেছিস্?'

'আজ্ঞে?' চরণ যেন তটস্থ হ'য়ে উঠল। তবু ইতিমধ্যেই তার মনের মধ্যে এই বাবুটি হৃদয়বান ব'লে যেন ধরা পড়ে গিয়েছে।

ভজন বলল, 'বলছি বাবা চুরি টুরি করা অভ্যাস নেই তো?'

চরণ দ্বিধাগ্রস্তভাবে একটু হাসল।

'হাসি হ'চ্ছে?' ভজন বলল, 'যম রদ্দা ঘাড়ে পড়লে আর হাসি পাবে না। আর চুরি যদি করিস্, ওই বিশের মত শিঙ্গে ফুঁকতে হবে, বলে দিলুম। এবার শুয়ে পড়।' বলে ভজন বেরিয়ে গেল।

চরণ দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘরের মেঝের মাঝখানে দাঁড়াল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, টেবিল, চেয়ার, ছবি আর আলো। আলোর শেডের গায়ে লেখাটা বানান করে পড়ল শ্রীমতী কাফে। তারপর তার চোখ গিয়ে পড়ল আয়নায়। তার চেহারাটা ভেসে উঠেছে আয়নার বুকে।

চুলগুলো তার কোঁকড়ানো। ছোট ছোট চোখ, চ্যাপটা নাক আর মেয়েলি ঠোঁট চরণের। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ছাপ তার মুখে চোখে। বেঁটে খাটো শক্ত শরীর। এখন রোগা দেখলেও সেটা বোঝা যায় তার চেহারাটা দেখে। বয়স ষোল সতর-র বেশী নয় কিন্তু গোঁফের রেখা নেই। মুখটা তার মেয়েদের মত কমনীয়।

নতুন আশ্রয়ে এসে চরণের খালি মনে হল, আগামীকাল হয় তো তার এ আশ্রয়ও ভেঙ্গে যাবে। আবার বেরুতে হবে পথে, অজানার সন্ধানে। আবার কোন নতুন আশ্রয়ের আগেই হয় তো পথেই পড়ে মরতে হবে। চলা তার জীবনের শুরু থেকে। চলবে জীবনের শেষ পর্যন্ত। এই বুঝি তার ভাগ্য। শিয়ালদহ ষ্টেশনে ওই অবস্থায় আর দুদিন থাকলে আজকে এখানে আসা তার কোনরকমেই সম্ভব হত না। তার জীবনে অনেক মৃতদেহ সে পথের ধুলোয় প'ড়ে থাকতে দেখেছে। কল্পনাচোখে সে দেখতে পেল, আয়নায় ওই মূর্তিটাও পড়ে আছে রাস্তায়, মৃত, উলঙ্গ, ধুলোমাখা। থু থু ফেলছে পথচারীরা, কাপড় চাপা দিচ্ছে নাকে।

চরণের চোখে ভেসে উঠল তার নিজের জীবনের অতীত কথা। ভেসে ওঠে শৈশবের কথা, বাপ মা'য়ের কথা। ইরাবতীর শস্য শ্যামলা উঁচু তীর তার খেলার ভূমি। মাথার উপরে অসীম

আকাশ। সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় ঝড় গাছপালা ক্ষেত দুলিয়ে হৃদয় তোলপাড় করত। জীবনটা ছিল যেন আকাশের বুকে ঝড়ো পাখীটার খুশির উদ্দামতা। খাওয়া আর হুতোশভরা চোখে দামড়া বাছুরটার মত লাফিয়ে বেড়ানো, এই ছিল কাজ।

কিন্তু সে মাত্র তার দশ বছরের জীবন পর্যন্ত। তার শিশু-জীবনে সব থেকেও কিছুই ছিল না। ছিল না তার মা। ছিল সৎ মা। মায়ের চেয়ে বলা ভাল, উৎকট চেহারার একটি অল্পবয়সী স্থূল মেয়েমানুষ। সে তুলনায় তার বাপ ছিল যেন বুড়ো। তাই মেয়েমানুষটির দৌরাত্ম্য ছিল ভয়ানক। কচি খুকীর মত হেঁচকি তুলে কাঁদত, প্রায় প্রত্যহ কিছু না কিছু তার বাপের কাছ থেকে আদায় করত, তারপর হাসত। হাসিটা মনে হলে এখনো যেন গা ঘিনঘিন্ করে ওঠে চরণের। বিড়ি টানত যখন তখন। কালো কুতকুতে চোখে আবার কাজল দিত, আর কপালে একটা কালো টিপের তলায় দিত সিঁদুরের ফোঁটা। পায়ে পরত বাঁকমল, হাত ভরা রুপোর চুড়ি আর পড়ে পড়ে ঘুমোত। তার বাপের ছোট মুদীখানার কিঞ্চিৎ পুঁজি হলেও সে দেখত, বাপ যেন পোষা বাঁদরের মত মেয়েমানুষটির পেছনে পেছনে ঘুরত। যা চাইত, সবই দিত আবার জোড়হাতে কাছে গিয়ে দাঁড়াত। সে বয়সেই তার মনে হত, বাবাকে টেনে নিয়ে সে এলোপাথাড়ি ঠেঙ্গিয়ে দেয়। কই তার নিজের মা তো এমন ছিল না আর বাপও তার এরকম বোকা ছিল না।

এসব দেখেশুনেই সে বাইরে বাইরে ঘুরত মাঠে মাঠে, জলে পড়ে থাকত। তবু মাঝে মাঝে সৎ মায়ের পাল্লায় তাকে পড়তে হত হাত-পা টিপে দেওয়ার জন্য। তখন মেয়েমানুষটি প্রায় উলঙ্গ হয়ে পড়ত। শাস্তি দিতে সে শুধু পিটত না, একদিন থুথু ফেলে সে বাধ্য করেছিল চরণকে তা চেটে নিতে।

ভরা বর্ষার টাবুটুবু ইরাবতীর চেয়েও চরণের চোখে বুঝি বেশী জল ছিল। বাবা যেদিন পিটত সেদিন সে মাঠ নালা ভেঙ্গে চলে যেত বহু দূরে আর না ফেরার মনস্থ করে, কিন্তু যেখানেই শ্মশান পড়ত, সেখান থেকেই পালিয়ে আসত সে।

দিনের বেলা তার এমনি কাটত একরকম, কিন্তু রাত্রি নামত যেন তার কাছে নরকের মত। এ সময়টা ছিল তার সৎ মায়ের বাবার কাছ থেকে সমস্ত দাবী আদায়ের সুযোগ। তাকে ঘুমন্ত ভেবে সৎ মা খোলাখুলি যেন যাদুমন্ত্র শুরু করত। আর চরণ তাদের গাঁয়ে মাঠে অনেক উলঙ্গ মানুষ দেখেছে; কিন্তু তার শিশু চোখ অত বড় বীভৎস উলঙ্গ রূপ আর কোথাও দেখেনি। এবং তার বাবা সোৎসাহে মানত সমস্ত দাবী।

তারপর এমনি এক রাতের সুযোগে তার মাথায় বজ্রাঘাতের মত সৎ মা দাবী করে বসল এ বাড়ী থেকে তার পুত্র চরণের বিতাড়ন। নরকের প্রতিটি মুহূর্তই টগবগ করে ফোটে। বাপ তার রাজী হয়ে গেল।

ভয়ে কান্নায় আর ঘামে সে রাতটা যে কেমন কাটল তা বুঝি সে নিজেই জানে না। পরদিন তার বাবা যখন তাকে নিয়ে গাঁয়ের থেকে অনেক দূরে বাজারের একটা দোকানে কাজে লাগিয়ে দিয়ে এল সেদিন একটা কথাও সে বলেনি। মানুষের এতবড় হীনতায় সে কাঁদতে পারেনি। সে বিশ্বাস করতে পারেনি, এ সংসারে আবার মানুষের বাবা বলে কেউ থাকতে পারে।

তারপর এ দোকানে সে দোকানে, চাকরের কাজ করে, এক মহকুমা থেকে আর মহকুমা, জেলার শহর থেকে একেবারে রেঙ্গুন। রেঙ্গুন থেকে সোজা কলকাতা। এর মাঝে যে জীবনটা কেটেছে, তার সমস্তটাই ঠাসা ছিল সব বীভৎস ঘটনা, দুর্দান্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির সব নরনারী; তাদের নানান্ ভাষা ও পেশা, দুরধিগম্য স্থান এবং জমাট অন্ধকার ভরা।

আর চরণ দেখেছে, জীবনের এত যে বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা, সবই শুধু টাকা পয়সা সোনার জন্য। পাগলা জানোয়ারের মত এ পৃথিবীর অতল গুহায় সব হন্যে হয়ে হাতিয়ে ফিরছে কেবলি সোনা। খুন জখম্, প্রেম হাসি, সবই শুধু সোনার জন্য। রক্তের বদলে সোনা।

কেবল কলকাতায় তাকে যিনি নিয়ে আসছিলেন, তিনি ছিলেন দেবতা। তাঁর কেউ ছিল না, রোজগারও করতেন না। কলকাতা আসবার মুহূর্তে চরণ তাকে ধরেছিল, এ মুলুক থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি বলেছিলেন, 'সে-ই ভাল, তোমার মনিব যদি ছেড়ে দেন তো চল। পরের দেশে ভাগ্যান্বেষণে যারা আসে, তারা চিরদিনই নিষ্ঠুর। সে অন্বেষণ কানাকড়ি হলেও তাই।'

তারপর জাহাজে উঠে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'চরণ, তুমি আমি আমরা সবাই নানান্ গর্ভ থেকে জন্মে এমনি পরিচয়ের সীমানায় এসে পৌঁছেছি। কোন অপরিচয়ের বাধা আমাদের আটকাতে পারে না।—ওই দেখ, অসীম সমুদ্র, অনন্ত আকাশ.....ওই সুদূর অচেনাকে আমরা জয় করব। তুমিও অসীমের সন্ধান কর।'

কোন কথাই চরণ ভাল বুঝতে পারেনি, কেবল তার চোখের কোল ছাপিয়ে জল এসে পড়েছিল।

কিন্তু তিনি আচমকা মারা গেলেন। কথা বলে ডেক্ থেকে কেবিনে গিয়ে শুলেন, চরণকে বললেন, 'আমার বুকটা একটু হাতিয়ে দাও।'

হাড্ডিসার বুকটা হাতাতে হাতাতে তিনি ঘুমোলেন, আর উঠলেন না। কলকাতার পুলিশ তাকে কয়েকদিন আটকে রেখে নানান্ কথা জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দিল এই দুস্তর দুরধিগম্য বন্দরে। তারপর শিয়ালদহ, মনিব ভজুলাট। মনিবের নিজের মুখ থেকেই শুনেছে সে ওই নামটা, ভজুলাট। কী অদ্ভুত নাম। আর এই দোকান। এও বড় বিচিত্র নাম, শ্রীমতী কাফে।

তার মনে পড়ে গেল, পরশুদিন একজন মরেছে এই ঘরে। এই ঘরে সে যেখানে রয়েছে। কোন্ দেশের মানুষ সে, কেমন সে দেখতে ছিল, কে ছিল তার, কিছুই সে জানে না। কত তার বয়স, তারও চরণের মতই মা বাপ ছিল কিনা কিছুই তার জানা নেই। শুধু শুনেছে, মরেছে। কিন্তু তার ভয় করছে না। মরণের কথায় মানুষের কত ভয়। তার সে ভয় নেই। মরণ কোন সময়েই তার পেছন ছাড়েনি। বাগে পেয়েও পারেনি গ্রাস করতে। পরশু এখানে একজন মরেছে, আজকে সে এখানে এসেছে বাঁচার জন্য। আশ্চর্য! মরণ বাঁচন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

মনে পড়ছে, জাহাজের সেই বাবুর কথা, 'ওই দেখ অসীম সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, ওই সুদূর অচেনাকে আমরা জয় করব। তুমিও অসীমের সন্ধান কর।'.....সেই অসীম কি! কি আছে, কি আছে সেখানে!

মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল চরণ। নিজের কাপড়েরই একাংশ পেতে গুটিসুটি হয়ে ঘুমোল।

নিশান্তে দিন, দিনান্তে নিশি। চক্রাকারে সময় এগিয়ে চলল।

শ্রীমতী কাফে তার অচল অবস্থাটা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে। আবার জমে উঠতে আরম্ভ করেছে তার সকাল সন্ধ্যার আসর। দিনে দিনে ভজনও যেন বড় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠছে। যেমন বেড়েছে তার পানের নেশা, তেমনি বেড়েছে পাগলামি। মাঝে মাঝে দেখা যায় বিকৃত মুখে

পেটটাকে চেপে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে রয়েছে। তার শরীরের মধ্যে ব্যাধি প্রবেশ করেছে, কিন্তু কোনদিন সেকথা কাউকে মুখ ফুটে বলতে শোনা যায় না। সে আত্মসমর্পণ করেছে চরণের কাছে। দোকানের সব ভারই প্রায় চরণের উপর। টাকা পয়সা পর্যন্ত চরণের হাতে চলে গিয়েছে।

আজকাল সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই প্রিয়নাথের সঙ্গে কৃপালদের তর্ক হতে দেখা যায়। ঠিক তর্ক নয়, প্রিয়নাথকে সকলে বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত করে তোলে। প্রিয়নাথকে শ্লেষ করে হাসাহাসির হররা পর্যন্ত পড়ে যায়। প্রিয়নাথ নিতান্তই একলা পড়ে গিয়েছে। হীরেন অবশ্য বিদ্রূপ করে না, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করে তর্ক করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় সে প্রিয়নাথকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আবহাওয়া এমনভাবে পেকে উঠেছে যে, নিজেদের মধ্যে বাগযুদ্ধের বহর কিছুটা কমে এসেছে। সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের আপসের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। গান্ধীজী ইয়ং ইন্ডিয়াতে ঘোষণা করেছেন, তাঁর এগারো দফা দাবী সরকার মেনে নিলে সমূহ আন্দোলনের কোন প্রয়োজনই হবে না। কিন্তু সরকার এগারো দফার একটাও বিবেচনা করতে রাজী নয়। ফলে সকলের মধ্যেই একটা উত্তেজনা ও প্রতীক্ষা থম্‌থম্ করছে। দেশ জোড়া অসহিষ্ণুতা। সংবাদপত্রগুলো হিংসাকামী কর্মীদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে গান্ধীজীর আদর্শ। সাবধান করে দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের।

কৃপাল সেইজন্য একদিন প্রিয়নাথকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, 'তুমি শ্রীমতী কাফেতে আস বলেই পুলিশের নজর বারবার এদিকে এসে পড়ছে। এখন তোমার সরে পড়া উচিত।' তার জবাব দিয়েছিল ভজু, 'এখানে যার প্রাণ চায় সে আসবে, যার চায় না, সে আসবে না।' মনে হয় ভজুর বেশ খানিকটা পক্ষপাতিত্ব আছে প্রিয়নাথের উপর।

কৃপাল ভাবল, উল্টা বুঝল রাম। যার ব্যবসার ভালর জন্য বলতে গেলুম, সে-ই তেড়ে মারতে আসে। কিন্তু হীরেন এভাবে প্রিয়নাথকে তাড়িয়ে দিতে চায় না। এমনকি, প্রিয়নাথ অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে বলে হীরেন তাকে কয়েকবার আর্থিক সাহায্য পর্যন্ত করেছে। তার বিশ্বাস ছিল, শত হলেও আমরা সকলেই কংগ্রেসের সভ্য। আমাদের যদি কোন মতবিরোধ থাকে, তবে তার অবসান করতে হবে নানান আলাপ আলোচনায়।

রাত্রি আটটার পর ভাঙ্গা আসরে এল বাঙ্গালী। বাঙ্গালী আরও কয়েকদিন এসেছে। এসে শ্রীমতী কাফের বারান্দায় ধপাস করে বসে পড়ত। ভজনের সঙ্গে বক্ বক্ করে চলে যেত।

আজকে এল বাঙ্গালী প্রায় মত্ত অবস্থায়। এসে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে গান ধরে দিল,

'আমি দুখচেটে দুখীরাম, আমার কথা বলো না,
আমার নেই সুখের সঙ্গে কোন বনিবনা।'

বলে সে ধপাস করে বসে পড়ল বারান্দার উপর।

ভজন বলল, 'কি হল রে?'

'আর ঠাকুর, তুমি সব ভেস্তে দিলে।' দেয়ালে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ে সে বলল, 'তোমরা সব বাবুরা এক রকোম্। আগে রাস্তার ধারে বসে তোমার ছিটেবেড়ার ঘরে চা খেয়ে এসেছি। আগে ছিলে তুমি আমাদের, এখন তুমি পর হয়ে গেছ।'

কথাটা ভজনের প্রাণে লাগল। বলল 'কেন বল দিকিনি?'

'কেন আর কি। বাড়ীতে যেদিনে ভাত পেতুম না, সেদিনে তোমার দু পয়সার ঘুগনি খেয়ে কাটিয়ে দিতুম। আর এখন তোমার দোকানের দিকে চাইতে ডর লাগে।'

ভজন বলল, 'তাই বুঝি তুই কোনদিন আমার দোকানে ঢুকিস্‌নে?'

বাঙ্গালী মাতালের হাসি হাসল। বলল, 'ঢুকে কোথা বসব। ওই চ্যারে? শালা ছেলে বউ রাস্তা দিয়ে গেলে যে চিনতে পারবে না গো ঠাকুর। ভাববে কোন্ লাটের পো বসে আছে।'

সকলে হেসে উঠল। প্রিয়নাথ আর হীরেন, গোলক চাটুজ্জেমশাই আর কয়েকজন খদ্দের। কৃপাল গিয়ে জমেছে সারদা চৌধুরীর বৈঠকখানায়।

ভজন চেয়ার ছেড়ে দু'হাত ধরে টেনে তুলল বাঙ্গালীকে। বলল, 'আয় তবে, লাটের পো হয়েই বসবি আজ।'

হা হা করে হেসে উঠল বাঙ্গালী, 'কর কি ঠাকুর। চ্যারে বসতে গেলে আমি আছাড় খাব মাইরী।'

'আছাড় খেলে গা টিপে দেব, তা বলে মিছে অপবাদ শুনবে না ভজুলাট।' বলে টেনে বসাল তাকে হীরেনেরই পাশের একটা চেয়ারে। তারপরে বলল, 'বলি হ্যাঁ রে, দু পয়সার ঘুগনি কি ভজুলাটের দোকানে বেচে না, না কেউ খায় না? শালপাতায় নয়। চীনে মাটির প্লেটে। তাতে কি তোমার জাত যাবে?'

'জাত গেলে তোমার দোকানের যাবে, আমাদের ওসব নেইকো।' বলে সে চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে বসে বলল, 'দু পয়সার ঘুগনি দেও ঠাকুর, চেখে বাড়ী যাই। ওখানে আমি বসতে পারব না।'

তারপরে হীরেনকে নজরে পড়তেই তার পায়ে হাত দিয়ে বলল, 'রাগ কর না লেউগীবাবু, মদ খেয়েছি, ভেবেছিলুম তোমাকে একটা কথা বলব। বলব এখন?'

নিয়োগীর অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু এড়াবার উপায় নেই। বলল, 'বল।'

বাঙ্গালীর মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। তাতে তার লাল চোখে ফুটল যেন নিষ্ঠুরতা। বলল, 'তোমরা সেদিন মিটিনে বললে, দেশের লোককে লেখাপড়া শেখাবে, জাত বেজাতের ছোঁয়াছুঁয়ি উঠিয়ে দেবে। কে তোমার কলকেতা থেকে এক বাবু এসেছিলেন, তিনিও বলেছেন।'

হীরেন বলল, 'তোমার ভাল লাগেনি বোধ হয়?'

বাঙ্গালী বলল, 'ভাল লেগেছে। কিন্তু বাবু তোমাদের মন্দিরে আমরা যেতে চাইনে, ছোঁয়াছুঁয়ির কি দরকার। আমাদের পেট ভরে দুটি খাওয়ার পথ বাতলে দেও। বারো মাস আর ছেলে বউয়ের শুকনো মুখ দেখতে পারিনে। মাসে চোদ্দ টাকা মাইনে, এসব কি আর নড়চড় হয় না?'

হীরেন রাগ করল না। কিন্তু প্রিয়নাথের সামনে প্রশ্নটা তাকে যেন একটু বেকায়দায় ফেলল।

ভজন বলল, 'ব্যাটা বদরসিক হীরেন, কেটে পড়।'

হীরেন বলল, 'কেটে পড়ব না। বাঙ্গালী, আমরা সেইজন্যই স্বরাজ চাইছি। স্বরাজ আমাদের একলার নয়। কিন্তু তার মর্যাদা রাখতে হবে। খাওয়াটা অনেক বড়, তবু এ ছাড়া কি স্বরাজে আর কিছু নেই?'

বাঙ্গালী অন্যদিকে তাকিয়ে নীরবে মাথাটা নাড়ছিল। একটু একটু ক'রে তার চোয়ালটা শক্ত হ'য়ে উঠল। ছোট হ'য়ে এল চোখ দুটো। শক্ত হয়ে উঠল হাতের মুঠি। বলল, 'আছে, সেটাও

তোমাকে বলি লেউগীবাবু। এর এট্টা ব্যবস্থা তোমরা কর। আমাদের সঙ্গে কাজ করে লোটন, খোট্টা। থাকে কুলিবস্তীতে। আমাদের কাজ পথে পথে। আমাদের দশজনকে বললে, ভোর পাঁচটার মধ্যে এখান থেকে এগারো মাইল দূরে যেতে। সায়েব বাবুরা বলে খালাস, এট্টা টলির বন্দবোস্তও নেই। তা লোকে কেমন ক'রে যাবে? কালা সায়েব বললে, পায়ে হেঁটে। এমনিতেই সেদিন পথে বাঘ বেরিয়েছিল। রাত ক'রে যাবার ভয়ে লোটন বলেছে, অত সবিরে সে যেতে পারবে না। তা বললে বিশ্বাস যাবে না বাবু, শুনে সাদা সায়েব লোটনের পাছায় ঘপ ক'রে কষালে এক লাথি, আর কালা সায়েব চুলের মুঠি ধ'রে এনতার কিল চড় ঘুষি।'

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল বাঙ্গালী। তাকে দেখে মনে হ'ল হিংস্র আক্রমণে এখুনি বুঝি শত্রুকে ধরে সে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে। দপ দপ করে জ্বলে উঠল চোখ দুটো। বলল চিবিয়ে চিবিয়ে, 'তা' বাবু প্রাণটা চাইল, ওই সাদা কালা দুটো কুত্তার বাচ্চাকে ওইখানেই গাব্বর দে ঠেঙ্গে ফেলে দে আসি লাইনে। কিন্তুক পারিনি।'

পারিনি বলতে গিয়ে যেন গলার স্বরটা একেবারে সপ্তম থেকে ভেঙ্গে তলার পর্দায় নেমে এল তার। মনে হল অসহায় আক্রোশের বাষ্প জমে উঠেছে তার গলায় আর চোখে। বলল, 'উল্টে আমাদের দশজনের এক টাকা ক'রে মাইনে কেটে দিলে। বাবু, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা আমাদের, অ আ ক খ মাথায় থাক, এ পেঠে পিঠে মার আর কদ্দিন সইব বল। বল।'

বলতে বলতে গলার স্বরটা তার নিভে এল। আচমকা সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

ভজন পেছন থেকে ডাকল, 'বাঙ্গালী শুনে যা।'

বাঙ্গালী শুনল না। কেমন একটা অসহ্য অস্থিরতা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। সে নিজেও বুঝতে পারল না, কেন এমন হল! সে নিজেও জানে না, প্রাণটা ছুটতে না চাইলেও কেন এমন ক'রে সে ছুটছে। কেন শীতের কুয়াসা-ঘন রাস্তাটা তার চোখের সামনে অন্ধকার হ'য়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কেন একটা নোনা জলের স্বাদ তার ঠোঁটের দুই কষের ভেতর দিয়ে গিয়ে মুখটাকে লবণাক্ত করে তুলছে।

শ্রীমতী কাফে নিস্তব্ধ। ভজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। হীরেনের গায়ের থেকে চাদরটা খুলে প'ড়ে গিয়েছে নীচে। সে তাকিয়ে আছে দূরে, ষ্টেশনের ওভারব্রীজ পেরিয়ে, টিনের শেডের তলা দিয়ে ঝাপসা তারা ভরা এক টুকরো আকাশের দিকে। প্রিয়নাথের দুই চোখে আগুন। বাঙ্গালীর চোখের মত তার চোখ দুটোও জ্বলছে। চাটুজ্জেমশাই খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে হতভম্বের মত বসে আছেন। তিনজন খদ্দের ছিল, তাদের অবস্থাও চাটুজ্জেমশাইয়ের মত। কিছুটা-বা বিস্ময় ও মর্মাহত।

রাস্তা দিয়ে সেই ছোকরা পুলিশ অফিসারটি যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। নিজের হাত ঘড়িটা একবার দেখে কাফেতে উঠে এসে হেসে বলল, 'কি ভাবছেন প্রিয়নাথবাবু?'

চমকে উঠে প্রিয়নাথ অফিসারের দিকে তাকাল। অফিসার একটু ঘাবড়ে গেল তার চোখ দেখে। প্রিয়নাথ বলল, 'কি বলছেন?'

আরও অমায়িক গলায় বলল অফিসার, 'না, কিছু না। ন'টা দশ। ভাবলাম, আপনার হয় তো মনে নেই।'

প্রিয়নাথ দেয়ালের দিকে ফিরে তাকাল। ন'টা বেজে গিয়েছে। পেন্ডুলামে দুলছে কঙ্কালের মুখটা।

কয়েকদিন হল, সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত তার বাড়ীর বাইরে থাকার মেয়াদ বেড়েছে। সে কোন কথা না বলে উঠে পড়ল।

অফিসারটি সকলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'নমস্কার হীরেনবাবু।'

'নমস্কার।' হীরেন তার চাদরটা কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে।

অফিসারটিকে কিরকম বোকা বোকা মনে হতে লাগল। যেন সে কোথাও অনধিকার প্রবেশ করেছে। সে একজন বাঙালী যুবক। আই. এ. পাশ করেছে। এখনো তার জীবনে অনেক শখ আছে। মনে তার কাব্য আছে। রীতিমত কাব্যরসিক। গানের দিকে ঝোঁক আছে। প্রায়ই গানের মজলিস বসায় সে। অগণিত লোক তাকে ভয় করে, শ্রদ্ধা করে। অনেকে তার করুণাপ্রার্থী। এই পথের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কত লোক তাকে সেলাম করে।

অথচ এই শ্রীমতী কাফেতে কোনদিন সে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারেনি। এই একটি জায়গা এই অঞ্চলে, যেখানে ওঠবার আগে তাকে ভাবতে হয়, তার ইউনিফর্ম পরা সাবলীল গতি বাধা পায়। যেখানে সেলাম নেই, আছে বোধ হয়.....। কি আছে সেটা ভাবতে গিয়ে অসহায় রাগে ও দুঃখে তার বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হয়। হঠাৎ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে ভজনের দিকে একবার তাকিয়ে গটগট ক'রে বেরিয়ে গেল সে।

হীরেন বারান্দায় এসে দাঁড়াল ভজনের সামনে। তার কিছু বলার ছিল প্রিয়নাথকে। বলা হল না। মনে মনে ভাবল সে, যদি কৃপাল হতুম, আমি কিছুই বলতুম না। কিন্তু বাঙ্গালীর এ বেদনা যে তারও বেদনা। সে কি জানে না দেশবাসীর এ দারুণ দুঃখ ও অপমানের কথা। সে বলতে চেয়েছিল প্রিয়নাথকে, শাসকের হৃদয় পরিবর্তন যতক্ষণ না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতিকে প্রতীক্ষা করতে হবে। অন্তত এ শাসকের বিদায় লগ্নের জন্যও অপেক্ষা করতে হবে।

হীরেন ডাকল 'ভজু।'

ভজন ঘুরে বলে উঠল, 'দোহাই তোমার হীরেন, আমাকে আর কিছু ব'লো না মাইরী।'

বলে সে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল।

হীরেন বিস্মিত হ'য়ে ভজনের দিকে একবার তাকাল। দেখল, অদূরে দরজার কাছে শ্রীমতী কাফের বাবুর্চি চরণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছেলেটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। দেখছে তার অপ্রস্তুত অবস্থাটা।

ভাবল, তারই ভুল হয়েছে ভজনকে কিছু বলতে যাওয়া। সে পথে এসে দাঁড়াল। একবার নসীরাম ঘোষের ওখানে যেতে হবে। কিন্তু মনটা বড় ভার হ'য়ে এল। ভার হ'য়ে এল, তার নিজেরই দিশেহারা মনটার জন্য। সত্যি, বাঙ্গালীর দুঃখের যে সীমা নেই।

কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য, ভজনের এ কারখানা শ্রীমতী কাফে। জীবনের সব বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলো তার এইখান থেকেই হয়েছে। এইখানেই রামার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়েছে। রামা! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলল সে!

কে একটা পাড়ারই ছেলে বারকয়েক দোকানের সামনে পায়চারী ক'রে টুক ক'রে দোকানে ঢুকে পড়ল। যেন কোন নিষিদ্ধ জায়গায় প্রবেশ করেছে। ঢুকেই ভজনের দিকে একবার ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে হাতের ইশারায় ডাকল চরণকে। এসব ছেলেদের চরণ চেনে। ওরা সব মস্ত ভজুলাটকে ভয় পায়। যদি ক্ষেপে গিয়ে একটা কিছু ক'রে বসে।

বাদবাকী যে তিনজন বসেছিল, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল ভজুর কথা।

ফিসফিস ক'রে। তিনজন যুবক। ব্রাহ্মণ। এখানে খেয়ে গিয়ে তারা পাড়ায় গল্প করে। বলে কত নিষিদ্ধ বস্তু তারা খেয়েছে। আর.....তার ভজুলাট মাইরী ভারী মজাদার লোক। আমি একটু ঝোল চেয়েছিলুম মাংসের, তো মাইরী এ্যাত্তবড় একটা মাংসের টুকরো দিয়ে দিলে। ওখানে বসে একদিন মাল না খেতে পারলে শালা জীবনটাই বৃথা।

কিন্তু তাদের তো সে সাহস নেই। একজন বলল, 'মাইরী খচে গেছে।'

আর একজন, 'তুই পয়সাটা দিয়ে আয় না?'

'হ্যাঁ, তারপর আমার বাপান্ত করুক।'

চরণের হাত দিয়ে পয়সা দিয়ে একে একে সবাই বেরিয়ে গেল।

রাত্রি বাড়ছে। চরণ তার ভাত বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পেছনের এই নিঃসঙ্গ ঘরটায় বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। সে বারবার মাঝের ফালি ঘরটা পেরিয়ে চলে আসে সামনের ঘরের দরজার কাছে। সামনে আসে না, যদি ভজু কিছু বলে। দরজার কাছ থেকে সে তার কালো মুখ বাড়িয়ে থাকে যেন একটা অন্ধকারে জীবের মত। তবু সামনের ওই রাস্তাটা তো দেখা যায়।

মাঝে মাঝে পেছনের ছিটেবেড়ায় একটা ফট শব্দ শোনা যায়। চরণ বোঝে বাজারের সেই কান ঝোলা কুত্তিটা ল্যাজের ঝাপটা দিয়ে চরণকে ডাকছে। কোন কোনদিন যমদূতের মত কুটে পাগলা তার পেছনের দরজায় এসে দাঁড়ায়। অনেক রাত্রে, যখন ভজু চলে যায়। এসে বলে, 'কি রে শালা কি করছিস্?' চরণ চমকে উঠে কয়লা ভাঙ্গা লোহাটা হাতে নেয়। তার কি রকম ভয় হয় কুটে পাগলাকে। এক একদিন কুটে ভয় দেখাবার জন্যই বলে, 'ঢুকব রে শালা তোর ঘরে।' তারপর বিকট দাঁত বের করে বলে, 'উঁ, শালা যেন আমার র‍্যাজাটে মাগ। চোখ পাকিয়েই আছে। খোল দরজা তোর কাছে শোব।'

চরণ যেন তখন সত্যি একটা শঙ্কিত মেয়েমানুষের মত প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে চীৎকার করে ওঠে, 'আয় একবার তোর মুণ্ডুটা এইখানেই থেঁতলে দেব।'

কুটে বলে হেসে, 'হেঁ হেঁ দে দে মাইরী, একটু কিছু দে, নিয়ে কেটে পড়ি।'

চরণ চপ কাটলেটের অবশিষ্ট তাকে দিয়ে দেয়। কুটে পাগলা শান্ত হ'য়ে ভেগে যায়। চরণ ওসব খাবার কোনদিন মুখে দিয়ে দেখে না। তার ভাল লাগে না।

রাত্রি বাড়তে থাকে। চরণ ভাত নামিয়ে বসেই থাকে। তখনো ভজন ওঠেনি। কখন উঠবে কোন ঠিক নেই। এমন সময় আবার এল বাঙ্গালী। তার লাল চোখে লজ্জা ও সংকোচের হাসি। এ লজ্জা তার এখান থেকে তখন ওভাবে চলে যাওয়ার জন্যই। এত শীতের মধ্যেও তার নীল কুর্তার বুক খোলা। বলল, 'কই ঠাকুর, ঘুগনি দেও।'

ভজন মাথাটা তুলে বলল, 'এ্যাই য্যা। তাই তো ভাবি, বাবু গেলেন কোথায়। কোথায় মরতে যাওয়া হয়েছিল?'

তেমনি হেসে বাঙ্গালী বলল, 'মেয়ে পাড়ায়।'

'মেয়ে পাড়ায়? কেন রে?'

'আমাদের লবার বউ যে ছমাস ঘর ছেড়ে চলে এয়েছে গো। বেশ্যে হয়েছে।'

'কেন নবার কি হল?'

একটু যেন বিরক্ত হয়েই জবাব দিল বাঙ্গালী, 'তোমার বড় বেবভোম্ বাবু। গেল সালে লবা মরে গেল না? তা'পর তোমাদের ওই তিলকঠাকুর ভুলিয়ে ভালিয়ে নে এল বউটাকে কাজ দেবে বলে। নিজে কদিন ফূর্তি করে ওই কাজ দিয়েছে এখন। ছেলেমানুষ তো।....তা ওর কাছে গে এট্টু বসেছিলুম। খাওয়ালে ঠাকুর। কচুরি, গজা, সন্দেশ....। আমাকে বললে, ভাসুর, এস মাঝে মাঝে।'

বাঙ্গালী দেখল ভজুলাট এক মনে তার কথাগুলো শুনছে। আর কি যেন বিড়বিড় করছে।

রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। শীতের রাত্রি। ষ্টেশনের রকে কয়েকজন মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আকাশটা প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে কুয়াশায়। কেবল শুকতারাটা অনেকখানি উঠে এসেছে পুব কোণ থেকে।.....ভুনুর গাড়ীটা তখনো রয়েছে। ভুনু ছিল না। কোথা থেকে হেঁটে এসে সে উঠল শ্রীমতী কাফের বারান্দায়।

বাঙ্গালী আপন মনে তখনো বলছে, 'লবার সঙ্গে বে' দে' আমরাই তো নে এলুম তারকেশ্বর থেকে। এই এতটুকুন মেয়ে। আর এখন। পেত্থমে ছুঁড়ির পরে ভারী রাগ হয়েছেল। আজ আর রাগ হল না। ঠাকুর, ভাবি কোনদিন লবার কপাল আমার হবে।'

ভাবতে পারে না। ভাবতে পারে না ভজন এ সমস্ত কথা। মনে হয়, তাকে যেন কেউ একটা জালের মধ্যে আটকে রেখেছে। মনে হয়, তার শিক্ষা দীক্ষা সম্মান শক্তি সমস্তটুকু নিয়ে সে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। তার ভয় হচ্ছে। না, এতটুকু বিশ্বাস তার নেই। মত নেই, পথ নেই তার। তার চারদিকে শুধুই বিভীষিকা! দাদার কথা মনে পড়ছে তার। সেই নির্ভীক শান্ত মুখ। কেন এত নির্ভয়, কিসের এত নির্ভয়। আমি তো পারিনে এত শান্ত থাকতে। আমার গৌর, নিতাই, যুঁই, আমার এই অন্তঃসারশূন্য শ্রীমতী কাফে, আমার বাবা, আমার দেনা, আমার ভয়, বেদনা, সুখ, দুঃখ, এসব ছাড়া যে আমার নিষ্কৃতি নেই। এত যে হা হা ক'রে হাসি, এত যে নেশা করি, তাতে আমি যে আমার নিজেকে কখনোই ছাড়িয়ে উঠতে পারিনি। আমার যে কেবলই সব ধরে রাখার ভাবনা। ভাবনা, ভয়, উৎকণ্ঠা। এ যুগ ক্রুদ্ধ, বীভৎস, বিশ্বাসঘাতক। কতদিন এমনি জোর ক'রে আমি বেঁচে থাকব। বুঝি আমাকে হার মানতে হবে, অনুপযুক্ত প্রমাণিত হতে হবে এ যুগের কাছে।

হতাশা কি অসহ্য। অবসাদ কি দুরন্ত। কিন্তু তবু নবার বউ মরতে যায়নি। ছি, ছি, কেন মরতে যায়নি। নবার বউ গলায় দড়ি দিলে গৌরবের হ'ত। কিন্তু আজ। আবার ভাবে, আজ নয়, যেভাবে হোক, মানুষ যে কেবল বাঁচতেই চায়! এই বাঙ্গালী হয় তো একদিন বাঁচার জন্য ছুটে যাবে দেশে দেশে, আজ মরেনি, কালকে কালাধলা সাহেবের গলা টিপে শেষ ক'রে দিয়ে জেলের ভাত খাবে, ফাঁসির দড়ি পরবে গলায়।

আর আমি? আমি শুধু প'ড়ে থাকব। মাথা তুলে সে মোটা গলায় আবৃত্তি শুরু করল,

এ মহানিদ্রা ঘুচিবে জানি,
আকাশে ধ্বনিবে অভয়বাণী।

'ঠাকুর।' বাঙ্গালী ডাকল, 'এ আবার তুমি কি শুরু করলে?'

'কিছু নয়।' বলে সে উঠে মদের বোতল নিয়ে এল। ভুনুকে ডাকল, 'এস, আর কেন?'

তারপরে তিন জনে তারা নিঃশব্দে মদ খায়। খেয়ে নিঃশব্দে ওঠে। ভুনু চলে যায় গাড়ী নিয়ে। বাঙ্গালী বাড়ী না গিয়ে উত্তর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। ভজন বাড়ীর পথ ধরে।

শীতল রাত। অন্ধকার। ভজন চলেছে যেন অনেকখানি কুঁজো হ'য়ে। একদিন শ্মশান থেকে সে এমনি ফিরেছিল।

নিঃসঙ্গ একাকী চরণ। ঘুম নেই। পিছনের ঘরে এসে ইঁদুর পাতা কলটা একবার দেখে। ছুঁচো তাড়া করে। কান ঝোলা কুত্তিটার সঙ্গে কথা বলে। আবার এসে শোয়। তার চওড়া বুকটা ভেদ করে একটা নিঃশ্বাস পড়ে। অন্ধকারে চক্‌চক্ করে চোখ দুটো। বড় একা মনে হয় নিজেকে তার।

ঘড়ির পেন্ডুলামে দোলে কঙ্কালের মুণ্ডুটা। যেন বিশে দাঁত বের করে মাথা দোলাচ্ছে। টক্ টক্ টক্।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। চলেছে রাত-পুলিশ। একটা সাইকেল চেপে চলেছে পুলিশ অফিসার। ছোকরা অফিসার। একবার তাকায় নিঝুম শ্রীমতী কাফের দিকে। তীক্ষ্ণ সন্দেহান্বিত চোখে।

সন্ধ্যাবেলা। চপ কাটলেট ভাজতে ভাজতে হঠাৎ চমকে উঠল চরণ। দেখল, পেছনের দরজা দিয়ে কাকে কাঁধে নিয়ে ঢুকছে রথীন। ঢুকে কাঁধের থেকে নামিয়ে, শুইয়ে দিল মাঝের ঘরের বেঞ্চিতে। শোয়াল সুনির্মলকে। রিভলবার ছোঁড়া প্র্যাকটিস করতে গিয়ে তার হাতে গুলি লেগেছে। গুলি করেছে রথীন। টার্গেট দেখাতে গিয়ে আর হাত সরিয়ে নেওয়ার অবসর হয়নি সুনির্মলের।

সুনির্মলের হাতে ন্যাকড়া বাঁধা, কিন্তু সেটা লাল হ'য়ে উঠেছে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। দাঁত চেপে চুপ ক'রে আছে সে। যন্ত্রণায় কালো হ'য়ে উঠেছে মুখটা। চোখের কোণে জল জমে উঠেছে। কিন্তু নিঃশব্দ। এমনকি নিঃশ্বাসও চেপে ফেলছে। রথীন বলল, 'ভজুদা'কে ডেকে দাও। কেউ যেন টের না পায়।'

চরণ জানে রথীনকে। কয়েকদিন রথীন তার কাছে অনেক কাগজপত্র রেখে গিয়েছে। একদিন একটা স্যুটকেশ রেখে গিয়েছিল। আর একদিন ভোর রাত্রে তাকে দিয়ে ময়দায় কাই তৈরী করিয়ে নিয়েছিল দেয়ালে পোস্টার মারার জন্য। ভজন এসে সব দেখে চমকে উঠল, 'এ কি ব্যাপার?'

রথীন বলল সব কথা। ভজন অসহায়ের মত বলল, 'তা এখানে এনেছিস কেন? এখুনি যে ধরা প'ড়ে যাবি?'

'কোথায় যাব?' ভজনের চেয়েও অসহায় মনে হল রথীনকে।

ভজন হেসে ফেলল। 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। চল তবে সব শুদ্ধ জেলে যাই।'

এমন সময় প্রিয়নাথও এল সেখানে। বলল, 'মন্টুর কাছে ওর সংবাদ পেয়েছি। রথীন, তুমি এক কাজ কর, সন্তোষ মাসীমার কাছে চলে যাও। গিয়ে সব ব'লে, এখুনি তোমার সঙ্গে হরেন ডাক্তারকে নিয়ে এস। ভজু তুমি কিছু টাকা দিয়ে দাও।'

ভজন বলল, 'মাফ কর বাবা, এ সন্ধ্যার ঝোঁকে মালের দামটাও পুরো ওঠেনি এখনো।'

ব'লেই ভজনের মনে হ'ল সুনির্মলের যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টিটা তার দিকেই রয়েছে। কি মনে ক'রে আবার বলল, 'শুধু তোরা মরিস্ না, আর একজনকে মেরে মরিস্। নে, নিয়ে যা, যা আছে।' বলে ভজন ড্রয়ার খালি ক'রে সব দিয়ে দিল রথীনের হাতে। রথীন বেরিয়ে গেল। প্রিয়নাথ কোলে টেনে নিল সুনির্মলের মাথাটা। বলল, 'চরণ, এ ঘরে বাতি নিভিয়ে তুমি কাজ করগে। ভজন'—

প্রিয়নাথ ভজনের সমবয়সী। ভজন কাছে এলে সে বলল, 'আজ কি তুমি নেশা করবে না?'

একটু অবাক হয়ে ভজন প্রিয়নাথের দিকে তাকাল। বলল, 'করতে যাচ্ছিলুম, বাধা পড়েছে। পয়সা নেই, তা'ছাড়া এখন আর মন চাইছে না।'

প্রিয়নাথ বলল, 'এমনি হয়, কিন্তু মনটাকে একটু চাওয়াও ভাই। দোকানটাকে একটু মাতিয়ে রাখ।'

ভজন যেতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। বলল, 'প্রিয়নাথ, ছোঁড়া বাঁচবে তো? আমার আশ্রয়ে এসে উঠেছে ও।'

প্রিয়নাথ হেসে বলল, 'বাঁচবে বৈকি।'

জীবনে বোধ করি এই প্রথম ভজন অনিচ্ছায় নেশা করল। প্রথম রাত্রে রোজকার মত জমে উঠল দোকান। কৃপালের সঙ্গে আজ সারদা চৌধুরীও কংগ্রেসের সভ্য হয়েছেন। কৃপালেরই কারসাজি। চৌধুরী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাঁড়াবেন। হীরেন বসে আছে খানিকটা অপাংক্তেয় হ'য়ে। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভাঁড়ামো বলে মনে হচ্ছে।

আটটা বেজে গেল। পুলিশ অফিসার একবার টহল দিয়ে গেল শ্রীমতী কাফের সামনে দিয়ে। ভজনের তা চোখ এড়াল না। মদ খেয়েছে, কিন্তু নেশা তার ধরেনি আজ। বাঙ্গালী এসেছে। বসে আছে বারান্দায়। অপেক্ষা করছে প্রিয়নাথের জন্য। প্রিয়নাথ তাকে আসতে বলেছিল। কিন্তু জানে না, প্রিয়নাথ পেছনের ঘরেই রয়েছে।

ইতিমধ্যে সুনির্মলের ড্রেস হ'য়ে গিয়েছে। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়ে চলে গিয়েছেন কয়েক মিনিট আগে।

প্রিয়নাথ বলল, 'রথীন, রেল মজুরদের সম্পর্কে সেই কার্বন কপির ইস্তাহার লেখা হ'য়েছে?'

রথীন জানাল, হয়নি। হয়নি, তা জানত প্রিয়নাথ। গম্ভীর হ'য়ে উঠল তার মুখ। বলল, 'তোমার এই গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির চেয়ে সেটা অনেক দরকারী কাজ ছিল রথীন।'

রথীনের মুখ রাগে থম্‌থমিয়ে উঠল। আরও কয়েকদিন এমনি কথা সে শুনেছে প্রিয়নাথদাদার মুখে! তাতে তার রাগ হয়েছে, ঘৃণা হয়েছে, অবিশ্বাস ও সন্দেহ উঁকি মেরেছে তার মনে। ইনি নারায়ণদা'র সহকর্মী। বেশীর ভাগ সময়েই বাইরের নানান জায়গায় ইনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। নারাণদা'র অনুপস্থিতিতে ইনিই নেতা। কিন্তু সম্প্রতি ওঁর মুখে নতুন একটা কথা শোনা যাচ্ছে, সমাজতন্ত্রবাদ। কথায় কথায় মজুর কৃষক আন্দোলন। সেখানে রথীনের কোন প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু সমিতির জীবনের প্রতি ওঁর কোন দায়িত্ববোধ নেই!

রথীন জবাব দিল, 'আমি বলছি, দরকার ছিল।'

প্রিয়নাথ মর্মাহত হ'য়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবে?'

রথীনের চওড়া চোয়াল শক্ত হ'য়ে উঠল। হাতের মুঠি পাকিয়ে চাপা গলায় বলল সে, 'রেলের ইউরোপিয়ান ইয়ার্ড ম্যানেজারকে আমরা গুলি ক'রে মারব।'

'ভুল।' প্রিয়নাথের মুখ দিয়ে খালি একটা কথা বেরিয়ে এল। অনেক কথা বলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু কি বলতে হবে, সব কথা তার জানা নেই।

রথীন বলল, 'ভুল কেন? সমাজতন্ত্রে কি শত্রুকে মারা হবে না?'

'হবে, নিশ্চয়ই হবে কিন্তু এভাবে নয়।' কিন্তু কিভাবে সে-সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রিয়নাথেরও নেই। শুধু, এটা সে জেনেছে সমাজতন্ত্রের আন্দোলনে, গণসংগঠন পূর্ণমাত্রায় হলে শত্রুকে আঘাত করতে হবে। অর্থাৎ সর্বহারা বিপ্লবে গণসংগঠিত হলে শ্রমিকরাই সাহেবদের মারবে। সে বলল, 'মারব ঠিকই রথীন, কিন্তু শ্রমিকরা আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

রথীনের মনে হল, তাতে সব ভেস্তে যাবে। উপরন্তু তার মনে সন্দেহ ঘনিয়ে এল আরও গাঢ় হ'য়ে। ভাবল, কাপুরুষের মত কথা বলছেন প্রিয়নাথদা। হয় তো তিনিও অহিংস আন্দোলনের পথে চলে যাবেন। সে খালি তীব্র গলায় বিদ্রূপ ক'রে বলল, 'নারাণদা' থাকলে আপনি হয় তো একথা বলতেন না।'

প্রিয়নাথ জবাব দিল, 'বলতুম, একশোবার বলতুম, রথীন। এই আমার বিশ্বাস।'

রথীন তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে প্রিয়নাথের দিকে। পকেটে তার লোডেড্ রিভলবার। তার ক্রুদ্ধ অবুঝ মনটার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ একটা অন্য রকমের আপসের মতই মনে হ'তে লাগল। শ্রমিক বিপ্লব একটা ধোঁয়াটে সংস্কার। এই ধোঁয়াটে ভাবের মধ্যে তার কেবলি সুনির্মলের রক্তাক্ত হাতটার কথাই মনে পড়ছে। তার সন্ত্রাসবাদী জীবনে এ লজ্জা ও বেদনা রাখবার ঠাঁই ছিল না। তার উপরে এক দুর্বোধ্য আদর্শের দ্বারা তার প্রায় আজন্মলালিত বিশ্বাসের প্রতি আঘাত সে সইতে পারছে না।

সে খালি বলল, 'আপনি আর কোন কথা আমাকে বলবেন না।'

প্রিয়নাথও বুঝতে পারছিল রথীনের মনের অবস্থা। সে বুঝতে পারছে, রথীন অস্থির হ'য়ে উঠেছে। ওর রাগ হ'চ্ছে। এমনকি এ রাগ একটা বিশ্রী ঘটনাও ঘটিয়ে দিতে পারে। তবু এ রাগ অস্বাভাবিক নয়, অন্যায় নয়। কেননা, সে পরিষ্কার করতে পারছে না তার মনের কথা। বলতে পারছে না, তার পথ দীর্ঘদিনের, ধৈর্যের এবং যন্ত্রণার পথ। তারও মনের মধ্যে একটা অসহ্য ছটফটানি নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার জন্য। কিন্তু রথীন একটা কিছু করে বসতে পারে। না করলে হয় তো ওর শান্তি হবে না।

সে বলল ঠাণ্ডা গলায়, 'বলব না। তবু একটা অনুরোধ করব, ইয়ার্ড ম্যানেজারকে এখন মেরো না। তাতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।'

রথীন আরও খানিকটা ঝাঁজ দিয়ে বলল, 'আপনার নীতিতে হয় তো তাই।'

বলে সে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে, এটা সে বুঝল ম্যানেজার মারা মতলব তাকে ত্যাগ করতে হবে। প্রিয়নাথদা'র অমত মানে, সমিতির সকলের মনের মধ্যেই একটা সংশয় এসে পড়বে। তা'ছাড়া সুনির্মল অসুস্থ।

প্রিয়নাথ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। রথীনের উপর সে রাগ করতে পারছে না, কিন্তু অপমানে জ্বলে যাচ্ছে তার বুক। রথীনের চোখ মুখে কি অসহ্য ঘৃণা, অবিশ্বাস ও সন্দেহ। মতাদর্শের বিরোধ নয়, রথীন তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান। নিজেকে একবার দেখে নেওয়ার জন্য যেন সে মনের তলায় ডুব দিল। সত্যই কি তার চরিত্রে কোন মালিন্য দেখা দিয়েছে। তার বিশ্বাস কি কলঙ্কের পথ ধরেছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তারও মনের মধ্যে ক্রোধ জ্বলে উঠল। ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো। মনে হ'ল রথীনকে অত কথা বলতে দেওয়ার আগে উচিত ছিল, একটি ঘুষিতে ওকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়া। ওর পকেট থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে, হাত দুটো মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলে রাখা উচিত ছিল।

ভজন এল এসময়ে চরণকে একটা হাঁক দিয়ে। এসে বলল, 'কেমন ভাল তো? উঃ, মাইরী কি আয়োডিনের গন্ধটাই বাইরে যাচ্ছিল। ভাবলুম, দিলে ঠেলে সব শুদ্ধ।'

শান্ত হ'য়ে এল প্রিয়নাথের মন। এতখানি রাগের জন্য নিজেকে ছিছিকার দিয়ে উঠল সে। বরং উৎকণ্ঠা এল তার মনে। ভাবল, রথীন হয়তো সত্যি একটা কিছু ক'রে বসবে। ওর কাছেই যাওয়া উচিত আমার এখুনি। ওকে বোঝাতে হবে। ভুলে যাচ্ছি এ গাছ আমরাই পুঁতেছি। সত্যি, সেকথা ভাবলে যে, আমারই হাত নিস্‌পিস্ ক'রে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ইয়ার্ড ম্যানেজারকে সাবাড় ক'রে দিয়ে আসি এই মুহূর্তে। সে বলল, 'ভজু, আমি এবার যাচ্ছি। ও এখন ভাল আছে। তবে খুবই সাবধান, ধরা পড়ে গেলে ভয়ানক গণ্ডগোল হ'য়ে যাবে।'

ভজন বলল, 'বাঙ্গালী যে তোর জন্য বসে আছে?'

'আজ আর ওর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। তুমি ওকে বাড়ী যেতে ব'লে দিও। আর.........সুনির্মল রইল। হয় তো রথীন আবার আসবে রাত্রে। তবু তুমি চরণকে একটু সাবধান ক'রে দিও।'

বলে সে নর্দমা পেরিয়ে রাবিশ মাড়িয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

বাইরের ঘরে ভিড় ঝিমিয়ে এসেছে। কৃপাল চলে গেছে তার সাঙ্গপাঙ্গ সহ। হীরেন বসে আছে একলা। আগামী কাল মহকুমা কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যদের একটা সভা হওয়ার কথা আছে। নবীন গাঙ্গুলী আসবেন সেখানে। তিনিই প্রেসিডেন্ট। সেখানে হীরেনের অনেক বক্তব্য আছে। তাই ভাবছে সে। কিন্তু সচেতন চোখ এড়ায়নি ভিতরের ঘরে একটা কিছু ঘটছে। কিছুটা সে আন্দাজও করেছে এবং সেই সঙ্গে স্থানীয়ভাবে কোন গণ্ডগোলের আশঙ্কা করেছে সে। সে বুঝতে পেরেছে রথীনদেরই কোন ঘটনা ঘটেছে। শুধু এই নয়, আরও অনেক কথা তার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এমন কি বাঙ্গালীর বসে থাকার ধরন দেখেও তার মনে হচ্ছে, সে নিশ্চয়ই কোন কারণে এসেছে। কিন্তু হীরেন কিছু বলেনি। সে বলবে না। দেশের যাতে ভাল হয়, তাই যদি ওরা করে করুক, কিন্তু কোন অকারণ গণ্ডগোল ও রক্তপাতের সৃষ্টি যেন না হয়। কিন্তু রামার হাসি কি দুর্নিবার হয়ে উঠেছে দিন দিন। প্রায়ই দেখা যায়, একটা জোয়ান ডোমের ছেলে ওর পেছনে পেছনে ফেরে। কেন?

বসে আছেন গোলক চাটুজ্জেমশাই। কিছুক্ষণ আগেই তিনি এক ঠগের গল্প জুড়েছিলেন, যে কথা শুনে সারদা চৌধুরী উঠে পড়তে বাধ্য হয়েছেন।

বাঙ্গালী ঘুমিয়ে পড়েছে বারান্দার উপরেই। একটা লোক মাংসের হাড় চিবুচ্ছে। নিরালা পেয়ে, মনের সুখে চোখ বুজে দাঁত খিঁচিয়ে, কটরমটর ক'রে চিবোচ্ছে। তারপর হঠাৎ যেন অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখল, হাড়ে আর একটুও মাংস নেই। হাঁপিয়ে পড়েছে। হতাশার নিঃশ্বাস পড়ল একটা।

ভজন তাকিয়ে দেখল সুনির্মলকে। ঘাড় এলিয়ে শুয়ে আছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা আটকে দিয়েছে গলার সঙ্গে, কাপড়ের ফালি দিয়ে। মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ। নিশ্বাস পড়ছে তো? পড়ছে। সে কি বলবার জন্য মুখটা তুলতে গিয়ে বলতে পারল না। হঠাৎ তার দম বন্ধ হ'য়ে এল। মুখটা লাল হ'য়ে উঠল। পেটে একটা ভীষণ ব্যথা

উঠছে। এমনি হঠাৎ ব্যথাটা উঠে যেন তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয়। অসহ্য। বাড়ী যেতে হবে। সে একটা কবিতা বলতে যাচ্ছিল। 'আজকের রাতটা আর ঘুমোসনি—দেখিস্ একে।' ভাবল বিপদ আসতে পারে, দোকানে পুলিশ আসতে পারে কাল সকালে। কিন্তু ওকে ফেলে তো দিতে পারিনে। যদি শ্রীমতী কাফে বিসর্জন যায় সেটা ভাববার অবকাশ পরে পাব।

নিঝুম রাত। জেগে আছে চরণ। অন্ধকার। বাতি নেভানো যদি কুটে পাগলা আসে। কিন্তু কার জন্য জেগে থাকা। এ কে চরণের। কেউ নয়, তবু জাগতে ইচ্ছে করছে। ভালবাসতে ইচ্ছে করছে সুনির্মলকে। কয়েকবার চুপিসারে হাত বুলিয়েছে সে সুনির্মলের গায়ে। এরা ভয়ানক, এরা ভাল, এরা পবিত্র। এদের বাবা মা বাড়ী, এদের লেখাপড়া, সব কিছু মিলিয়ে চরণ কত তুচ্ছ, এরা কোনদিন কি জীবনে কোন নোংরামি দেখেছে? চরণের মত অভিশপ্ত হ'য়ে ওদের কি কোনদিন বাঁচতে হবে। না! ওদের ভাগ্য আলাদা। ওদের কাজ আলাদা তাই ওরা কত মহৎ কাজ করে, স্বদেশী করে, জেলে যায়। সেই তুলনায় আমি কত হীন, কত কুৎসিত ঘরে আমার জন্ম। সেই বীভৎস মা নিষ্ঠুর বাবা।

কিন্তু এ শুধু তাই নয়। চরণের ঘুমহীন নিঃসঙ্গ রাত্রে আজ সে সঙ্গী পেয়েছে। একাকীত্ব সে আর সহ্য করতে পারে না। তার সে একাকীত্ব ঘুচিয়েছে সুনির্মল। তার মনের মত মানুষ। ইদানিং তার ফাঁকা মনটা নিয়তই কাউকে চাইছিল। যাকে ভাল লাগে, যাকে একটু ভালোবাসা যায়। আজ সে পেয়েছে সুনির্মলকে। শীত খুব। তবু নিজের গায়ের কাঁথাটা সে সুনির্মলকে দিয়েছে। কাঁথাটা নোংরা, তবু দিয়েছে। সে সব দিতে পারে, সব। কারুর জন্য, অনেকের জন্য, মনের মানুষদের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিতে প্রাণ চায় তার।

সকালবেলা ভজন দোকানে আসতে না আসতে সুনির্মলের বাবা এসে হাজির। সারা রাত প্রায় ঘুম হয়নি ভজনের। মেচেতা পড়া চোখের কোল তার আরও বসে গিয়েছে। রুগ্ন দেখাচ্ছে মুখটা। তার সঙ্গে সঙ্গে সারা রাত জেগেছে যুঁই। সারা রাত কেঁদেছে অন্ধকারে আর ভজনের আরামের জন্য সেবা করেছে। একটু ঘুম এনে দেওয়ার জন্য অপরাধ বোধে ভজন নির্বাক ছিল, রোগের যন্ত্রণার উপরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল আর একটা যন্ত্রণা। তার উপরে আর একটা দুশ্চিন্তা ছিল দোকানের জন্য। সুনির্মল সুস্থ হ'য়ে যেতে পারে, কিন্তু দোকানটা নষ্ট হলে এ সংসারটা যে অচল হ'য়ে পড়বে।

সুনির্মলের বাবা এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে, রাতজাগা উৎকণ্ঠা নিয়ে। শুধু উৎকণ্ঠা নয়, ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছে ভদ্রলোকের। তাঁর ছেলের সর্বনাশা পথের কথা তিনি জানতেন। সাদা সরল মানুষ এসেই ভজনের হাত ধরে প্রায় ডুকরে উঠলেন, 'আমার ছেলে কোথায় বল।'

'আপনার ছেলে!' অবাক হওয়ার ভান করল ভজন।

'হ্যাঁ, আমার ছেলে, যার মাথাটি তোমার দাদা খেয়েছেন। আমার সেই একমাত্র ছেলে সুনির্মল। দোহাই তোমার, বল সে কোথায়?'

ভজন বলল, 'এই মরেছে, আমি কি করে জানব? আমি কি ওদের দলের লোক?'

সুনির্মলের বাবা প্রায় কেঁদে উঠলেন, 'বাবা, আমায় লুকোস্‌নি, আমি জানি, তুই ওদের লোক। খুব ভাল, এরকমভাবেই নিজেকে গোপন করে রাখ। কিন্তু ছেলেটা কোথায় বল। সে যে কাল দুপুরে বেরিয়েছে, আর তো ফিরল না সারা দিনে রাতে। বলে দাও, আমি আর কোনদিন ওকে তোমার এ দোকানে আসতে বারণ করব না।'

আর কোনদিন এ দোকানে আসতে বারণ করবেন না, দলের লোক, এসব কি বলছেন ভদ্রলোক! অবাক হ'ল, হাসি পেল ভজনের। বুকের কোথায় যেন খচ্‌ খচ্‌ করতে লাগল। ও! তাই বুঝি ভাবে সবাই ভজনকে। ভজুলাটকে। মাতালটাকে। মনে মনে ছি ছি করল সে নিজেকে, ছি ছি করল লোককে। তবু তাকে ভেক নিতে হ'ল। বলল,

'দেখুন কাকাবাবু, কাল সুনির্মল আমার কাছে এসেছিল।'

'তারপর?' উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলেন সুনির্মলের বাবা।

'আমাকে বলল, ওর কোন্ কলেজের বন্ধুর সঙ্গে ক'দিন কোথায় বেড়াতে যাবে।'

'সে কি, কলেজ থেকে যে ওর নাম কাটিয়ে দিয়েছে? বন্ধু আসবে কোত্থেকে?'

প্রমাদ গণল ভজন, 'তা তো জানিনে। আমাকে এই বলেছিল। আচ্ছা আপনি যান, আমি খবর নিচ্ছি। পুলিশে খবর টবর দেবেন না, তা'হলে একটা গণ্ডগোল হ'য়ে যেতে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ী যান।'

'সত্যি বলছিস্ বাবা?'

'সত্যি বল্‌ছি।'

ভদ্রলোক একটু যেন নিশ্চিন্ত হলেন। যেতে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বললেন, 'ছেলে যে আমার খারাপ নয়, তা' আমি জানি। তা সে যে যা-ই বলুক। দেখছি তো পাড়ার ছোঁড়াগুলোকে। ওরকম হ'লে আমি গলায় দড়ি দিতুম। কিন্তু বড় ভয় করে বুঝলে। সারাটা রাত এল না। মানে, ছেলে কিনা, মানে', ...গলাটা বন্ধ হ'য়ে গেল ভদ্রলোকের। হাসতে গেলেন, ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল। ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'যাচ্ছি নিশ্চিন্ত হ'য়ে।'

চলে গেলেন সুনির্মলের বাবা। ভজন ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল, চরণ হাসছে দাঁত বের করে।

ভজন খেঁকিয়ে উঠল, 'অত হাসি কিসের। আমাকে বিপদে পড়তে দেখে হাসি হ'চ্ছে।'

ব'লে এগুতেই চরণ চড়চাপড় খাওয়ার ভয়ে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু তাকে কিছু না বলে ভজন ভেতরে ঢুকে দেখল, সুনির্মলও শুয়ে শুয়ে হাসছে। মুখটা তার শুকনো, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। বলল, 'উঃ, আমি ভাবছিলুম, ভেতরে ঢুকে পড়ল বুঝি। ভজুদা মাথা থেকে কথাটা বেশ বার করেছ তো?'

'তোর জন্যে কি বলেছি? বলেছি আমার দোকানটার জন্য। বুড়ো হাঁক্ হাঁক্ করে ঢুকত, লোক জানাজানি হ'ত। বেকায়দায় পড়তুম আমি। ধরে নিয়ে যেত তোকে, আর গণেশ উল্টে ব'সে থাকত আমার। কিন্তু এসব রমজানি এখানে আর ক'দিন চালাবে।' ভজন কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় কাত ক'রে দাঁড়াল।

সুনির্মল বলল, 'আমি তো রথীনকে বলেছিলুম, সন্তোষ মাসীমার ওখানে নিয়ে যেতে।'

'তবে সেখানে গেলেই হ'ত। শেষটায় মিছে কথা বলালি আমাকে দিয়ে। বুড়ো আবার না এসে কি ছাড়বে! বলে দলের লোক।'

খানিকটা আপন মনে বলল, 'আমার ব'য়ে গেছে। এ দেশের লোকের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই সব তিল থেকে তাল ক'রে বেড়াচ্ছে।'

বলে সে রান্নাঘরে ঢুকে থম্‌কে দাঁড়াল। দেখল, উনুনের ধারে বড় প্লেটের উপর ডবল ডিমের মামলেট আর মাখন রুটি সাজানো রয়েছে। কি ব্যাপার। সে ডাকল, 'চরণ।'

চরণ তার পেছনেই ওই ডাকের জন্য তটস্থ হ'য়ে অপেক্ষা করছে। ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর ভাব তার চোখে মুখে। কিন্তু হাসিটি ছাড়েনি। বলল, 'আজ্ঞে।'

'আজ্ঞে এদিকে এস তো।' বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে চরণের দিকে। ভাবল, এ হারামজাদাও কি লুকিয়ে খায় নাকি। বলল, 'সকালবেলা খদ্দেরের খ নেই, ও খাবার কার জন্য সাজিয়েছ চাঁদ?'

'আজ্ঞে।' বলতে গিয়ে তেমনি সলজ্জ হেসে থেমে গেল চরণ। তবে ভজনের হাতের রেঞ্জের বাইরে।

'আজ্ঞে কেন, ব'লে ফ্যাল্‌ না হারামজাদা।' খেঁকিয়ে উঠল ভজন।

চরণ সুনির্মলকে দেখিয়ে বলল, 'ওই বাবুর জন্যে।'

'মাইরী?' ভজনের চোখ কুঁচকে উঠল। 'বাছার আমার বাবুঅন্ত প্রাণ দেখছি। দামটা কে দেবে?'

চরণ বলল, 'বাবুর শরীরটা.....'

ভজন ধমকে উঠল, 'চুপ! যেন কতকেলে বাবু ওর।'

বেশী অবাক হয়েছে সুনির্মল। সে ব্যাপারটা কিছুই জানে না। বলল, 'আমার জন্য খাবার? কই আমি তো কিছু—'

ভজন হাত তুলে ভেংচে উঠল, 'থাক্‌ তোমাকে আর ভালমানুষি করতে হবে না। শালা— একটা আমাকে খেয়ে ফতুর করার তালে তালে ছিল, আর একটা খাইয়ে ফতুর করবে দেখছি।'

চরণের দিকে ফিরে বলল, 'দাও, আর কেন? তা বাবুর তোমার কালকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে। ওই ডিম রুটির সঙ্গে একটু দুধ জ্বাল দিয়ে দাও, উব্‌গার হবে।'

চরণ বুঝল খ্যাঁকানির আড়ালে এটা আসলে নির্দেশ। সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠল দুধ জ্বাল দিতে।

ভজন সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'তারপর দেখছি আমি তোর ওস্তাদিটা। ব্যবসা গুটিয়ে দূর করে দেব এখান থেকে তোকে দাঁড়া। তার আগে চল্‌ থলেটা নিয়ে বাজার ঘুরে আসি।'

ব'লে সে সামনের ঘরে চলে গেল। চরণ হাসি মুখ নিয়ে ফিরে তাকাল সুনির্মলের দিকে। সুনির্মলের মুখেও হাসি। এদিক থেকে ভজনের স্বরূপটা তারা জানে।

নতুন বছর পড়ে গেল। ইংরাজী নতুন বছরের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি আচমকা মুক্ত হ'য়ে এলেন নারায়ণ।

বিকালবেলা, বিনা সংবাদে তিনি এসে দাঁড়ালেন স্টেশনের রকে। অবাক হয়ে তাকালেন শ্রীমতী কাফের দিকে। পেছনে দুজন কুলি বিছানা বাক্স মাথায়।

নারায়ণ এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির সামনে। শ্রীমতী কাফের মাথায় পেছন থেকে ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়েছে তার মুখে। তার মুখে বিস্ময়, হাসি হাসি ভাব, একটা দ্বিধা, একটা বেদনার আভাস। কিন্তু তার চেয়েও বেশী তার চোখে মুখে ছড়িয়ে আছে একটা মুক্তির উল্লাস। তার ক্ষুধার্ত চোখ, লুব্ধ শিশুর জিহ্বার মত সমস্ত কিছু গো-গ্রাসে গিলছে! সবই যেন তেমনটি আছে

কেবল শ্রীমতী কাফেটি ছাড়া। এই লাল ধুলো ভরা রাস্তা, ঘোড়াগাড়ীর আস্তানা, দোকানের সারি। হঠাৎ বাঁক নিয়ে মোড় ফেরানো গঙ্গামুখো পশ্চিমের রাস্তাটা, মোড়ের ন্যাড়ান্যাড়া অশ্বত্থ গাছটা, তলায় সেই মুচি, দোকানদারদের সেই পরিচিত মুখগুলো, তারপর দক্ষিণের দীর্ঘ সড়ক। দুপাশে তার গাছের সারির মধ্যেই ওদিকে কোথায় লুকিয়ে আছে একটা একতলা বাড়ী। একটা বাড়ী, তার খানকয়েক ঘর, রক, পাতকুয়ো, খিড়কি দ্বার, পাঁচিলের গায়ে একটা পেয়ারা গাছ, পেছনে পাড়া আর প্রতিবেশী।

নারায়ণের চোখ ছল্ছল্ করে উঠল। মাকে মনে পড়ছে। মা, বকুল মা, বাবা, ভজন, তার বউ আর ছেলে। বুকটা যেন যুগপৎ শূন্যতায় পূর্ণতায় ভরে উঠল। ইচ্ছে হল ওই ধুলো ভরা রাস্তাটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরেন; মুখটি গুঁজে দেন রাস্তার কোলে। তাঁর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। চোখের জল তিনি কিছুতেই রোধ করতে পারলেন না।

রাস্তায় ভিড় বিকালের, ট্রেনের। পথচারীদের মধ্যে হঠাৎ কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কয়েকজন দোকানী। ভুনু আর দু একজন গাড়োয়ান চেঁচাতে গিয়ে থম্‌কে গিয়েছে। যাত্রীটি শাঁসালো নিঃসন্দেহে কিন্তু এ যেন ঠিক তেমন যাত্রীটি নয়। সকলেরই যেন চিনি চিনি মনে হয়, তবু বলা যাচ্ছে না মুখ ফুটে।

হঠাৎ কুটে পাগলা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওগো, লারাণ ঠাকুর এসেছে গো। লারাণ ঠাকুর এসেছে।'

বলতে বলতে খপ করে এসে নারায়ণের হাতটা চেপে ধরলে সে। আর এক হাত দিয়ে চিবুক ধরে বলল, 'এবার কোথা যাবে আমার গোরাচাঁদ?' সুর করে বলল, 'আর তো তোমায় ছাড়ব না হে, কাঁটা হয়ে রইব পথে।'

মুহূর্তে যেন সোর পড়ে গেল। নারায়ণ এসেছে, নারাণ ঠাকুর বটঠাকুর। লাটঠাকুরের দাদা গো, সেই যে সায়েব মেরে জেলে গিয়েছিল। হ্যাঁ, নেকো হালদারের বড় ছেলে। পাঁচ বচ্ছর বাদে ফিরল। পাঁচ বচ্ছর না মুণ্ডু, দশ বচ্ছর বাদে। চোদ্দ বছর হে! রাম ফিরেছেন বনবাস থেকে। কিন্তু ফাঁসী হওয়ার কথা ছিল যে! পারেনি। পারেনি শালার সরকার। আহা দ্যাখ দ্যাখ গায়ে যেন সূর্যের ছটা বেরুচ্ছে।

হ্যাঁ, সূর্যেরই ছটা। তবু কৃশ হয়েছেন নারায়ণ অনেকখানি। মুখটা যেন আরও ফর্সা দেখাচ্ছে। যেন বাউলের চিকন মুখখানি। তার চোখ পড়ল সকলের দিকে। আশ্চর্য, কেউ ভোলেনি। সবাই যেন ফিরে পাওয়া আত্মজনের দিকে তাকিয়ে আছে। এগিয়ে আসছে কেউ কেউ। নারায়ণ তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সিঁড়ি নামতে গেলেন।

কুটে পাগলা জোর করে হাত চেপে ধরল, বলল, 'কোথা যাবি ঠাকুর? যাবি তো চারটে পয়সা দিয়ে যা। নইলে ছাড়ব না।'

ছাড়বে না। হেসে ফেললেন নারায়ণ। তেমনি আছে পাগলটা। বদলায়নি একটুও। পুরোনো হওয়ার অবসর দিলে না নারায়ণকে। যেন পুরোনো মানুষটিই দাঁড়িয়ে আছে ওর কাছে। তিনি পকেট থেকে পয়সা বের ক'রে দিলেন কুটের হাতে। তারপর নেমে এসে উঠলেন শ্রীমতী কাফেতে।

হীরেন আর কৃপাল কি কথায় ব্যস্ত ছিল। তারা চমকে উঠল নারায়ণকে দেখে। লাফিয়ে উঠল। হীরেন এসে জড়িয়ে ধরল নারায়ণকে! কৃপাল হাত চেপে ধরল। পরিচিত খদ্দেররা উঠে এল চেয়ার ছেড়ে কথা বলার জন্য। একদল লোক উঠে এল দোকানের উপর রাস্তা ছেড়ে।

চরণ অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের দরজার কাছে। দেরী হয়নি চিনতে তার। ওই চেহারার কথা সে অনেকবার শুনেছে, তার চেয়েও বেশী শুনেছে নামটা। একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল এ মানুষটির সম্পর্কে তার। প্রাণে বড় সাধ ছিল, এই মূর্তিটি সে একবার দেখবে। পায়ে হাত দিয়ে ধুলো নেবে। কিন্তু পারল না, দাঁড়িয়ে রইল। রূপ দেখতে লাগল সে। প্রাণ ভোলানো রূপ।

শুধু দেখছে না ভজন। বিকালের ঝোঁকেই নেশা করেছে সে। মাথা এলিয়ে দিয়ে প'ড়ে আছে টেবিলের উপর। জানতেও পারছে না কে এসেছে, ভাবতেও পারছে না।

নারায়ণের চোখ ভজনের উপর পড়ল। বুঝলেন, ভজন মাতাল হ'য়ে পড়ে আছে। নানারকমের খবর পেয়েছেন জেলে বসে ভজনের মদ খাওয়ার কথা। ভজন মাতাল। প্রখর বুদ্ধিতে আর সাহসে যার জুড়ি ছিল না এ তল্লাটে, সেই ভজন। কিন্তু কেন ও মাতাল হল। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল নারায়ণের। যন্ত্রণা করতে লাগল, অপরিসীম বেদনায় ভরে উঠল বুকটা। কেন, কেন এমন হল ভজনের! তাঁর বড় প্রিয়, বড় আদরের দুর্বিনীত ভজন।

তিনি ভজনের মাথার উপর একটি হাত রেখে ডাকলেন, 'ভজন..., ভজুরে।'

সবাই চুপচাপ। আরও লোক জমছে। পরিচিত পথচারীরা সবাই ঢুকছে। যেন শহর নয়, গাঁয়ের মুদিখানার মত ভিড় করছে সবাই। গাঁয়ের ছেলে এসেছে জেল থেকে। সবাই দেখছে। দেখছে দুই ভাইয়ের ব্যাপারটা। কেউ কেউ খানিকটা বা মত্ত ভজনের মাতলামি দেখবার জন্য উঁকি দিচ্ছে। কুলি দুটোর মাথা থেকে একজন বোঝাগুলো নামিয়ে দিল। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে ওরা।

নারায়ণ আবার ডাকলেন, 'ভজন...ভজু!'

ভজন টেবিলে মুখ ঘষতে ঘষতে মোটা জড়ানো গলায় ব'লে উঠল, 'ও মায়া ডাক অনেক শুনেছি বাবা। ওতে আর ভজুলাট ভুলছে না।'

দু'চারজন হেসে উঠল নিঃশব্দে। বাদবাকিরা ভ্রূ কোঁচকাল তাদের দিকে তাকিয়ে।

চরণের গলাটা যেন চুলকে উঠল। ইচ্ছে হল, চীৎকার ক'রে বাবুকে ডেকে সে উঠিয়ে দেয়।

নারায়ণ ভজনের মাথাটা ধরে ঝাঁকানি দিলেন। বললেন, 'ভজু, আমি এসেছি রে।'

ভজন তার রক্ত শিবনেত্র তুলে হেসে উঠল বলল,

'কে গো তুমি সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যামালতি
জ্বালতে এলে অন্ধ বুকে প্রেমের বাতি।'

আবার একটা চাপা হাসি দেখা গেল কয়েকটা মুখে। ভিড় বাড়ছে। ভিড় দেখে ভিড় করেছে অনেকে। জিজ্ঞেস করছে, কি হয়েছে? কিছু হয়নি, কিছু না। নারায়ণ ফি'রে এসেছেন।

নারায়ণ বললেন, 'আমি নারায়ণ, তোর দাদা।'

ভজনের চোখ এবার বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। সামনে ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। তাড়াতাড়ি দু'হাতে মুখ ঢেকে সে বলল, 'দাদা এসেছ? দাদা তুমি? আমার শ্রীমতী কাফেতে? কিন্তু, কিন্তু আমি যে মদ খেয়েছি।'

সেকথা শুনেও অনেকে হাসল। নারায়ণ হাত ধরলেন ভজনের। বুকের মধ্যে আড়ষ্ট ব্যথায় কথা আটকে গেল তাঁর ভজনের কথা শুনে, 'আমি যে মদ খেয়েছি।' কিন্তু কেন? কেন খেয়েছিস্?

ভজন আবার বলল, 'দাদা তুমি সত্যি এসেছ? আর আমি, আমি যে মাতাল হ'য়ে পড়েছি।'

ভজনের মুখটা আরো লাল হ'য়ে উঠল। লাল হ'য়ে উঠল নারায়ণের মুখও। দু'জনেই চুপচাপ। দু'জনেরই গলার কাছে কি যেন ঠেলে আসছে, কথা বেরুচ্ছে না। অনেকদিন অনেক বছর বাদে তারা দুই ভাই বাইরে মিলেছে। জেলখানার বাইরে, খোলা আকাশের তলায়, বহু লোকের মাঝে। ভাইয়ের চেয়েও বড়, তারা দুই বন্ধু। কিন্তু, তাদের আর কথা সরছে না মুখ থেকে। তারা পরস্পরে যেন কি হারিয়েছে, সেই ব্যথায় তারা নিশ্চুপ।

সংবাদ এর মধ্যেই রটে গিয়েছে নারায়ণ এসেছেন। প্রিয়নাথ এসেছে। রথীন এসেছে। এসেছে আরও ছেলেরা।

এমন সময় এল ছোকরা পুলিশ অফিসার। তার একটু দেরী হয়েছে। সে এসেছিল নারায়ণকে ষ্টেশনে রিসিভ্ করতে। এখানে রিসিভ অর্থে নিজের পরিচয় দান। পুনরুক্তি করতে আসছিল নারায়ণের উপর সরকারের বিধিনিষেধের ফিরিস্তি। যে বিধিনিষেধের অর্ডার পড়ে নারায়ণ সই করে এসেছেন জেল থেকে। কিন্তু শ্রীমতী কাফেতে এত ভিড় দেখে চমকে উঠল সে। এত ভিড় কেন? লোকটা জেল থেকে এসেই সভা করতে আরম্ভ করল নাকি? কিন্তু বক্তৃতা করতে নিষেধ আছে যে।

অফিসার এসে দাঁড়াতেই জনতার চোখ মুখের ভাব পাল্টে গেল। অনেকে সরে পড়তে লাগল এদিকে ওদিকে। যাকে বলে কেটে পড়তে লাগল। মাঝখান দিয়ে দু'ভাগ করে ভেতরে যাওয়ার জায়গা করে দিল অফিসারকে।

অফিসার ভেতরে ঢুকে টুপিটা খুলল। চিনতে ভুল হল না নারায়ণকে। বলল, 'আপনার কোন সভা সমিতি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।'

নারায়ণ অবাক হলেন এবং সেইসঙ্গে সকলেই। সভা কোথায় হচ্ছে? নারায়ণ বললেন, 'সভা কোথায় দেখলেন? আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করছি।'

ও! অফিসার খানিকটা বিমূঢ় ও বিস্মিত চোখে ভিড়ের দিকে ফিরে তাকাল। আশ্চর্য! এরা সব দেখা করতে এসেছে। এত লোক, এই পথচারী, দোকানী, গাড়োয়ানগুলো।

ভজন হঠাৎ তার মেজাজে ফিরে গেল। বলল, 'মশাইয়ের এটা সভাস্থল বলে মনে হ'ল! বেশ, সভাস্থলই হয়ে উঠুক তবে এটা। চা-পানের সভা। উঠে এস সব, চলে এস ভেতরে। চলে এস।'

ব'লেই হাঁক দিল, 'চরণ, সবাইকে চা দে। কেউ যেন ফিরে না যায়। চলে এস সব।'

অনেকেই ভেতরে ঢুকে এল, কেউ কেউ চলে গেল ভয়ে। কিন্তু বেশীর ভাগই ভেতরে ঢুকে এল। ভেতরে যাদের জায়গা হল না, বারান্দায় রইল তারা।

অফিসার হাসতে চেষ্টা করল। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি অন্য কথা ভেবেছিলুম। আচ্ছা, চলি নারায়ণবাবু। আপনি তা'হলে রোববার দিন আসছেন থানায়।' ব'লে নমস্কারের একটা ভঙ্গি ক'রে বেরিয়ে গেল সে। জ্বালা ধরে গিয়েছে তার বুকটার মধ্যে। মনে হ'ল সমস্ত লোকগুলো এক একটা পয়লা নম্বরের শয়তান। সব শয়তানগুলো হাসছে মনে মনে। কিন্তু চিরদিন এরকম যাবে না। বিশেষ ওই মাতাল ভজুলাটের কথাগুলো যেন সাপের ছোবলানি। ওকে কি একদিনও হাতে পাওয়া যাবে না!

এবার প্রণামের পালা। প্রথমে রথীন তারপর সুনির্মল। তার হাতের ঘা শুকিয়ে গিয়েছে। প্রণাম করছে আরও অন্যান্য ছেলেরা। নারায়ণ সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন। কোলাকুলি

করলেন আবেগ ভরে প্রিয়নাথের সঙ্গে, লজ্জায় আর আনন্দে অভিভূত হ'য়ে উঠেছেন নারায়ণ। তবু বুকের মধ্যে অস্বস্তি। কেন যেন টন্‌টন্‌ ক'রে উঠছে বারবার। ভজনের জন্য ভয় পেয়েছেন তিনি।

চরণ এসে প্রণাম করল। নারায়ণ বললেন, 'দেখ্‌ছি, দোকানেই সবাই দেখা করবে।' চরণকে টেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি কে ভাই?'

সারা গায়ের মধ্যে শিউরে উঠল চরণের। 'তুমি কে ভাই' শুনে যেন ঘুম ঘোরে কেঁদে ওঠার মত কান্না পেল চরণের। এমন কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না তার হৃদয়। এমন প্রাণঢালা কথা, এত বড় লোকের মুখ থেকে। ছেলেমানুষের মত ঠোঁট কেঁপে গেল। বলল, 'চরণ!'

'চরণ।' বলল ভজন, 'শ্রীমতী কাফের হেড্‌ বাবুর্চি।'

ভয়ে উৎকণ্ঠায় থম্‌কে গেল চরণ। হেড্‌ বাবুর্চি শুনে হয় তো স্পর্শ ও গলার স্বর বদলে যাবে নারায়ণের। কিন্তু না। বরং নারায়ণ চরণকে আর একটু আকর্ষণ করলেন। হেসে বললেন, 'হেড বাবুর্চি বুঝি? কিন্তু তার চেয়ে চরণ অনেক ভাল। কি বল চরণ?'

না, রোধ করা গেল না চোখের জল। চরণ তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচল। কেঁদে বাঁচল রান্নাঘরে গিয়ে। আমি চরণ, চরণ বাবুর্চি। আমার সয় না এত ভালবাসা, ভালবাসার কথা।

তারপর এর একথা, তার সেকথা। চেনা মানুষদের সব নানান প্রশ্ন, কুশল জিজ্ঞাসা।

ভুনু গাড়োয়ান, সারথী দূরে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে লারাইন ঠাকুরকে। দিল্‌ বল্‌ছে হাঁ, এ যেন দেবতাই। সবাইকে প্রণাম ও নমস্কার করতে দেখে, সেও দূরে দাঁড়িয়েই কপালে হাত ঠুকছে! একে তাড়ি গিলেছে, তায় গাড়োয়ান। ইয়ে বাবু তো আর লাটবাবু নয়। সামনে যেতে তাই তার বড় সঙ্কোচ ও ভয়।

বাঙ্গালী আসেনি এখনো, নইলে চেঁচামেচি খানিকটা বেশী হত। তারপর শুরু হয় নারায়ণের শ্রীমতী কাফে দেখার পালা। নারায়ণের মনে হল সে নিজে সাজিয়েছে। এমনই মনের মত হয়েছে তার। শুধু মনটা খারাপ হয়ে গেল তার ঘড়ির পেন্ডুলামে কঙ্কালের খুলির ছবিটা দেখে। ওটা ভাল নয়। সুন্দর নয়। কে একজন তারস্বরে শোনাচ্ছে নারাণকে বিশের মৃত্যুকাহিনী।

সূর্য অস্ত গিয়েছে। শীতের সন্ধ্যা এসে পড়েছে কোন্‌ ফাঁকে। বাতিওয়ালা বাতি জ্বালাতে আরম্ভ করেছে। আর দেরী করা যায় না। বাড়ী থেকে সংবাদ এসেছে, নারায়ণ যেন আর দেরী না করেন। নারায়ণ বাড়ী চললেন। সেখানেও দেখা করার পালা, অস্বস্তি শুধু বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো।

অনেক রাত। ভজন বাড়ী এল। নারায়ণ ঘুমোননি। তিনি অপেক্ষা করছিলেন ভজনের জন্যই। তাকে ডেকে তিনি নিজের ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ডাকলেন, 'ভজন!'

'বল।'

'তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা না বললে, আমার ভাল লাগছে না ভাই। বোস্‌।'

ভজন আবার বলল, 'বল'। বলে সে বসল।

নারায়ণ বারকয়েক ইতস্তত করলেন। দেখলেন, ভজন যেন তাঁর চেয়েও বুড়িয়ে গিয়েছে। বার্ধক্যের রেখা পড়েছে তার মুখে। বললেন, 'হ্যাঁ রে, তোর কয়েকটি ছেলে হয়েছে, তবু জিজ্ঞেস করছি, বউকে কি তোর পছন্দ হয়নি?'

ভজনের মুখ লাল হ'য়ে উঠল। লজ্জায় নয়, বেদনায়। বুঝল, দাদা শান্তি পাচ্ছে না। বলল,

'ওর চেয়ে ভাল মেয়ে তুমি আর কোথায় পাবে এ দেশে? বরং আমি ওর মর্যাদা দিতে পারিনি।'

নারায়ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ভজনের মুখের দিকে। না, মিথ্যে নয়, এ অকপট স্বীকারোক্তি। তবে এমন হল কেন? বললেন, 'বাবার জন্য কিংতোর এ সংসার ভাল লাগে না?'

ভজনের মুখটা যেন আরও দুমড়ে যেতে লাগল। কথা ফুটতে চায় না তার গলায়। বলল, 'মাঝে মাঝে ভারী রাগ হয় বাবার 'পরে। কিন্তু দাদা, বাবার জন্য আমার ভারী কষ্ট হয়। ওই ভাবে বসে থাকতে দেখে আমার ভারী মায়া হয়। মনে হয়, ছেলেমানুষ যেন

এবার দুজনেই চুপচাপ। খানিকক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। দুজনেই বোধহয় বাবার কথাটা মনে মনে একবার ভেবে দেখল। তারপরে নারায়ণ আবার বললেন, 'বকুল মার 'পরে কি তোর রাগ হয়েছে?'

ভজন হাসতে চাইল। কত কি ভাবছেন দাদা তার সম্পর্কে। 'না তো। রাগ কেন হবে?'

'তবে বুঝি তোর আমার 'পরে রাগ হয়েছে?' গলার স্বর চেপে এল নারায়ণের।

চমকে উঠল ভজন। 'কেন দাদা?'

'আমি তোর জন্যে, বউমা আর ছেলেদের জন্য কিছুই করতে পারিনে।'

'তুমি তো দেশের কাজ কর। তোমার আলাদা কাজ রয়েছে। তার জন্যে আমি রাগ করব?' ভজনের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। 'ছি ছি, আমার সে কথা কোনদিন মনে হয়নি।'

নারায়ণ হাত ধরলেন ভজনের। সন্ত্রাসবাদীর ভয়ঙ্কর চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। 'তবে ভাই এমন কেন হল?'

ভজন ঢোঁক গিলছে। কিসে যেন আটকে যাচ্ছে কথা গলার মধ্যে। তবু জোর করে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'জানিনে আমি, জানিনে দাদা কেন এমন হল। আমি আমার নিজেকে বুঝতে পারিনি তোমাকে কি বলব। বিশ্বাস কর, আমি বোধ হয় শেষ হয়ে গেছি, কত কি ভেবেছি জীবনে, তাকিয়ে দেখি শেষটায় বদ্ধ মাতাল হয়েছি।'

গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল ভজনের। তবু বলল, 'আমাকে আর কিছু ব'লো না দাদা।'

কিন্তু নারায়ণ না বলে পারলেন না, 'ভজন, তুই আমার চেয়ে বেশী লেখাপড়া করেছিস্‌। তুই পাশ করেছিস্‌। আমার দ্বারা তাও হয়নি।'

অসহ্য যন্ত্রণায় ভজন ধিক্কার দিয়ে উঠল নিজেকে, 'ছি ছি ছি, ওকথা আর ব'লো না দাদা। আমি লেখাপড়া জানি, সেকথাটাও আমি ভুলে গেছি। দাদা, আমার ক'টি ছেলে রয়েছে। নিজের কথা ভাবলে আমার ভয় করে, তাই আমি ভাবিনে। দাদা, বাঙ্গালী আর ভুনু গাড়োয়ানের সঙ্গে বসে আমি মদ খাই। দুটো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলিনে। আমার মান অপমান জ্ঞানও নেই। দাদা, আমি হার মেনেছি।'

'কার কাছে?'

'সকলের, সবকিছুর কাছে। ভগবানের দোষ দিইনে, আমি আমার পথ চিনিনি। ব্যবসা করি কিন্তু বুঝি, সেখানেও আমার হার। আমি সকলের ভার, সকলের বোঝা।'

'চুপ কর, ভজন, অমন ক'রে বলিস্‌নে।' ভজনকে থামিয়ে দিয়ে নারায়ণ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

ভজন বসে রইল মাথা নীচু ক'রে। অস্থির হ'য়ে উঠেছে তার প্রাণ। এমন সব কথার

মুখোমুখি কোনদিন দাঁড়াবার কথা ভাবেনি সে। ভাববার অবসর হয়নি। ভাবনা এলে এড়িয়ে গিয়েছে।

নারায়ণ বললেন, 'ভজন, নিজের উপর ভাই এমন ক'রে বিশ্বাস হারালে চলবে না। আমি বুঝতে পারিনে সব, কেন এমনটা হয়। কিন্তু মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারলে সব গণ্ডগোল হ'য়ে যাবে। তোর উপর যে অনেক দায়িত্ব এসে পড়েছে, সেকথা ভুললে চলবে না।'

এমন সময় বাইরে থেকে শিশুর কান্না শোনা যেতেই নারায়ণ চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, 'যা ভজু, বউমা তোর জন্যে বোধ হয় ব'সে আছেন। খেয়ে নে, গে।'

ভজন বেরিয়ে গেল। দরজা খুলে বাইরে এসে চমকে গেল। দেখল দূরে, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুঁই। রাত্রে আধক্ষয়া চাঁদ উঠেছে। ঝাপসা আলোয় দেখল, যুঁইয়ের গালে চক্‌চক্ করছে জল। হয় তো সবকথা শুনেছে সে।

কেবল নারায়ণ বসে রইলেন। গালে হাত দিয়ে ভাবছিলেন ভজনের কথাগুলো।

সকালে নারায়ণ বসেছিলেন নিজের ঘরে। কিছুক্ষণ আগে ভজনের দুই ছেলে গৌর, নিতাই তাঁর সঙ্গে ভাব ক'রে গিয়েছে। নারায়ণ ভাবছিলেন হালদারমশাইয়ের কাছে গিয়ে বসবেন। গতকাল রাত্রে বকুল মা এসেছিলেন, আবার হয় তো আসবেন এখুনি। আসবে হয় তো আরও অনেকে। প্রতিবেশী গুরুজনেরা, ছেলেরা। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক'রে একটা কথা তাঁর মনে পড়ছিল। ভাবছিলেন, নিজের অন্নসংস্থানের কথা। এভাবে ভজনের উপর তিনি কতদিন থাকবেন। অবশ্য একথা ঠিক, নারায়ণের ভাবনা নেই। তাঁকে আহার ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য অনেকেই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু এখানে থেকে তো তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, নিজের কাজও তাঁর এখানে থেকে বেশী দিন চলবে না।

এমন সময় একটি ছেলে এসে তাঁকে প্রণাম করল। বছর বারো বয়স ছেলেটির। মুখখানি যেন চেনা চেনা, তবু মনে করতে পারলেন না কিছুতেই কার ছেলে, কোথায় দেখেছেন। এই টানা টানা ভ্রূ আর চোখ, টিকালো নাক আর উজ্জ্বল শ্যাম রং, এমনি মুখের ছাঁচ যেন খুবই চেনা। জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম কি তোমার?'

'শ্রীনবীন ভট্টাচার্য।' বলতে বলতে ছেলেটির নজর চলে গেল দরজার দিকে।

তাকে কাছে টেনে নিলেন নারায়ণ। নবীন বিস্মিত চোখে নারায়ণের দিকে তাকাল।

নারায়ণ বললেন, 'তোমার বাড়ী কোথায়?'

'রানাঘাট।'

'এখানে কোথায় এসেছ?'

'মামার বাড়ী।'

'কোথায় মামার বাড়ী?'

'গঙ্গার ধারে।'

একেবারেই চিনতে পারলেন না নারায়ণ। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবার নাম কি?'

'শ্রীননীমাধব ভট্টাচার্য।' বলতে বলতে নারায়ণের দিকে তাকানো তার বড় বড় চোখের মণি দুটো আবার ঘুরে গেল দরজার দিকে।

নারায়ণও সেদিকে তাকালেন। দেখলেন, খয়েরী রং চেক শাড়ী উঁকি দিয়ে আছে সেখানে।

মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি আবার তাকালেন ছেলেটির দিকে। ভয় যেন অনেকখানি কেটেছে। খানিকটা তন্ময়তা এসে গিয়েছে কিশোর নবীনের চোখে। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, এ মানুষটি তার সেই মানুষটি কিনা। হঠাৎ বলল, 'আমার মা এসেছে।'

'তোমার মা!'

বলতেই খয়েরী শাড়ী ঘরে ঢুকে এল। এসে প্রণাম করল নারায়ণকে। নারায়ণ শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, 'আহা, কি করেন। বসুন।'

নবীনের মা বসল। বসে বলল মাথা নীচু ক'রে, 'আমার নাম প্রমীলা। বাবার নাম, শ্রীনকুলেশ্বর পাঠক।'

বুঝেছেন, বুঝেছেন নারায়ণ। আর বলতে হবে না। সেই পাঠক বাড়ীর মেয়ে, মেয়ে নয় সেই বালিকা। বুকের মধ্যে ধ্বক্ ক'রে উঠল বিপ্লবী নারায়ণের। তাই তাঁর মনে হচ্ছিল নবীনকে দেখে, এ মুখ যেন চেনা। নবীন কিশোর, সে ছিল কিশোরী কিন্তু একটি-ই মুখ যেন।

দেখলেন, বয়সের ভার ও গম্ভীর হয়েছে প্রমীলার মুখ। একহারা মেয়ে দোহারা হয়েছে। মাথায় ঘোমটা নেই। চুলের গোছা আছে তেমনি। ঘাড় আর পেছন জুড়ে খোঁপা একটু এলোমেলো। গায়ের রং যেন আরও ফর্সা হয়েছে।

একটা মুহূর্ত সব যেন কেমন এলোমেলো হ'য়ে গেল নারায়ণের। নানান্ কথা মনে পড়ছে। সব বাজে কথা। সেই কথা, একদিন বিয়ে বসতে চেয়েছিল এই মেয়ে নেকো হালদারের বড় ছেলের সঙ্গে। হাসির কথা। কি হাসির কথা বলতেন ঠাক্‌মা, নাত্‌নি আমার শিব গড়ে যেন হালদারের বড় ব্যাটা। তার চেয়েও হাসির কথা, নারায়ণের প্রায় কৈশোরোত্তর বয়সের সেই গোপন উন্মাদনা। নাম না জানা বিচিত্র অনুভূতি। অনুভূতি নয়, পাগলামি। পাগল না হ'লে গঙ্গাধারের পাড়ায় কেন বারবার ছুটে ছুটে যেতে হত। শুধুই পাগলামি। আর সেই পাগলামি আজও বুকের মধ্যে কি এক কাঁটার মত যেন খচ্‌খচিয়ে উঠছে। নিশ্বাস জমে জমে ভার হ'য়ে আসছে বুক! বুকের মধ্যে ঢাকাঢুকি দেওয়া একটা মুখ, একটা অন্ধকার আচ্ছন্ন মুখের ঢাকনা কে যেন হুস করে উড়িয়ে দিল। সাধ নেই, ইচ্ছাও নেই, অথচ মেঘের মত আপনা আপনি কি যেন জমে উঠেছে থরেথরে, বুকের মাঝে। এই মাটির সংসারে বোধ করি তার কোন বাস্তব রূপ নেই। থাকতেও পারে না। বুঝি জানাজানি নেই সেই গোপন অন্ধকার মুখটির সঙ্গে মানুষটির।

কারুর মুখেই কথা নেই। আর একজনও চুপচাপ। তাকে দেখে মনে হয়, সে ঘরানা ঘরের বউ। তার দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই। নবীনের মত তার ছেলে আছে। নিশ্চয় আছে উপযুক্ত স্বামী। বোধ হয় লজ্জা করছে। হাসি ও সঙ্কোচে ভরা মুখ। তুলি তুলি ক'রেও তোলা যাচ্ছে না। তারপরে হঠাৎ বলে ফেলল, 'ঠাক্‌মা মরে গেছে।'

ব'লে ফেলেই মুখটা নামিয়ে নিল প্রমীলা। ঠাক্‌মার কথা বলতে গিয়ে চোখে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠেছে।

আশ্চর্য, প্রথমেই ঠাক্‌মার কথা কেন। তা' ছাড়া আর কে আছে। কে ছিল আর সেদিন তাদের মাঝখানে। ঠাক্‌মা যেন তাদের কৈশোরের দূতী। রাধার সঙ্গিনী বড়ায়ির মত।

নারায়ণ বললেন আহত গলায়, 'কতদিন আগে?'

'আজ তিন বছর।' চোখের জল মুছল প্রমীলা।

নারায়ণ নিশ্চুপ। প্রমীলা আবার বলল, 'আপনার কথা খালি বলত।'

আবার জল এসে পড়ল চোখে। কত যে কথা ঠাক্‌মার। সেসব কথা মনে মনে করলে কান্না রোধ করা যায় না। সে কান্না হলই-বা প্রমীলার পক্ষে লজ্জার। কোন পাপ তো সে করেনি। ঠাক্‌মা কতদিন অকারণ তাকে এই মানুষটির কথা বলেছে, ঠাক্‌মাও যেন কেমন একরকম ক'রে ভালবেসেছিল এই মানুষটিকে। কেমন একরকম ক'রে তারও মনের মাঝে এ মানুষটি রইতে বসতে রয়ে গিয়েছে। কোথায়, তা জানে না। বিবাহিত জীবনে মনে হয়েছে পাপ, কিন্তু কোথায় রয়েছে সে পাপ না জানলে কেমন ক'রে তাড়াবে। এই যে চোখের জল, সে কোথায় আছে কে জানে। তবু সে সময় হ'লে না এসে পারে না। কে কাকে তাড়াবে।

থাক। কি হবে সেসব কথা ব'লে। নারায়ণ নড়েচড়ে বসলেন। নেহাত কথার কথা, 'কবে এসেছ শ্বশুরবাড়ী থেকে?'

'একমাস। চলে যাবার কথা ছিল, যাইনি। বোধ হয় আপনাকে দেখব ব'লেই যাওয়া হয়নি।'

নারায়ণ হা হা করে হেসে উঠলেন এতক্ষণে। কিন্তু গুমোট কাটল না তাতে।

প্রমীলা আবার বলল, 'হাসি নয়। নারায়ণদা, আপনার জন্যে বড় ভাবনা ছিল।'

নারায়ণ আবার হেসে উঠতে চাইলেন। প্রমীলা কি অদ্ভুত ছেলেমানুষ। যেন কোন পার্থক্য নেই ওর সঙ্গে ওর ছেলেটার।

প্রমীলা কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বলে গেল তার নিজের কথা, 'এ সংসারে সবাই উল্টোটা ভাবে। তাই কোনদিন কাউকে মনের ভাবনার কথা বলতেও পারিনি। কিন্তু নারায়ণদা, আপনি তো উল্টো বুঝবেন না। দিন রাত লুকিয়ে লুকিয়ে ভগবানকে ডেকেছি। দিন রাত।'

কেন ডেকেছে সেকথা বলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নারায়ণের বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে এল। তাঁর কঠিন অটল প্রাণ এই মেয়েটির কাছ থেকে এসব কথা শোনার জন্য এক মুহূর্ত আগেও প্রস্তুত ছিল না। আচমকা তাঁর হৃদয়ের গোপন ক্ষতটা যেন কে সকলের সামনে খুলে দেবার মতলব করেছে। কিন্তু কি যে বলবেন, সে কথাটা পর্যন্ত মুখে যোগাল না।

প্রমীলা তার জলভরা চোখ দুটো এবার তুলে ধরল নারায়ণের দিকে। বলল, 'জেলে তো শুনেছি ওরা খুবই অত্যাচার করে।'

নারায়ণ নবীনের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তা করে। প্রথম দিকে করেছিল, শেষের দিকে হাল ছেড়ে দিয়েছিল।'

একটু হেসে আবার বললেন, 'ওরা শুধু অত্যাচারই করে। মানুষকে তো দেখেছ, যে যত দুর্বল হয়, তত তার অত্যাচার বাড়ে, আমাদের মাথাও তত উঁচু হয়। প্রমীলা, একটা কথা বলি। কেবলি দুশ্চিন্তা ক'রে ভগবানকে ডেকে ডেকে তাঁকে বিব্রত ক'রো না। আমার সুখের জন্য বারবার তাঁকে বললে তিনি বিমুখ হবেন। ব'লো, এ জীবনে যেন হার মানতে না হয়। যদি হার মানি, তবে একশো বছরের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকাও যে অভিশাপ।'

প্রমীলা বলল অসহায়ের মত, 'এত কথা যে বুঝি না। কিন্তু, আপনি হার মানবেন, একথা ভগবান এসে বললেও আমি মানতে পারব না। তা' হলে যে সবই যাবে।'

একথা শুনে নারায়ণের বন্ধ প্রাণটার দরজা যেন খুলে গেল। বললেন, 'সত্যি, তা' হলে সবই যাবে। কিন্তু হার মানব না আমরা। তোমরা দিনরাত কামনা করছ, সে কি কখনো ব্যর্থ হয়?'

কি কথা বলতে গিয়ে প্রমীলা চুপ ক'রে রইল। শুধু দেখল, নারাণদার সারা মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, কিসের স্বপ্নে যেন তলিয়ে গিয়েছেন।

এবার নবীন সুযোগ বুঝে বলল, 'মা, বলি?'

প্রমীলা একটু হেসে সম্মতি দিল। নবীন ডাকল, 'মামাবাবু।'

নারায়ণ হেসে বললেন, 'বল বাবু।'

'আপনি সায়েব মেরেছেন?'

'মারলে কি তুমি খুশী হও?'

নবীন গম্ভীর গলায় বলল, 'হই, সায়েবগুলো সব মরে গেলে আরো খুশী হই।'

'কেন বল তো?'

'ওরাই তো আমাদের দেশটাকে পরাধীন ক'রে রেখেছে।'

নারায়ণ তবু বললেন, 'কি ক'রে বুঝলে?'

একটু বিব্রত হল নবীন, বলল, 'ওরা কেন আছে আমাদের দেশে? আমাদের দেশে ওরা কেন রাজা হবে? মামাবাবু, আমি আপনার সঙ্গে থাকব।'

'সত্যি?' নারায়ণ একবার প্রমীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মা কেন থাকতে দেবেন?'

'মা-ই তো বলেছে। আপনার মত হ'তে পারলে, মার মনেও দুঃখ থাকবে না।'

নারায়ণ হেসে উঠলেন। জড়িয়ে ধরলেন নবীনকে কোলের কাছে।

প্রমীলা বলল, 'ওকে আপনি আশীর্বাদ করুন নারায়ণদা। আপনাকে একটিবার দেখার জন্য ও পাগল হ'য়ে উঠেছিল। এমনি পাগল ছেলে যে, এখান সেখান থেকে ঘুরে এসে বলে, নারাণমামাকে দেখে এলুম। অথচ আপনাকে কোনদিন ও চোখেও দেখেনি।'

তারপর হাত বাড়িয়ে প্রণাম ক'রে বলল, 'নারাণদা, আমি আপনার কেউ নই, তবু কালে ক্বচিৎ একটা চিঠি দিয়েও যদি জানান কেমন থাকেন, তবে বেঁচে যাই।'

নারায়ণের পক্ষে কথা দেওয়া সম্ভব নয়। বললেন, 'সম্ভব হ'লেই দেব প্রমীলা।'

নবীনও প্রণাম ক'রে উঠল। যেতে গিয়েও আবার দাঁড়াল প্রমীলা। বলল, 'একটা কথা বলে যাই। নারাণদা, আমার টাকা পয়সা সোনার অভাব নেই, আমার স্বামীও আর দশজনের মত ভাল মানুষ। তবু একবার যদি আপনি আমার ঘরে পায়ের ধুলো না দেন, তা'হলে মরেও আমার কোন অভাব ঘুচবে না। যাবেন তো?'

নারায়ণের মুখে কথা ফুটতে চায় না। প্রমীলার পক্ষে এ দাবী কতখানি শোভন, সে ভাবনার চেয়েও বড় ভাবনা, কেমন ক'রে নারায়ণ কথা দেবেন। হয় তো আজ বাদে কাল তাঁর জীবনে নতুন কোন অভিশাপ নেমে আসবে, হয় তো আচমকা নেমে আসবে মৃত্যু, কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারলে সে যে নিজের জীবনেও আক্ষেপ থেকে যাবে। আবার মনে হল, এ ডাকে সাড়া দিয়ে একবার না গেলে এ জীবনের অনেকটাই যেন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে ব্যর্থতার কথা মুখ ফুটে কাউকে বলার নয়। বলা যাবে না কোনদিন। আজকে প্রমীলা না এলে কথা ছিল না। কিন্তু আজকের পর, 'যাব, না,' বলার মত নিষ্ঠুরতা তিনি কেমন করে করবেন।

নারায়ণ বললেন, 'যাব, সময় এলে একদিন নিশ্চয় যাব।'

'সে সময়টি যেন আমার মরণের আগে হয় নারায়ণদা।' ব'লে প্রমীলা নবীনের হাত ধরে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যেতে গিয়ে সব ঝাপসা হ'য়ে গেল চোখের সামনে।

উঠানের উপর পথরোধ করে দাঁড়াল যুঁই। মা ও ছেলের হাত ধরে বলল, 'খোকাকে না

খাইয়ে নিয়ে যেতে পারবে না দিদি।' ব'লে সে দুজনকে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল। কেন জানি না, তারও দুই চোখের কোল ছাপিয়ে জল এসে পড়ছে। একই নোনা স্বাদের সমুদ্রের অতলে ডুবে গেল তাদের দুজনেরই হৃদয়। এই চোখের জলের বেদনার সমান একটা লজ্জা ও সঙ্কোচ ছিল কিন্তু তাকে ঢেকে রাখবার অবকাশ ছিল না কারুরই। আর শিশু নবীন খেতে খেতে এই দুটি নারীকে কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গেই দেখছিল।

তারপর তাদের চোখের জল খানিকটা প্রশমিত হ'লে, প্রথমে প্রমীলার মুখেই রক্ত ফুটে উঠল। যুঁইয়ের চোখের দৃষ্টি যেন তার মনের শেষ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। তাড়াতাড়ি নিজের অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে প্রমীলা বলল, 'ভাই বউদি, তোর সঙ্গে একটা বড় বিবাদ আছে।'

যুঁই বলল হেসে, 'বেঁচে যাই ভাই ঠাকুরঝি। সত্যি, একটু ঝগড়া ক'রে যাও।'

প্রমীলা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা ক'রে বলল, 'ঠাট্টা নয়। যা শুনছি, এভাবে চললে কতদিন এ সংসার টিকে থাকবে। ভজুদার হাল কি তুই একেবারে ছেড়ে দিইছিস?'

যুঁই তবুও হেসে বলল, 'আমি হালদারণী, হাল ছাড়লে কি আমার চলে? কিন্তু ভাই ঠাকুরঝি, হালে যে পানি পাইনে!'

বলতে বলতে তার গলার স্বর করুণ হ'য়ে উঠল। প্রমীলা এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে বলল, 'জানি ভাই বউদি, তবু এতবড় সংসার, দেখে বড় ভয় হয়। ওই শ্রীমতী কাফে না কি, সেটুকু তো সম্বল। তাও আর দশজনের সঙ্গে ভজুদা, ওটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এ বিশ্বের পুরুষ মানুষেরা কি নিয়ে মেতে আছে জানিনে, কিন্তু এ অন্ধকার ঘরের কোণ থেকে ওরা আমাদের কোথায় ভাসাচ্ছে, সে সংবাদটুকুও তো জানাবে?'

'না, জানাবে না।' যুঁইয়ের গলার স্বর তীব্র হয়ে উঠল। বলল, 'শুনি দেশোদ্ধারের জন্য সবাই মেতে উঠেছে। ভাবি, আমাদের উদ্ধারের জন্য আমরা কবে দাঁড়াব।'

প্রমীলা বিস্মিত চমকে যুঁইয়ের মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'বউদি ভজুদা'কে কি তুই'—

যুঁই তাড়াতাড়ি বলল, 'উল্টো বুঝো না ভাই ঠাকুরঝি। চাপা পড়া বুকে তুমি নাড়া দিলে, তাই বললুম। সব দিয়েও যদি শুধু ওই তোমাদের ভজুদা'র মনটি পেতুম, তবে বাঁচতুম। কিন্তু আমি তারও দোষ দিইনে। নিজের মন নিয়ে সে হাঁসফাঁস করছে, আমি আর বোঝা বাড়াব না।'

'কিসের হাঁসফাঁস বউদি?'

'তা জানিনে।'

দুইজনেই তারা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ যুঁই বলল, 'সবখানেই এমনি ওলটপালট ঠাকুরঝি, দোষীকে খুঁজে পাইনে। নইলে বল'—

তাকে থামতে দেখে প্রমীলা বলল, 'থাম্‌লি যে?'

যুঁই বলল, 'নইলে বল, আজ তুমি এই বাড়ীতে এমনি ক'রে এসে ঘুরে যাবে কেন? ওই ঘর থেকে'—

'চুপ, চুপ, চুপ কর্ বউদি।' ভয়ে লজ্জায় একেবারে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল প্রমীলা। চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, 'এসব তুই কি বলছিস্ বউদি? ওকথা আমার শুনতে নেই।' তার চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়ল। জল এসেছে যুঁইয়ের চোখেও। মনে মনে বলল, 'ভাবতে নেই কেন। সত্যকে ডুবিয়ে প্রাণ পোড়ানোর জন্য বেঁচে থাকা কেন, কিসের জন্য!'

কয়েক দিনের মধ্যে নারায়ণও শ্রীমতী কাফের প্রাত্যহিক শরিক হ'য়ে উঠলেন। অবশ্যই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত। যতক্ষণ তাঁর সরকারী অনুমতি আছে। তাঁকে কেন্দ্র করে শ্রীমতী কাফের আসরের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রিয়নাথের সঙ্গে কৃপালদের যে বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছিল কিছুদিন থেকে, সেটা একটা চরম আকার ধারণ করল। প্রায় প্রত্যহই একই তর্কের অবতারণা হয়। এমনকি দু' চারজন প্রবীণ কংগ্রেসী কর্মীরাও যাতায়াত আরম্ভ করলেন নারায়ণের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কেননা, নারায়ণ বয়সে তাদের চেয়ে নবীন হ'লেও কাজের বেলায় প্রবীণ। এ অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলনের গোড়াপত্তন নারায়ণের দ্বারাই হয়েছে বলা চলে। অথচ, নারায়ণ পথ পরিবর্তন ক'রে আজকে এমন একটা মোড় নিয়েছে, যে আদর্শকে গ্রহণ করেছে, তা প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর পথের ও মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রিয়নাথকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু নারায়ণও সেই আদর্শেই বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। দেশবন্ধু যেভাবে শ্রমিকদের কথা বলতে চেয়েছিলেন, তার মূলে ছিল একটা স্বাভাবিক উদারতাবাদ। অর্থাৎ শ্রমিক মঙ্গলের জন্য মালিকদের বলা। কিন্তু প্রিয়নাথের বক্তব্য অনুযায়ী শ্রমিক বিপ্লবটা শুধু অহিংস নয়, অনেকের কাছে ব্যাপারটা কিছু দুর্বোধ্য ও ভয়ঙ্কর।

কিন্তু এখানে একটা কথা ব'লে নেওয়া দরকার। প্রিয়নাথের সঙ্গেও নারায়ণের বিরোধ দেখা দিয়েছে। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে সন্ত্রাসবাদ কিসে অন্তরায় সেইটার বোঝাপড়া নিয়ে তাদের মধ্যে গণ্ডগোল। অথচ প্রিয়নাথ সশস্ত্র বিদ্রোহকে অস্বীকার করতে চায় না। কিন্তু ওদের এ বিরোধটা প্রকাশ্য ছিল না। আলোচনা তাদের নিজেদের কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আজকে সকালবেলা এ ব্যাপারটাও চরমে দাঁড়াল। নারায়ণ, প্রিয়নাথ, রথীন আর সুনির্মল পেছনের ঘরে তাদের বৈঠক বসিয়েছে। চরণকে নিয়ে ভজন গিয়েছে বাজারে।

হীরেন বসে আছে বাইরে। সে জানে পেছনের ঘরে বৈঠক বসিয়েছেন নারায়ণ। একদিন নারায়ণকে কেন্দ্র ক'রেই সে দেশোদ্ধারের নেশায় পাগল হয়েছিল। সেদিন নারায়ণের কথায় প্রাণ দেওয়া কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ, মতাদর্শের বিরোধে সে সম্পর্ক শুধু স্তিমিত হয়নি, তাদের আলোচনায় যোগদানের অধিকারও তার নেই। সেজন্য তার প্রাণে একটা বেদনা ছিল। তার মত কৃপালও একদিন এইভাবেই রাজনীতির মধ্যে ঢুকেছিল। কিন্তু কৃপাল আজ নারায়ণকে শুধু বিদ্রূপ করে না, আক্রমণ পর্যন্ত করে। কিন্তু হীরেনের এমন মতিভ্রম হয়নি। তার বিশ্বাস নেই, কিন্তু সে শ্রদ্ধা করে তার সাহসকে। সমীহ করে তার নারায়ণকে। প্রশংসা করে সহিষ্ণুতাকে।

ছোকরা পুলিশ অফিসারটি তার স্টেশন এলাকা ছেড়ে কোথাও এক পা নড়তে ভুলে গিয়েছে। তার বিশ্বাস, শ্রীমতী কাফের ভিতরে একটা ভীষণ গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মহড়া চলছে দিন রাত। যতদিন নারায়ণ আসেননি, ততদিন তার এতটা ভয় ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি প্রায় অনুক্ষণই শ্রীমতী কাফের বিপ্লবীদের আড্ডা বসতে আরম্ভ করেছে। একটা কোন গণ্ডগোল ঘটলে কর্তৃপক্ষের কাছে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। স্থানীয় গুপ্তচরেরা এমন কোন সংবাদ সরবরাহ করতে পারেনি, যার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ একটা সার্চ ওয়ারেন্ট ইস্যু করে। কিন্তু সেকথা বিশ্বাস করে না সে। প্রায় প্রত্যহই হাতে লেখা ইস্তাহার দেয়ালে গাছে দেখা যাচ্ছে এবং সেগুলো রীতিমত ভীতিজনক। তার নিয়মিত গানের মজলিশ পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। কেমন একটা প্রাণের ভয় দেখা দিয়েছে তার। থানা পাহারা দেওয়ার কায়দা পর্যন্ত বদলে দিয়েছে সে। কয়েকদিন আগে একজন সেপাইকে ফাইন করেছে তার অসতর্ক প্রহরার জন্য।

মাঝের ঘরে সকলেই চুপচাপ বসে আছে। যেন ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের একটা গুমোট ভাব। প্রিয়নাথের কোলের উপর একটা খোলা বই। দুটো ছবি দেখা যাচ্ছে বইটার পাতায়। একটা চক্রধারী নারায়ণ আর একটা দাড়িওয়ালা মুখ। সে মুখের মাথায় বড় বড় উসকো খুসকো চুল, খানিকটা সাধু সন্তদের মত। অথচ গায়ে কোট। নারায়ণের মত এ মুখ হাসি দীপ্ত নয়। এ মুখ গম্ভীর, যেন কোন ভাবনার ঘোরে ডুবে রয়েছেন। চোখের দৃষ্টি গম্ভীর। নীচে লেখা রয়েছে, ঋষি কার্ল মার্ক্স।

কিছুক্ষণ আগে বইটা পড়া হয়েছে। নারায়ণ বললেন, 'প্রিয়নাথ, সন্ত্রাসবাদ বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ জানি না। কিন্তু, এর সঙ্গে আমাদের মতের বিরোধ কোথায়?'

প্রিয়নাথ অবাক হ'য়ে বলল, 'আমাদের সমিতিগুলোর আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক বিপ্লবের কোন মিল আছে তুমি বলতে চাও? শ্রমিক অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

আবার সেই একই দুর্বোধ্যতা দেখা দিল। রথীনের চোখে ফুটে উঠল ক্রোধ। নারাণদা'কে বোঝাবার ক্ষমতা যে প্রিয়নাথের নেই এবং ব্যাপারটা যে অবাস্তব, তাই ভেবেই তার রাগ হ'চ্ছে।

নারায়ণ বললেন, 'একটু বুঝিয়ে বল ভাই।'

প্রিয়নাথ বলল, 'শিবহীন যজ্ঞ হ'তে পারে না। শ্রমিক বিপ্লব যদি করতে চাও, তবে শ্রমিকদের তুমি বাদ দিতে পার না।'

নারায়ণ বললেন, 'বাদ দিতে তো চাইনে। শ্রমিকদেরও নিয়ে এস আমাদের সমিতিতে টেনে। তাদেরও আমরা অস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত করব।'

প্রিয়নাথ বিস্মিত হ'য়ে বলল, 'সবাইকে?'

'সবাই কি লড়াই করবে?'

'নিশ্চয়ই। সমস্ত শ্রমিকই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করবে।'

এবার নারায়ণের অবাক হওয়ার পালা। বললেন, 'তা' হ'লে দেশের সবাইকেই যে বিপ্লবী হ'তে হয় প্রিয়নাথ! আমার বিশ্বাস, আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা আপনিই সরকারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তারা এসে আমাদের সঙ্গী হবে!'

'তা' হয় না নারায়ণ। বলতে পার, তারা কেন এসে আমাদের সঙ্গী হবে? আমরা যদি তাদের জীবনের সঙ্গী না হই—'

রথীন বাধা দিয়ে ব'লে উঠল, 'ইয়ার্ড ম্যানেজারকে খুন করলেই তো শ্রমিকদের হ'য়ে আমরা শোধ নিতে পারি।'

প্রিয়নাথ অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠল। রথীনের ঔদ্ধত্য তার আর সহ্য হচ্ছিল না। বলল, 'ইয়ার্ড ম্যানেজার হ'য়ে কি আর একজন সাহেব আসতে পারবে না?'

রথীন দৃঢ় গলায় বলল, 'ব্যাপারটা সেখানেই শেষ নয়। তারপরে খোলাখুলি পুলিশ মিলিটারির আক্রমণের কথাটা ভেবে দেখ। তখন? তখন তুমি আবার আত্মগোপন করবে। তাতে শ্রমিক বিপ্লবটা কি হল?'

নারায়ণ বললেন, 'প্রিয়নাথ, চটিসনে ভাই। তুই যেরকম বলছিস, তাতে মনে হচ্ছে আপাতত আমাদের সমিতি-টমিতি তুলে দিয়ে, ইয়ার্ডে গিয়ে শ্রমিকদের ডেকে সত্যাগ্রহ করতে হবে। তাই নয় কি?'

প্রিয়নাথ বলল, 'তা মোটেই নয়। তবে শ্রমিকদের বিপ্লব বোঝাতে হবে।'

নারায়ণ হতাশ হয়ে চুপ ক'রে রইলেন। বিপ্লব বোঝানোটা তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। অথচ প্রিয়নাথের কথা সরাসরি উড়িয়ে দিতে কোথায় যেন বাধছে। বললেন, 'কি ক'রে বোঝাবে?'

প্রিয়নাথ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আমার মনে হয়, তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।'

নারায়ণ হঠাৎ বললেন, 'তোমার সঙ্গে কি পার্টির যোগাযোগ আছে?'

প্রিয়নাথ তেমনি উত্তেজিত গলায় বলল, 'না। তা' যদি হ'তে পারত, তা' হলে তোমাকে আমি আরও পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পারতুম মনে হয়। আমি আরও জানবার, বোঝবার অপেক্ষাতেই আছি।'

'তবে এসব কথা তুমি কি ক'রে বলছ?'

'বলছি, যতটা জানছি ততটা আর আমার ধারণা থেকে।'

নারায়ণ দেখলেন, প্রিয়নাথ ছটফট করছে। সে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সেটা রাগ নয়। তার বিশ্বাসকে সে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না বলে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তাই কষ্ট হচ্ছে। তিনি প্রিয়নাথের একটি হাত টেনে নিয়ে বললেন, 'আমি ভাই তোর কথা বুঝতে পারলুম না। তবু, আমি স্বীকার করি, শ্রমিক বিপ্লব-ই্ আমার লক্ষ্য। আমরা সকলেই আসল পথটা জানবার চেষ্টা করব। সোস্যালিজম্-ই আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই কিন্তু সমিতি আর তার সমূহ কাজগুলোকে বাদ দিয়ে নয়। তাকে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু, এসময়ে সমিতিতে তোর ঠাঁই না হওয়াই উচিত। মতের টানাপোড়েনে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। রাগ করিসনে যেন।'

মনে হল প্রিয়নাথের মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিয়েছে। সে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু পারল না। নারায়ণের কাছ থেকে এতখানি মর্মান্তিক নির্দেশ সে আশা করেনি। এমনিতেই কিছুদিন থেকে তার মনের অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছিল। তার আর্থিক অবস্থা বর্তমানে চরমে পৌঁছেচে। বাড়ীতে ঢোকা তার পক্ষে রীতিমত অপমানকর। দরখাস্ত অনেকবার ক'রেও সরকার কোনপ্রকার ভাতা দিতে রাজী হয়নি। সন্তোষ মাসীমা বলে এক মহিলা তাকে মাঝে মাঝে সাহায্য ক'রে থাকেন। এমনকি হীরেনও।

এইসব নানান ভাবনার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়তম বন্ধু নারায়ণের কাছ থেকে একথা শুনে তার মুখে প্রথমে কোন কথাই সরল না। শুধু তাই নয়, তার মত বলিষ্ঠ প্রকৃতির পুরুষ চোখের জল রোধ করতে পারল না। সে উঠে যাওয়ার মুখে নারায়ণ খপ্ ক'রে তার একটা হাত টেনে ধরলেন। তিনিও বুঝতে পারছিলেন, কতবড় কথা তিনি বলেছেন। এই সমিতি গড়তে প্রিয়নাথও কম চেষ্টা করেনি। সমিতির ছেলেরা প্রিয়নাথকেও কম ভালবাসে না কিন্তু তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে, প্রিয়নাথের জন্য সমিতির মনে সংশয় দেখা দেবে, দোদুল্যমানতা দেখা দেবে।

প্রিয়নাথের চোখে জল দেখে নারায়ণের বুকের মধ্যে টন্‌টন্ ক'রে উঠল। কিন্তু সমিতির ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করা মৃত্যুর সামিল। সেখানে নরম হওয়া চলে না। বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস প্রিয়, বস্। আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ্ ভাই।'

প্রিয়নাথ দেখল রথীনের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। মুহূর্তে মাথা নাড়া দিয়ে দাঁড়াল সে। চোখের জলের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়ে সে বলল নারায়ণকে, 'নারায়ণ আজ আমাদের রাগের দিন নয় আলোচনার দিন ছিল। তাই বল্‌ছি, সমিতির এ আদর্শ নিয়ে আমাদের পা

বেশীদূর যেতে পারে না। দেশের বৃহত্তম শ্রমজীবী জনসাধারণই আমাদের সমিতি। আমার বিশ্বাস তাদের 'পরে-ই। শ্রমিক বিপ্লব যদি তুমি চাও, তোমাকে একদিন আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে।'

ব'লে একমুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে প্রিয়নাথ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

নারায়ণ শুধু ব'লে উঠলেন, 'বিশ্বাস করি ভাই......বিশ্বাস করি......' বলতে বলতে থেমে গেলেন। যেন খানিকটা অবাক বিস্ময়ে তিনি শূন্যে তাকিয়ে রইলেন। সকলেই চুপচাপ। তারপরে হঠাৎ তিনি আপন মনে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন, 'জনসাধারণই সমিতি। অদ্ভুত কথা বলেছে প্রিয়নাথ। ওর কথায় যেন কোথায় চরম সত্য লুকিয়ে রয়েছে।'

রথীনের দিকে ফিরে বললে, 'রথী, তুমি পরশু বলছিলে, প্রিয়নাথ বুঝি ভয় পেয়েছে। তা' নয়। ওর মত সাহসী আমাদের সারা জেলার মধ্যে কেউ ছিল না, আজও আছে কিনা জানি না। ওকে শত্রু ভেব না। আজকে শুধু কথায় বলছি শ্রমিক বিপ্লব, আমার বিশ্বাস একদিন হয়তো প্রিয়নাথকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে।'

এই একই ব্যাপার নিয়ে নারায়ণের সঙ্গে কৃপালদের প্রায় প্রত্যহ বিতর্ক। তাদের কাছেও সে শ্রমিক বিপ্লবের কথা বলেছে। মুখে সে প্রিয়নাথকে যাই বলুক তার একটা অখণ্ড বিশ্বাস আছে। আজকের সন্ধ্যাবেলার আসরে ঘটনার একটা অভিনবত্ব দেখা গেল।

প্রৌঢ় বয়স্ক শঙ্কর ঘোষ এসেছেন। ইনি মহকুমা কংগ্রেসের কমিটির সভ্য। পরপর কয়েকদিনই ইনি আসছেন। বোধ হয় তাঁর একটা বিশ্বাস আছে, নারায়ণকে তিনি স্বমতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। কিন্তু তিনি একদিনও রথীনের মত উগ্রদের সঙ্গে কথা বলেননি। এমনকি প্রিয়নাথের সঙ্গেও নয়।

বিকালের আসর বসেছে তেমনি। তবে অস্বীকার করা যায় না, খদ্দেরের সংখ্যা খুবই কম। এ আসরে আশ্চর্যরকমভাবে জমিয়ে নিয়েছেন গোলক চাটুজ্জেমশাই। যখন সবাই রাজনীতি বাক্‌বিতণ্ডা ছেড়ে একটু হাঁফ ছাড়বার জন্য মুখ ফিরিয়ে বসে, তখনই চাটুজ্জেমশাই যেন বিচলিত শিশুর কাছে রূপকথার ঝাঁপিটি পেড়ে বসেন, 'তারপর জান্‌লে ভায়া।'......

চরণ মাঝে মাঝে ব'লে ফেলে ভজনকে, 'দোকানটা বসে যাবার গতিক দেখছি।' ভজন অমনি তাকে খ্যাঁক ক'রে ওঠে, 'এ হারামজাদার দেখছি মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। তোর দু'বেলার পিণ্ডিতে কম পড়েছে র‍্যা?' পড়েনি ঠিকই। আর চরণ এদের ভালওবাসে। কিন্তু......। হ্যাঁ সে কিন্তু আছে ভজনের মনেও। মনে মনে দায়িত্ববোধকে উস্‌কে তুলতে গিয়েও হেসে বলে নিজে নিজে, আমি বুঝি ওদের প্রেমে পড়েছি। সর্বনাশ হ'লেও কি আশ্চর্য, আমি বোধ হয় ওদের ছাড়া বাঁচব না। তার মত, পথ ও বিশ্বাসহীনতার মত এ প্রশ্রয় দানেরও যেন কোন ভিত্তি ছিল না। অথচ ভজনের ব্যক্তিত্ব নেই, এমন কথাও বলা চলে না। এখানকার সকলের সঙ্গে নারায়ণ পর্যন্ত জানেন, সময় হলে ভজনের একটিবার অঙ্গুলিসঙ্কেতে সবাইকে সুড়সুড় ক'রে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ভজন এদের কটু কথা বলে, গালাগালও দেয়, তবু তাড়িয়ে দেয় না। আর এও বড় অদ্ভুত, এসব কথা সে যত ভাবে তত তার নেশা বেড়ে যায়।

শঙ্কর ঘোষ বললেন, 'যা-ই বল নারায়ণ, যুক্তি তোমার কাঁচা ভাই।'

বোঝা গেল তর্কটা আজ অনেকক্ষণ থেকেই জমেছে। কিন্তু আজকের মত নারায়ণ যুক্তি

তুলে নিয়ে দৃঢ়তা দেখাবার পদ্ধতি কোনদিন নেননি। বললেন, 'শঙ্করদা, যুক্তি কি সব সময়েই বড়?'

শঙ্কর হাসলেন। বললেন, 'তুমিই বলেছ, বিনা যুক্তিতে কোন কথা প্রমাণ করা যায় না। যুক্তি তো তোমার কাছেই বড়।'

এ আসরে প্রিয়নাথ আসতে ভুল করেনি। সে অত্যন্ত উৎসুক মুখে নারায়ণের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন নারায়ণের মুখে কোন কথা আটকে গেলে সে যুগিয়ে দেবে। নারায়ণ বললেন, 'শঙ্করদা, যা সত্য, তার যুক্তি সব সময়েই আছে। সে যুক্তি তো সকলে দেখাতে পারে না। মিছে বলব না। আমার যুক্তি আমি দেখাতে পারলুম না। কিন্তু শ্রমিকদের উপর আমার বিশ্বাস কেউ টলাতে পারবে না। জগতে ঋতু বদলায়, কেন তা সবাই কি বলতে পারে?'

শঙ্কর বললেন, 'তুমি যদি বলতে না পার, তবে তোমার বিশ্বাসের কি মূল্য আছে নারায়ণ!'

'আপাতত মূল্য নেই। কিন্তু শ্রমিকরা যেদিন সচেতন হ'য়ে উঠবে, সেদিন তারা চাইবে নাগপাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে।'

কৃপাল হেসে উঠে বলল, 'নাগপাশ কিসের, স্বরাজ এলে কি তারাও মুক্ত হবে না?'

উত্তর দিল প্রিয়নাথ, 'স্বরাজ করতে হ'লে আপসের পথ ধরলে হয় না। শ্রমিক চায় তার শ্রেণীর মুক্তি।' কথাটা শুনে নারায়ণের চোখের সামনে একটা আলোর রেখা ঝকঝক ক'রে উঠল। শ্রেণীর মুক্তি! হঠাৎ একটা অর্থহীন কথা শুনেছেন বলে মনে হল। অথচ অর্থময়। একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কথা।

শঙ্কর আবার হেসে উঠে বললেন, 'বুঝেছি তোমাদের কথা। একটা বালুচরে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ। একটা রক্তের নেশা তোমাদের পাগল করেছে। এই রক্তপাতের ভয়ে গান্ধীজী বারবার উৎকণ্ঠিত। একদল অশিক্ষিত বুদ্ধিহীনদের খ্যাপামিটাকে তুমি মস্ত বড় মনে করেছ। যার পরিণতি একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা ছাড়া আর কিছুই নয়!'

নারায়ণ হঠাৎ তাঁর স্বমূর্তিতে জ্বলে উঠলেন। তাঁর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল একটা বিজাতীয় ঘৃণার আগুন। সে মুখ দেখলে আজকেও অনেকের বুকের মধ্যে ধ্বক করে ওঠে। বললেন, 'ইংরেজ সরকারকে আপনারা যতই বোঝাতে চান, সে অবলীলাক্রমে রক্তপাত চালিয়ে যাবে। সে কি আপনিও ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন শঙ্করদা? না পেরেছেন কোনদিন। সেই রক্তখেগো বাঘটাকে সায়েস্তা করতে হলে, বল্লম দিয়ে তাকে এফোঁড় ওফোঁড় না করলে তার মৃত্যু নেই।'

হীরেন যেন শিউরে উঠল। সে মাথা তুলল কিন্তু বলতে পারল না। অবশ্য শঙ্করদার বক্তব্যও তার ঠিক মনে হ'চ্ছে না। তিনি ঠিক বোঝাতে পারছেন না। জাতি তার নিজস্ব চারিত্রিক অনাচার থেকে যতক্ষণ মুক্ত শুদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ এই তর্ক আসে কি ক'রে।

কিন্তু ঠিক সময়েই কয়েকজন লোক শ্রীমতী কাফের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ আবহাওয়ার তুলনায় এদের লোক আখ্যা দেওয়াও যেন মুশকিল। সকলেই বিস্মিত হ'য়ে প্রথমে মনে করল একদল ধাঙড় এসেছে বোধ হয় হীরেনের সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু এরা ঠিক ধাঙড় নয়। তুলনায় আর একটু সপ্রতিভ মনে হল। কালো কালো মুখগুলোতে শ্রদ্ধা লজ্জা ভয়, সবকিছু মিশিয়ে বড় অদ্ভুত হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন বারান্দায় উঠে এসে নারায়ণের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল।

প্রিয়নাথের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। রথীন তাড়াতাড়ি নারায়ণকে বলল, 'এরা এখানকার চটকলের মজুর! এ দুজন গত বছর জেল খেটে এসেছে, মনোহর আর ভাগন। আপনার সঙ্গে ওরা দেখা করতে চেয়েছিল নারাণদা।'

নারায়ণ শশব্যস্ত হ'য়ে উঠে বললেন, 'আসুন, ভেতরে এসে বসুন।'

ব্যাপারটাতে শঙ্কর ও কৃপালরা না হেসে পারল না। বিশেষ নারায়ণের অভ্যর্থনা দেখে তাদের মনে হল, ব্যাপারটা একটা ঠাট্টা হচ্ছে।

নারায়ণ হিন্দি বলতে পারেন না। কিন্তু মনোহর আর ভাগন বাংলা কথা বুঝেছে। বুঝেও তারা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বোধ হয় এতখানি ভদ্র আহ্বানের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। যদিও বা পা বাড়ান যেত শঙ্কর কৃপালের মুখে উৎকট নীরব হাসি দেখে তারা কেমন ঘাবড়ে গেল।

এতক্ষণে ভজন মাথা তুলে তাকাল। বারান্দার মূর্তিগুলো দেখে প্রথমটা সে কিছুই বুঝতে পারল না। কোঁচকানো ভূর তলা থেকে সে তার রক্ত চোখ মেলে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই বাবা?'

এতক্ষণ মনোহর আর ভাগন বিব্রত মুখে খানিকটা বোকাটে হাসি হাসছিল। এবার ভয় পেয়ে গেল। কি বলবে, ভেবে পেল না।

নারায়ণ তাড়াতাড়ি বললেন, 'এরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ভজন। এরা মজুর।'

ভজন হা হা ক'রে হেসে উঠল। বলল, 'একেবারে শ্রীমতী কাফেতে এসেছ বাবা। এস, আর দাঁড়িয়ে কেন? খোদ কর্তার হুকুম হ'য়ে গিয়েছে।'

ব'লে সে নিজেই এগিয়ে গিয়ে মনোহরের হাত ধরল। মনোহর ও ভাগনের মুখে ভয় মিশ্রিত হাসি। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। ভজুলাটবাবুকে তারাও খানিকটা চেনে। কিন্তু সেই চেনাটা-ই সব নয়। একে বাবু, তায় মাতাল। বিশ্বাস আছে কিছু?

রথীন ব'লে উঠল, 'ভেতর এস ভাগন।'

মনোহর আর ভাগন এবার একটু বোধ হয় ভরসা পেয়ে ভেতরে ঢুকে নারায়ণের চেয়ারের কাছেই মাটিতে বসতে যাচ্ছিল। ভজন দুজনেরই হাত ধরে বলল, 'উঁ হুঁহুঁ, কর কি। তোমাদের আজ নীচে আসন দিলে শ্রীমতী কাফের ইজ্জৎ ঢিলে হ'য়ে যাবে যে বাবা। কুর্শিতে ব'সো।'

কথাটা শুনে কৃপাল আর তার অট্টহাসি চাপতে পারল না। সকলে ভাবল, ভজন এটা একটা নেহাত ক্যারিকেচার করছে।

কিন্তু ভজন খ্যাঁক ক'রে উঠল কৃপালকে, 'থাক, আর দাঁত বার ক'রে হাসতে হবে না। আমার কাছে স্বদেশীয়ালার কোন জাত নেই। ভুনু গাড়োয়ান আমার সারথী, বাঙ্গালী আমার ইয়ার, আর এ জেলখাটা স্বদেশীয়ালাদের আমি মাটিতে বসাব?'

ব'লে মজুর দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজকে তোমরা আমার অতিথি। কুর্শিতে না বসলে চলবে না।' মনোহর হাত জোড় ক'রে হেসে বলল, 'বাবু কুর্শিমে বৈঠ্‌না হমলোগ নাহি জান্‌তা।'

'তা' হলে আজ জানতে হবে বাবা।' ব'লে প্রায় জোর ক'রে বসিয়ে দিল তাদের দুটো চেয়ারে।

প্রিয়নাথ নারায়ণ কেউ-ই এ-বিষয়ে ভজনের সততার মাপকাঠিটা ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। কিন্তু বোঝা গেল, চেয়ারে না বসলেও ভজন ছাড়বে না।

অগত্যা মনোহর আর ভাগন বসল। বসল চেয়ারে পাছাটা কোনরকমে ঠেকিয়ে, গা হাত পা

সিঁটিয়ে, শক্ত ক'রে। লজ্জায় ও সংশয় ভরা মনে। যেন এতবড় বিড়ম্বনা তাদের জীবনে আর কোনদিন ঘটেনি।

তাদের সঙ্গে যে কয়েকজন মজুর এসেছিল তারা বাইরে দোকানের কোণে দাঁড়িয়ে এ অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখছিল। এতক্ষণ তাদের মুখেও একটা ভয়ের ভাব ছিল সঙ্গী দুইজনের জন্য। এবার খুব ধীরে ধীরে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। পরস্পরের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে চোখের ইসারায় নিজেদের মধ্যে এক দফা বোঝাপড়া ক'রে নিল তারা। তারা গর্বিত তাদের সঙ্গীদের সম্মানে।

শুধু তাই নয়, একজন দু'জন ক'রে লোক জমতে আরম্ভ করেছে। আশেপাশের দোকানী, গাড়োয়ান, রেলের কুলি। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু একটা মজার কাণ্ড কিছু ঘটছে, এ-বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ ছিল না। বিশেষ ভজুলাট যখন এখানে রয়েছে।

বিকালের আসরে শ্রীমতী কাফে যেন একটা বিচিত্র নাট্যের মঞ্চ হ'য়ে উঠেছে। আর রাস্তায় ভিড় করছে দর্শকেরা।

নারায়ণ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছেন। হয়তো বেচারাদের নিয়ে সমস্তটাই একটা নিষ্ঠুর প্রহসন হ'য়ে যাবে। প্রিয়নাথের অস্বস্তি হচ্ছে। এ মানুষগুলো কবে মাথা তুলে বসতে পারবে দশজনের সভায়।

শঙ্কর ভাবছিলেন, স্বরাজের আন্দোলনকে নিয়ে একটা সস্তা খেলার আসর জমেছে। হীরেন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে আছে মজুর দু'জনের দিকে। সেই নিরন্ন ভারতবাসী, যারা অভাবে আর অনাচারে আজ কারখানার পশু বনেছে। এদেরই একদিন আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ফসলের ক্ষেতে, অনাচার থেকে মুক্ত ক'রে নিষ্পাপ ধার্মিক ক'রে তুলতে হবে এদের।

সকলের এ স্তব্ধতার মাঝখানে ভজন্ হাঁক দিল, 'চরোণ!'

'আজ্ঞে।' চরণ এসে দাঁড়াল গোমড়া মুখে। যেন সে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে হুকুমের কথাটা।

'এদের চা দে।' ব'লে আবার ফিরে বলল, 'চপ দে, কাটলেট দে।'

ভাগন একটু বয়স্ক। সে ত্রস্তে একবার মনোহরের দিকে দেখে বলল, 'মাফ্ কিজীয়ে বাবুজী, উসব চিজ খানা হম্‌লোগকা মানা হ্যায়।'

কৃপাল ব'লে ফেলল, 'হিন্দু কুলতিলক।'

প্রিয়নাথের মনটা ভীষণ খারাপ হ'য়ে গেল। নারায়ণ বললেন, 'জোর করিস্‌নে ভজু। না খায় তো থাক্।' ভজন আর দ্বিরুক্তি করল না। নারায়ণ ফিরে বললেন, ভাগনের দিকে তাকিয়ে, 'আপনারা থাকেন কোথায়?'

ভাগন হাত জোড় ক'রে জবাব দিল, 'কালোবাবুকা বস্তিমে। কেত্‌নাদিন সোচা বাবু আপ্‌কো সাথ মোলাকাৎ করেগা, মগর টাইম নহি মিলতা।'

কৃপালের একটা ফিস্‌ফিসানি শোনা যাচ্ছে। শঙ্কর মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে হাসছেন।

মনোহর বলল, 'বাবু, আপ দেওতা হ্যায়।'

নারায়ণের মুখ লাল হ'য়ে উঠল লজ্জায়। বললেন 'ছি ছি, এসব কি বলছেন। আমি আপনাদের মতই মানুষ।'

ভাগন বলল, 'এ বাত্ বোলনেসে হম নহি শুনেগা বাবু। হমলোগ শুনা, আপ গান্ধীবাবাকো

সাথ্ জেহল মে রাহা। সওরাজ ঔর মজদুর কে বারে উন্‌নে আপকো ক্যায়া বাতায়া, হম্‌লোগকো শুনাইয়ে।'

কৃপালের সঙ্গে এবার শঙ্করও না হেসে পারলেন না। কিন্তু হাসল না হীরেন।

নারায়ণ অপ্রস্তুত, অপ্রতিভ। লজ্জায় ও ক্ষোভে তিনি যেন কালো হয়ে উঠলেন। পর মুহূর্তেই মাথা তুলে বললেন, 'কে বলেছে আপনাদের একথা। মিছে কথা। আমি গান্ধীজীর সঙ্গে জেলে ছিলুম না। দেখিনি কোনদিন তাঁকে।'

মনোহর আর ভাগন ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল, বাবুর এটা বিনয় মাত্র। তারা দুজনে হাসল, পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে। অর্থাৎ বড়ে বড়ে আদমির এটাই আদত।

কথাটা শুনে প্রিয়নাথ, রথীনও কিরকম অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

মনোহর তেমনিভাবে, যেন দেবতার কাছে হাত জোড় ক'রে বলল, 'যো ভি হো বাবুজী, হম মজদুর ভি সওরাজ মাংতা। বাবুজী, হম দুনোকো নোকরি ছিন্ লিয়া মালিক, লাইনসে বাহার নিকাল দিয়া। হমলোগকো খানা নহি মিলতা। ঔর দেখিয়ে, কারখানামে শালা দিনকে দিন সাহাবলোককা জুলুম বাড়তে যাতা। এ শালা বিলাইতী কোম্পানী হমলোগকো মারডালতা। ইস্‌কা জবাব দে'নে মাংতা হমলোগ।'

বলতে বলতে মনোহরের অত্যন্ত ভালোমানুষি মুখটা যেন রাগে স্ফীত হ'য়ে উঠল।

ভাগনও উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'হাঁ বাবু, ইস্‌কা জবাব দে'নে হোগা। হমলোগকো জান্‌বার সমঝ্‌তা মালিক লোগ। জেনানা বাচ্ছা 'পর ভি হাত উঠা দেতা।'

শুনতে শুনতে নারায়ণের প্রাণেও আগুন জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, জবাব দিতে হবে। বিলাতী কোম্পানী এদেশের মানুষকে জানোয়ার ভাবে, মেয়ে শিশুরাও তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। জবাব দিতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? আগুন জ্বালতে হবে। এদেশের প্রত্যেকটি সাদা চামড়ার মানুষকে ধরে ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারতে হবে। সারা দেশটার কোণে কোণে ইংরেজের কবরখানা তৈরী করতে হবে।

ভাগনের গুঁফো এবড়োখেবড়ো মুখটার চামড়া টান টান হ'য়ে উঠল। কোটরাগত চোখ দু'টো কপালে তুলে সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, 'বাবুজী, মজদুরলোগ শালা বুদ্ধু হ্যায়। ইলোগ খালি মার খাতা। মগর বাবুজী, আপ হমারা সাথ দিজীয়ে, হম লড়েঙ্গে।'

'আপনারা লড়াই করবেন?' নারায়ণ বললেন চাপা উত্তেজিত গলায়। তার আলো ভরা চোখ জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে উঠল। বললেন, 'আমি সাথ দেব আপনাদের সঙ্গে, লড়াই করব, যতদিন একটা ইংরেজও এদেশে থাকবে'.......

প্রিয়নাথ ভুলে গিয়েছে সকালবেলার সব অপমান। তারা সারা মুখে আলো ফুটে উঠল।

শঙ্কর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। তাঁর মনে হল যেন, একটা ষড়যন্ত্রের আসর বসেছে এখানে। একটা গুণ্ডামির ষড়যন্ত্র। কতকগুলি মূর্খ খ্যাপা লোকের সঙ্গে নারায়ণ কেমন ক'রে এভাবে কথা বলছে যে তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না।

হীরেনও কিরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে। অথচ এই মনোহরকে সে গতকাল দেখেছে মদ খেতে, খিস্তি করতে। এরা লড়াই বলতে কি বোঝাতে চাইছে?

শুধু হাসছিল কৃপাল। কেবল মাথাটা খারাপ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়েছে ভজনের। এ ন্যাংটা মজুর দুটো বলছে কি! লড়াই করবে? বিশ্বাস ও সাহস আছে ওদের। নেশাটা এত মাটি ক'রে

দিলে তার। কি করবে ওরা? পিস্তল ছুঁড়বে না কামান দাগবে?

এমন সময় দোকানের বাইরের জমায়েতে একটা গুল্‌তানি উঠল।

দেখা গেল সরে পড়ছে সব একে একে। খালি হ'য়ে যাচ্ছে দোকানের সামনেটা।

কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে ডাকছে, 'এ ভাগন বুড্ডা, চলা আও জল্‌দি.....জল্‌দি।'

দেখা গেল রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই ছোকরা পুলিশ অফিসার। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে দেখছে সকলের দিকে।

এমন সময় আর একটা কাণ্ড ঘটল। স্টেশনের রকের উপর থেকে মত্ত জড়ানো গলায় একটা অদ্ভুত গান ভেসে এল। সবাই তাকিয়ে দেখল বাঙ্গালী চীৎকার ক'রে গান ধরেছে। গান গাইছে,

পা ট'লে ট'লে খানায় পড়ে ওই তো বড় মজা
চার আনার মদ কিনেছি চাট করেছি গাঁজা।
তারা মায়ের এই করুণা,
মাতাল যেন মদ ছাড়ে না
জাহাজে মাস্তুলে উঠে খাচ্ছি পাঁপড় ভাজা।

সারা রাস্তাটায় একটা হাসির রোল পড়ে গেল।

কিন্তু শ্রীমতী কাফের ভিতরে একটা অস্বস্তি দেখা দিল। একটা বিশ্রী স্তব্ধতা।

শঙ্কর হেসে উঠে বললেন, 'নাও, দিগ্বিজয় ক'রে ফিরেছেন আর এক মজুর। নারাণ, চেয়ে দেখ ভাই তোমার মজুরের হাল।'

এ বিদ্রূপের কোন প্রতিবাদের ভাষা জানা ছিল না নারায়ণের। প্রিয়নাথেরও নয়। তাদের মুখগুলি কালো হ'য়ে গেল। লজ্জায় মাথা নুইয়ে পড়ল তাদের।

ভাগন মনোহরও উঠে পড়ল। তাদের সঙ্গীরা সব চলে গিয়েছে। তাদেরও কি রকম অস্বস্তি হ'চ্ছে। বিশেষ ওই পুলিশ অফিসারটা এসে সব যেন গণ্ডগোল করে দিয়েছে। তারা মাথা নুইয়ে নারায়ণকে নমস্কার করে বলল, 'আজ হমলোগ চলতা বাবুজী, ফিন্‌ আয়েগা।'

চায়ের কাপে তাদের চা প'ড়ে রইল।

শঙ্কর ব'লে উঠলেন, 'তোমার ওই বিপ্লবী মজুর দু'জনও তাই। রোজগার করবে দু'পয়সা, মদ খাবে এক আনার। বিপ্লব মানে কি মূর্খের খ্যাপামি? এদের নিয়ে তুমি বিপ্লব করবে? এদের দিয়ে তুমি সব করতে পার, স্বরাজের সংগ্রামের এরা জঞ্জাল। এদের তুমি বিশ্বাস কর?'

আশ্চর্য! নারায়ণ মাথা তুলে বললেন, 'করি শঙ্করদা। কিছু না বুঝলেও এটা বুঝি, যারা চিরকাল প'ড়ে প'ড়ে মার খায়, তারা একদিন না মেরে ছাড়বে না। আজও বুঝেছি যতই মদ খাক, আমরা পথ দেখাই বা না দেখাই, ওরা একদিন শোধ তুলবেই। না হলে বুঝব, এ সংসারে সবটাই মিথ্যে।'

'সে শোধ তোলার নাম কি বিপ্লব?'

'তা' জানিনে, কিন্তু ছেলে বউ নিয়ে চিরকাল কেউ মার খায় না।'

ব'লে তিনি তাকিয়ে দেখলেন ঘড়িতে পৌনে ছ'টা বেজেছে। দেখে উঠলেন। তাঁর চোখ দুটোতে বেদনা ও রাগের আলো ছায়া। মনটা যেন কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। মনে যেন কি খুঁজছে। খুঁজছে এক বস্তু। নাম না জানা এক পরম বস্তু। ফিরে তাকালেন ঘড়ির উপরে নারায়ণের মূর্তির দিকে। মনে মনে বললেন, 'পাব তাঁকে পাব। আজ যিনি মেঘের আড়ালে, কাল

তাঁর হাসির আলো ছড়িয়ে পড়বে সারা আকাশে। অন্তর্যামী তো জানেন, এই উপোসী মাতাল মানুষগুলি, ওই বাঙ্গালী, ওদের বুকে কি অসহ্য বেদনা। অপমানে মাথা নোয়ানো ভগবান কি দারুণ ক্রোধে ওদের বুকের মধ্যে গর্জাচ্ছে। পিশাচের পায়ে চাপা মাথার শিরা উপশিরা ছিঁড়ে পড়তে চাইছে তাদের মাথা তোলার জন্য।......বল বীর, বল চির উন্নত মম শির।'

বাঙ্গালী এসে পায়ে পড়ে প্রণাম করল নারায়ণকে। বলল, 'চলে যাচ্ছ বট্‌ঠাকুর। এট্টা গান শুনে যাও মাইরী!'

আবার একদফা হাসির রোল প'ড়ে গেল। তবুও নারায়ণ হার স্বীকার করলেন না। বললেন, 'গান তো শুনব। তা' হ্যাঁরে, বাড়ীতে হাঁড়ি চড়েছিল আজ?'

বাঙ্গালী মাতাল চোখ দুটো তুলে বলল, 'তুমি বুঝি রাগ করেছ বট্‌ঠাকুর, নইলে বউ ব্যাটার কথা ব'লে এমন নেশাটা ভাঙ্গিয়ে দেয় গো! আর, চাকরি করি কোম্পানীর রেলে। হাঁড়ি চড়েনি শুনলে লোক যে হাসবে গো। আসলে আমাদের হাঁড়ি-ই ফুটো। তলা দে সব গলে যায়।'

ব'লে সে হা হা করে হেসে উঠল। হাসি নয়, নারায়ণের মনে হ'ল দরাজ গলায় কান্নার একটা হা হা রবের রূপান্তর মাত্র। তিনি নেমে এলেন রাস্তায়। সময় হয়েছে, যেতে হবে। আপাতত বাড়ীতে, কিন্তু তাঁকে যেতে হবে বাড়ী ছেড়ে। ডাক এসেছে তাঁর। যেতে হবে ঢাকা, পূর্ববঙ্গে। দু'একদিনের মধ্যেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বসবেন। একটা কিছু স্থির করবেন গান্ধীজী। না ক'রে উপায় নেই। একটা কিছু চাইছে দেশের মানুষ। অস্থির হ'য়ে উঠছে দেশ। অস্থির হ'য়ে উঠছে ভাগন মনোহরের দল, বাঙ্গালীর মত হাজার হাজার মানুষগুলি। তাকে তুমি, যা-ই বল, মাতাল, মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু কেউ আর মানতে চাইছে না। মানবে না।

প্রিয়নাথও উঠে পড়ল। বাঙ্গালীর সঙ্গে কিছু কথা ছিল তার, কিন্তু হল না। উঠে পড়লেন শঙ্কর, সঙ্গে কৃপাল। হাসতে হাসতে শঙ্কর বললেন, 'সবটাই একটা পাগলামী।'

কৃপাল বলল, 'শুধু পাগলামী নয়। কংগ্রেসের মধ্যে এসব এলিমেন্ট বিষের মত কাজ করছে শঙ্করদা।'

শঙ্কর বললেন, 'দ্যাখ এবার ওয়ার্কিং কমিটি কি সিদ্ধান্ত দেয়। গান্ধীজী রয়েছেন, এসব এলিমেন্টের জন্য আমরা ভয় পাইনে।'

হীরেন বসে রইল। সে ভাবছিল, ভয় নয়, গান্ধীজীর সমস্ত বাসনা হয় তো এবারও অতৃপ্ত থেকে যাবে। কেননা, দেশের জন্য যারা প্রাণ দেবে, তারা যদি সুস্থ মনে একমত না হয়, তবে তো ব্যর্থতাই আসবে। ব্যর্থতা আসবে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে। তাই তো এসেছিল একদিন। একুশ সালের হিংসাত্মক ব্যর্থতা থেকেই তো নারায়ণ মোড় নিলেন। কিন্তু হীরেন মোড় নেয়নি। সে বিশ্বাস করে গান্ধীজীর দর্শনকে, তাঁর আদর্শকে।

সে ডাকল, 'ভজন!'

ভজন মাথা তুলল। তার মাথাটা কেমন গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে। এখানকার সমস্ত কথাগুলো তার দুর্বোধ্য মগজে যেন পেরেকের মত ফুটছে। আর ড্রয়ারটা প্রায় খালি হয়ে পড়ে আছে। দু'চার আনা পড়ে আছে মা লক্ষ্মীর প্যাঁচার মত মুখ লুকিয়ে। ধারের খদ্দেররা কেউ শোধ করতে আসেনি পয়সা। স্টেশনের রক্ ঘেঁসে একজনকে চলে যেতেও দেখেছে চুপি চুপি; কিন্তু কিছু বলেনি।

সে মাথা তুলল। তার চোখের দৃষ্টি অস্থির। অথচ যেন জ্বলছে ধ্বক্ ধ্বক্ করে। বলল, 'বল।'

হীরেন মুহূর্তের জন্য মুষড়ে পড়ল। পরে বলল, 'বলছিলুম, নারায়ণদা যা বলছে, তা ঠিক নয়।'

'যথা?'

'নারায়ণদা যা বলছে তাতে মজুরের কোন সুরাহা হবে না। এইসব অশিক্ষিত মানুষগুলোকে দিতে হবে আক্ষরিক শিক্ষা, আর একদিকে সত্যাগ্রহের প্রকৃত সৈনিক ক'রে গড়ে তুলতে হবে এদের। অহিংসার মর্মবাণী পৌঁছে দিতে হবে ওদের বিক্ষুব্ধ অন্তরে।'

ভজন চোখ দুটো কুঁচকে প্রায় ভেংচি কাটার মত ক'রে বলল, 'দ্যাখ হীরেন, তোর থেকে আমি বেশি লেখাপড়া করেছি তো?'

হীরেন অবাক হল। 'তা তো করেছ।'

'তবে তুইও শালা আমাকে বোকা বোঝাচ্ছিস?'

শালা শুনে লজ্জায় কান দুটো গরম হ'য়ে উঠল হীরেনের। বলল 'কেন?'

'কেন?' ভজন বলল, 'শিক্ষা দিবি, আর সত্যাগ্রহ করবে, ওদিকে ইংরেজের ঠ্যাঙানিতে যে সব পটল তুলবে বাবা। সত্যাগ্রহ বনাম কামান?'

ব'লে সে হা হা ক'রে হেসে উঠে বলল, 'আমার চেয়ে তোদের মাথা খারাপ দেখছি।'

হতাশ হল হীরেন। বৃথাই বোঝাতে গিয়েছিল সে ভজনকে। মাতালটাকে। সে উঠে রাস্তায় নেমে এল। বুঝবে না। এরা কেউ বুঝবে না। কত কামান ছুঁড়বে ইংরেজ? একজন নির্ভীক সত্যাগ্রহী যে কামানের চেয়েও কঠিন। শত্রু যে সে তো মানুষ। কামান সে কতক্ষণ ছুঁড়তে পারে? ভগবান কি একবার ওর হৃদয়ে এসে ওই কামান ছোঁড়া হাতকে জড়িয়ে ধরবেন না? প্রেম জাগাবেন না তার মনে!

কিন্তু এরা কেউ বুঝবে না। এরা চায় রক্তের বদলে রক্ত। যার ফল হয় শূন্য। কিন্তু বুঝতে হবে মানুষকে। এমনকি ধাঙ্গড় বস্তির মানুষগুলোও বুঝতে আরম্ভ করেছে। তারাও স্বীকার করেছে। তাই আজ হীরেনও বিশ্বাস করে, ঠিক প্রিয়নাথেরই মত এইসব অশিক্ষিত নিরন্ন দেশবাসী থেকেও বেরিয়ে আসবে নেতা। যেমন বেরিয়ে আসছে রামা। রামা ঝাড়ুদারণী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নট মেয়ে। তার স্থূল মুখে আজ বুদ্ধির দীপ্তি। অদূর ভবিষ্যতে রামার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হবে। সে হবে প্রকৃত সত্যাগ্রহী।

তবু হায়! রামার চোখে বিচিত্র স্বপ্নের ছায়া কাটতে চায় না। মনের তলায় বুঝি রামারই অজান্তে রয়েছে এক তীব্র আগুনের ঝাঁজ। সে আগুনের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে পথে আর বস্তিতে তার চলায় ফেরায় হাসিতে।

একটা নিশ্বাস পড়ে হীরেনের। আগামী পরশুই তার ধাঙ্গড় বস্তিতে যাওয়ার কথা। তার নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ সার্বজনীন চড়ুইভাতির। তারপরে, ওরা একটা জৌলুস বের করবে। জৌলুসের পুরোভাগে থাকবে হীরেন। হয়তো অনেক লোক হাসবে। এমনকি কৃপালরাও হাসবে সে জানে। কারণ, তারা এ ব্যাপারটাকে কেউ আমল দেয়নি। উপরন্তু হেসে উড়িয়েছে। ওড়াক, তবু এদের মনুষ্যত্ব, এদের দুঃখকে ছেড়ে যাবে না হীরেন। অস্পৃশ্যের হৃদয়কে সে স্পর্শ করতে চায়।

তারপর দিন আসছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বসতে যাচ্ছেন আজ কালের মধ্যেই। ভবিষ্যৎকে দেখবার জন্যই হীরেন তাকাল আকাশের দিকে। আকাশ নেই। তারা নেই। অন্ধকার আর কুয়াশা। কি আছে তার ভবিষ্যৎ জীবনে। কি আছে পথে!.......সে চলতে আরম্ভ করে।

খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে হাসছে কুটে পাগলা। আর স্টেশনের রকের ভবঘুরে মধ্যবয়সী অধিবাসিনীকে অকারণ ঘুরে ঘুরে গালাগাল দিচ্ছে।

শ্রীমতী কাফে প্রায় শূন্য! গোলক চাটুজ্জ্যেমশাই বসে বসে ঝিমুচ্ছেন।

ভজন ডাকল, 'বাঙ্গালী!'

বাঙ্গালী কিছুক্ষণ পর এলিয়ে পড়া মাথাটা তুলে বলল, 'লাটঠাকুর, একটা কথা বলব?'

'বল্ শুনি।'

'তোমার বউ তোমাকে গাল দেয়?'

ভজন হেসে বলল, 'দিলে বাঁচতুম। কিছুই তো বলে না। কেন বল্ দেখি।'

'আমার বউ আমাকে বড় গাল দেয় ঠাকুর। খালি বলে, বাড়ী থেকে বেইরে যাব। বেশ, আমি না হয় যাব না, ও-ই থাক বাড়ীতে। কি বল ঠাকুর।'

চরণ সরু গলায় হেসে উঠল খিল্‌খিল্ ক'রে। হাসি পেয়েছে বাঙ্গালীর কথা শুনে।

ভজন খেঁকিয়ে উঠল, 'আ মলো, হারামজাদা হেসে মরে কেন?'

অমনি চরণ আড়ালে সরে পড়ল। বাঙ্গালী আবার বলল, 'আমার 'পরে সবার রাগ। বট্‌ঠাকুরও আজ রাগ করেছে আমার 'পরে। পাননাথ দাদা কথাটি কাটলে না মুখে। ঠাকুর, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমি ভার।' পাননাথ মানে প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ তার আসে না মুখে।

ভজন বলল, 'তুই যে দর্শন আওড়াতে আরম্ভ করলি বাঙ্গালী। বট্‌ঠাকুরের শরীরে কোনদিন রাগ দেখেছিস্? ব্যাটা খালি পেটে তাড়ি গিলেছিস্। কিছু খাবি?'

এত শীতেও বুক খোলা নীল কুর্তার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীর পিঠে ঠেকা পেটটা দেখা যায়। সেই ভোরবেলা কিছু ভাত খেয়ে বেরিয়েছিল। খাওয়ার কথা শুনে, পেটের নাড়ী থেকে যেন একটা রসের ধারা তার চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। বলল, 'খাব ঠাকুর। ভেবেছিলাম, মেয়ে পাড়ায় যাব লবার বউয়ের কাছে। তাও ওর দেয়া খাবার গিলতে বড় গলায় লাগে। পারিনে।'

ভুনু এল। যেন গন্ধে গন্ধে আসে। এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। গাড়ীর মনে গাড়ী পড়ে আছে, ঘোড়ার মনে ঘোড়া। কোন কোনদিন দেখা যায় ভুনু মোটেই আসে না। ঘোড়া দুটো আপনি আপনি ট্যাকস্ ট্যাকস্ করে আস্তাবলের কাছে গিয়ে নাকের ভেতর দিয়ে সড়সড় ক'রে ডাকে, ঠুক্ ঠুক্ ক'রে পা ঠোকে। অর্থাৎ, রাজারাণী আমরা এসেছি, আমাদের ঘরে তোল। ভুনু না থাকলে মনিয়া ঘরে তুলে নিয়ে যায়।

ভজন বলল, 'এসেছ, বাবা সারথি। এবার ওই ভগবানের জীব রাজারাণীকে ছেড়ে কেটে পড় না কোথাও। এমনি ক'রে আর কতদিন চালাবে?'

ভুনু হাসে না ভেংচায় ঠিক বোঝা যায় না। একটা হুঁ দিয়ে সে বসে পড়ে বাঙ্গালীর পাশে। তারপর রাত হয়। তারা তিনজনে বসে শেষবারের মত নেশা করে। চরণ মনে মনে রাগ ক'রে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে থাকে মাঝের ঘরটায়। রাগের থেকে কখন তার মনে অন্যান্য নানান্ কথা এসে ভিড় করে। তখন সে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে থাকে।

যাওয়ার আগে বাঙ্গালী বলল, 'ঠাকুর, গান্ধীজী নাকি আবার নড়াইয়ে নামবে?'

ভজু জবাব দিল, 'নড়াই কি ওয়ার তা জানিনে। তবে, একটা কিছু ঘটতে পারে। কেন বলতো?'

'না, বলছিলুম, আমাদের রুজি টুজির কিছু....'

'তুই ব্যাটা গাড়োল। রুজির বাড়া স্বরাজ। তা' না ব্যাটা রুজির কথা ভাবছে।'.......

পুলিশ অফিসার সাইকেলে যেতে যেতে একবার দেখে নিল তিনজনকে। অন্যমনস্কভাবে হ্যান্ডেলে ঠোকা দিতে দিতে সে গজলের সুর আওড়াচ্ছিল। বন্ধ হ'য়ে গেল। ওই বাঙ্গালী লোকটাকে এখানে আসা বন্ধ না করলে চলছে না! আর ওই গাড়োয়ানটার লাইসেন্সটা বাতিল করতে হবে কোন অজুহাতে। আর তার কথা মত কর্তৃপক্ষ যদি শ্রীমতী কাফেটা উঠিয়ে দেয়, তবে তো কথাই নেই। তবু কথা আছে। কথা দু' চারদিন বাদেই শোনা যাবে। কে জানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীজী কি সিদ্ধান্ত নেবেন। আবার মারামারি আর হট্টগোল।.......গান্ধীজী! মনে হ'লেই দেশ থেকে আসা স্ত্রীর অভিযোগপূর্ণ আদরের এবং ভালোবাসার চিঠিগুলির কথা মনে পড়ে যায়, 'বিশ্রী তোমার চাকরি। মানুষকে মার দেওয়া আর জেল খাটানো তোমার কাজ। হ্যাট পরা তোমার চেহারাটা ভাবলে আমার কি রকম ভয় হয়। আমার সইয়েরা আমাকে ঠাট্টা করে। তোমার জন্য রুমালে একটা ফুল তুলেছি। লিখেছি, 'ভা—লো—বা—সা।' কবে তুমি আসবে।'.....

মনে হল সাইকেলের চেনটা ঢিলে হ'য়ে গিয়েছে। চলতে চাইছে না। সত্যি কবে সে যাবে! যা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে আগামী একটা বছরে ছুটির কথা হয় তো তোলাই যাবে না।

পরের দিন শেষ রাত্রি। একটু হাওয়া বইছে। শীত কমে আসছে। আসছে বসন্ত। আকাশে একখণ্ড চাঁদ। যেন হিমে ভিজে গিয়েছে।

ভজনের শোবার ঘরের দরজায় করাঘাত পড়ল। 'ভজু......ভজন।'

এক ডাকেই হকচকিয়ে উঠে বসল যুঁই। ভাসুর ঠাকুর ডাকছেন। ডাকছেন ওকে। পুলিশ এল নাকি? সে ভজনকে ডেকে উঠিয়ে দিল, 'শুনছ। ওঠ, তোমাকে ডাকছেন ভাসুর ঠাকুর।'

ভাসুর ঠাকুর! মানে দাদা। ভজন এসে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। পেছনে যুঁই।

সামনে দাঁড়িয়ে নারায়ণ। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগের ঝোলা। পশ্চিমে হেলে পড়া চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে। পড়েছে ভজনের মুখেও। অন্ধকারে যুঁইয়ের মুখ। তাই ঘোমটা দেওয়ার দরকার হয়নি।

নারায়ণের মুখে সেই হাসি। অনাবিল অথচ সম্পূর্ণ। বেদনা ও মধুরতা। পিতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। বললেন, 'ভজু যাচ্ছি ভাই।' আধ ঘুম ভাঙ্গা ভজন হাঁ করে তাকিয়ে রইল, যেন বুঝতেই পারেনি এখনো ব্যাপারটা। বলল, 'যাচ্ছ, কিন্তু কই, রাত্রেও তো একবার বলনি।'

নারায়ণ বললেন, 'বলা যায়নি, এখন বলে গেলুম।'

বলে অন্ধকারে যুঁইয়ের দিকে তাকালেন। বললেন, 'বউমা, এ সংসারের কোন ভার আমি নিতে পারিনি। তার জন্য আমার উপর তুমি যেন রাগ ক'রো না। আমি আর পারিনে এ পথ ছাড়তে।'

কথা বলতে পারছে না যুঁই। বলতে নেই। কিন্তু তার যে চীৎকার করে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে, 'আপনি এমন ক'রে বলবেন না। ছাড়তে হবে না আপনাকে এপথ, ছাড়তে দিতে চাইনে আমরা।'

অন্ধকার থেকে, নারায়ণের পায়ের কাছে চাঁদের আলোয় এসে ঠেকল যুঁইয়ের মাথা। ঘোমটা টানা হয়নি। ঘাড়ের কাছে ভাঙ্গা খোঁপা।

নারায়ণ একটু নড়লেন। চোখে মুহূর্তের জন্য ছায়া ঘনিয়ে এল। বললেন, 'থাক থাক, ওঠ। বলছিলুম, এ বাড়ীতে তুমি মেয়ের মত। নিজেকে একটু দেখো। গৌর নিতাইয়ের ভার তোমারই। বাবা'.....

থামলেন নারায়ণ। ভজন চোখ বুজে আছে চোয়াল চেপে। যুঁইয়ের গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। নারায়ণ আবার বললেন, হেসে, 'বাবাকে তোমাকেই দেখতে হবে যতদিন বেঁচে থাকেন। আর ভজু আর তুমি, তোমরা পরস্পরকে বুঝে চ'লো, বউমা। জানিনে এত ভার নির্লজ্জের মত তোমাকে কেমন ক'রে দিয়ে যাব, কিন্তু ভজনের জন্য দুশ্চিন্তা আমি ছাড়তে পারিনে।' আবার এক মুহূর্ত চুপচাপ। নারায়ণ ডাকলেন, 'ভজু।'

ভজু চোখ খুলল না, কথা বলল না। খালি শব্দ করল, উঁ!

নারায়ণ বললেন, 'বাবাকে আর ডাকলুম না। তুই ভাই আর যাই করিস্, বেঁচে থাকাটাকে অচ্ছেদ্দা করিস্‌নে।'

তারপর হাত দিয়ে ভজনের হাতটা একবার স্পর্শ করে নেমে গেলেন উঠোনে। পাতকো'র ধার দিয়ে গিয়ে খিড়কীর দরজা খুললেন। সেই অল্প শব্দে ভজন চমকে উঠে তাড়াতাড়ি খিড়কীর দরজার কাছে এসে বলল, 'কোথা যাবে এখন দাদা?'

ভজনের ব্যাকুলতা দেখে নারায়ণ মনে মনে ব্যথায় চমকে উঠলেন। বললেন, 'সেকথা পারলে আগেই বলতুম ভজু। যাচ্ছি, দরজাটা বন্ধ ক'রে দে।'

আর একজনের কথা এসময়ে মনে পড়ছিল। যার টাকা ও সোনার অভাব নেই, যার স্বামীও আর দশজনের মতই ভাল, যার আছে নবীনের মত ছেলে, সেই প্রমীলা। জীবনে, মরণের আগে একদিন যে একবার যাবার আমন্ত্রণ করেছে।

তিনি বাইরের আলো আঁধারিতে উধাও হ'য়ে গেলেন। যুঁই এসে দাঁড়াল ভজনের পাশে। সেও তাকিয়ে রইল খোলা দরজা দিয়ে। খানিকক্ষণ পর তাকিয়ে দেখল ভজন তেমনি চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল সারা মুখে রুদ্ধ যন্ত্রণা যেন থমথম করছে।

যুঁই ডাকল, 'ঘরে চল, বাইরে হিম পড়ছে।'

ভজন খালি বলল, 'চল'।

তবু সে দাঁড়িয়ে রইল! যুঁই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতে গিয়ে যেন একটা অনর্থক কান্নার বেগ কিছুতেই রোধ করতে পারল না।

বিকালবেলা। সারাটা দিন ভজন মদ খেয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠফাটা রোদের তৃষ্ণায় ঢোকে ঢোকে জল খাওয়ার মত মদ খেয়েছে। এখন সে উত্থানশক্তি রহিত হ'য়ে পড়ে আছে টেবিলে মাথা দিয়ে। চরণ কয়েকবার বলেছে বাড়ী যাবার জন্য। ধমকানি খেয়ে পেছিয়ে এসেছে। বারকয়েক টেবিলের থেকে ঝুলে পড়া মাথাটা তুলে দিয়েছে।

এমন সময় এল হীরেন। সে যথেষ্ট চাপা মানুষ। তবু তার সারা চোখে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে। সে যাচ্ছে ঝাড়ুদার বস্তিতে। কথাটা ভজনকে বলা ছিল। আর একবার ব'লে যাওয়ার জন্য এসেছিল। দেখল একেবারে মাতাল হ'য়ে পড়ে আছে।

রাগ হল না। হাসল হীরেন! ভালবাসার হাসি। সে পথ দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। সে যেন কোন মহতী সভায় চলেছে, যেন যুদ্ধ জয় করতে চলেছে এমনি একটা মনের ভাব। তার আনন্দ হচ্ছে।

পথে কত লোক। এ দেশেরই লোক। নানান ধান্দায় এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন কেউ কাউকে চেনে না। কিন্তু সবাই সবাইকে চেনে। হীরেন চেনে। নাম জানে না, মুখ চেনে না, তবু চেনে। সে ভালবেসেছে সবাইকে। দেশের সব মানুষকে। সেজন্য সে প্রাণটাও দিতে পারে। প্রাণটা হাতের মুঠোয় এনে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে। সে আজ সবই পারে।

সে চলেছে ঝাড়ুদার বস্তিতে। সেখানে আছে অনেকে। অনেকে আর রামা। আজ সকালেও সে এসেছিল। জানিয়ে গিয়েছে, সব আয়োজনের ভার নিয়েছে সে। একদিন এ দেশের ভার নেবে সে। হীরেন তারই সৃষ্টির পেছনে পেছনে, তারই হাত ধরে এগুবে! দ্বিধা নেই, লজ্জা নেই সেকথা মনের কাছে স্বীকার করতে। গঙ্গার ধার থেকে অনেকটা উঁচুতে মাঠ। দীর্ঘ মাঠের এক প্রান্তে ওই যে দেখা যায়, পুবে পশ্চিমে লম্বালম্বি খোলার চালা। কাল্‌চে খোয়া, গঙ্গা মাটির প্রলেপ দেওয়া ছিটেবেড়ার দেয়াল। মানুষের মূর্তি দেখা যাচ্ছে কতকগুলি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। হীরেন এসে দাঁড়াল সেখানে। দু' তিনটে কুকুর একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল। কয়েকবার দেখলেও আজও ওরা ঠিক চিনে উঠতে পারেনি হীরেনকে।

ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা শুয়োরের ছানা ধাড়ির পেছনে পেছনে। বাঁশের কঞ্চির আঁশ ছড়িয়ে আছে পিটুলি গাছটার তলা জুড়ে।

হীরেনকে দেখে প্রায় সবাই বেরিয়ে এল। একটা কোলাহল পড়ে গেল, 'আ'গিয়া বাবুজী, আ'গিয়া। চলিয়ে বাবু, অন্দর মে।'

অর্থাৎ ভেতরের উঠোনে। কিন্তু থম্‌কে গেল হীরেন। যেন মনে হ'চ্ছে এরা কম বেশী সকলেই বেসামাল। সকলেই ইতিমধ্যে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে উঠেছে। মুখে তারই গন্ধ বেরুচ্ছে।

এমন সময় ভেতরে ঢোকার গলির মুখের কাছে এসে দাঁড়াল রামা। ডাকল, 'বাবুজী!'

বাতাস লাগল হীরেনের বদ্ধ প্রাণে। সে সাহস পেল। দেখল, রামা হাসছে! তার সারা চোখে মুখে উদ্দীপনা, উত্তেজনা। উচ্ছ্বাস উজ্জ্বল চোখ একটু লালচে আভায় চক্‌মকানো ছুরির মত ধারালো। ফর্সা মোটা কাপড় পরেছে ঘাগরার মত কুঁচিয়ে। আঁচল বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধেছে কোমরে। গায়ে দিয়েছে সস্তা ছিটের নীল জামা। তাতে নক্ষত্রের মত হলদে রং-এর বিন্দু। তেল দেওয়া আঁচড়ানো চুল চক্‌চক্ করছে। চক্‌চক্ করছে মুখ।

রামা ডাকল, 'আইয়ে বাবুজী।'

সমস্বরে ধ্বনি উঠল, 'আইয়ে বাবুজী।'

ঝাড়ুদার বস্তির সর্দার সকলের আগে, হীরেনের পাশে পাশে এসে ঢুকল।

দেখা গেল উঠোনটি গোময় দিয়ে লেপা। চারদিক ঝকমক করছে। মাঝখানে কলাপাতার উপর খাবারে ঢাকা দেওয়া রয়েছে, শালপাতা। কেবল হীরেনের জন্য রয়েছে একখানি আসন পাতা।

ঘরের থেকে বেরিয়ে এল মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা। যারা বসেছিল উঠোনে, তারা সবাই সরে বসল। সকলেই বলাবলি করছে, হাসাহাসি করছে। হাসি কলরব, সবই উৎসবের।

ন্যাংটো কালো কালো কতকগুলি ছেলেমেয়ে গোল গোল চোখে একবার দেখছে খাবারের দিকে, আর একবার হীরেনের দিকে। বোধহয়, ভাবছে এতগুলি খাবার এই আজব লোকটার পক্ষে কি ক'রে খাওয়া সম্ভব।

রামা ব্যস্ত হ'য়ে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে। লম্ফ খুঁজছে, বাতি জ্বালতে হবে। তার পেছনে পেছনে ঘুরছে সেই ছোকরা ঝাড়ুদার! আর থেকে থেকে খিল খিল ক'রে হেসে উঠছে রামা। সে হাসি যত তীব্র, তত মধুর। যত ভয়ের, তত সুখের।

একজায়গায় বসেছে মেয়েরা দল বেঁধে। গোল হ'য়ে বসেছে পুরুষেরা। এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে বাচ্চাগুলি। কিন্তু কি আশ্চর্য! সকলের চোখগুলি ঘোলাটে। সকলেরই কেমন একটা দোলানি। সকলেই যা তা বলাবলি করছে। বলছে, বাবু গান্ধী বাবা কা চেলা। দেওতা হুকুম দিয়া বাবুকো, অচ্ছুত কো উঠা লেও আপনা গদীমে। বাবুজী ব্রাহ্মণ হ্যায়, একদম খাঁটি। তাই নিয়ে বিতর্ক, বিবাদ, কোলাহল। একটা শুয়োর ঢুকেছিল উঠোনে। কে তাড়া করে গেল।

হীরেন বসেছে আসনে। তার পাশে বসেছে সর্দার। বাতি জ্বলছে কয়েকটা। কিন্তু তার মনের আনন্দ যেন অনেকখানি থতিয়ে গিয়েছে। সে দেখল, রামা তার পাশে এসেছে আর কেবলি হাসছে। হাসিতে ঢলে ঢলে পড়ছে। কয়েকবার তার হাত ধরে টেনেছে ওই ছোকরা ঝাড়ুদার।

হীরেন অনেক কিছু বলবে ভেবেছিল। কিন্তু কাকে বলবে। শোনবার মত অবস্থা কারুর আর আছে ব'লে মনে হল না।

সর্দার হাত তুলে গোলমাল থামাল। ঢাকনা খুলে দিল খাবারের। সবই প্রায় দোকানের কেনা খাবার। কেবল হাতে তৈরী কিছু মোটা আটার রুটি, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ আর লঙ্কার আচার। এক কোণে কিছু ভাত।

সর্দার হাত জোড় ক'রে বলল, 'বাবুজী হামরা গোস্তাকি না লিজীয়ে। কিরপা করকে আপ ভোজন কিজীয়ে।'

হীরেন সকলের দিকে তাকাল। সকলেই তার দিকে উদগ্র চোখে তাকিয়ে আছে। যেন কি এক অসম্ভব ঘটনা ঘটতে চলেছে। না, একটুও ঘৃণা করছে না হীরেনের। তবু আনন্দের থেকে বেদনার ভার বেশী হয়েছে। তার চোখের সামনে ভাসছে একজনের মুখ! বিষণ্ণ, ব্যথিত, চিন্তিত সে মুখ গান্ধীজীর। তার চোখের সামনে ভাসছে বিশ্বমানবের মুক্তিদাতা গৌতম বুদ্ধের করুণ হাসি ভরা মুখ।

সামনে কতকগুলি কালো কালো ধুলো মাখা মুখ। ঘোলাটে বোকাটে চাউনি লম্ফর আলোয় দেখা যাচ্ছে আধ ল্যাংটো কতকগুলি আধা মানুষ।

হীরেন সর্দারের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'খাব ভাই। গান্ধীজী তোমাদের নমস্কার দিয়েছেন, আমিও দিই।' ব'লে সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'দরিদ্র নারায়ণো কো চরণো মে।'

'এস ভাই আমরা সকলে একত্র খাই।'

ব'লে সে হাত বাড়ালো। কিন্তু আর সবাই দ্বিধা করছে। সকলেই বসে আছে আড়ষ্ট হ'য়ে। মুখ চাওয়াচায়ি করছে পরস্পরের।

হীরেন বলল, 'কই, এস সব।'

সবাই একটু একটু এগিয়ে এল। সর্দার বলল, 'হাত লাগাও খাও সব বাবুকো সাথ।'

ব'লে সে নিজেও হাত দিতেই সকলের হাত এসে পড়ল। খাওয়া শুরু হল, ব্যস্ততা দেখা দিল, একটা ঠেলাঠেলি লাগল খাবারের দিকে এগুবার জন্য।

সকলেই হাসাহাসি করছে, কথা বলছে।

হীরেনের পাশ থেকে রামা হেসে উঠল খিল খিল করে, সর্বাঙ্গ দুলিয়ে। হীরেন তাকিয়ে

দেখল, চোখ জ্বলছে রামার। রামার চোখ লাল। খসে পড়ছে আঁচল, এলিয়ে পড়ছে চুল। আর হাসছে তীব্র মধুর গলায়।

ভয়ে কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল হীরেনের। ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠল বুকের মধ্যে। তাড়ি খেয়েছে, নেশা করেছে আজকে রামা। সে দেখল, হাসির দমকে জ্বলছে একখণ্ড অঙ্গারের মত, এ তার সেই রামা নয়। এ যে নটজাতীয় উচ্ছৃঙ্খলা এক মেয়ে। যার রক্তের ধমনীতে, কোষে কোষে বেদিয়া নটদের সর্বনেশে রক্তধারা টগবগ ক'রে ফুটছে। ভার বইতে পারছে না শরীরের, টলে টলে পড়ছে। বাঁধন মানছে না দেহের, সে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে আর পেছনে যেন সেঁটে আছে সেই ছোকরা। ছোকরা মত্ত, উন্মত্ত।

ভয়ে ব্যথায় আড়ষ্ট হ'য়ে গেল হীরেন। সে দেখল, একটা হট্টগোল লেগে গিয়েছে সারা উঠোনময়। আশ্চর্য। দেখা গেল, সেখানে হঠাৎ কয়েকটা ভাঁড় দেখা যাচ্ছে। নির্বিবাদে পান করছে সবাই। পান করছে মেয়েরা। একেবারে বেমালুম হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আধবয়সী একজন উঠে দাঁড়িয়ে রক্ত চোখে হীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবুজী, ভগবান আপ্‌কা ভালা করে। গান্ধীবাবাকো পাশ আপ হামরা আপিল লে যাইয়ে, উনকো বাতাইয়ে, হামরা মিনস্‌পিল কি কমোশনার বাবুলোগ চুতিয়া হ্যায়। উঁ চুতিয়ানন্দন হ্যায়।'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পুরুষদের মধ্যে অনেক চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁ উ লোগ ডাকু হ্যায়। হমারা তন্‌খা কাট লিতা। জায়দা খাটাতা আইন নাহি মান্‌তা লোগ্।'

হীরেনের চেতনা অবশ হ'য়ে এল। বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেল সে। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ পেড়ে বসছে কেন লোকগুলি। পরমুহূর্তেই মনে হল বলবেই তো। কিন্তু এ ক্ষিপ্ততা কেন, এ কুৎসিত গালাগাল কেন?

সে তাকাল সর্দারের দিকে। সর্দার দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে ধম্‌কে উঠল, 'এই, চুপ রহো সব। তুলোগ্‌কো সরম নাহি লাগতা। খানা পিনাকা আসর মে তু লোগ্ চিল্লাতা।'

একজন ব'লে উঠল, 'গল্‌তি হো গিয়া সর্দার। হম বাবুকো পাশ আপিল করতা। মগর' ....কে একজন হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল। ঝগড়া লেগে গেল হঠাৎ মেয়েদের মধ্যে কি একটা কারণে।

রামা হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল, 'চুপ রহো সব।'

চুপ হ'ল সব। তাকিয়ে দেখল, আলুথালু বেশে, জ্বলন্ত চোখে বাঘিনীর মত ওত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রামা।

সে মূর্তি দেখে একটু আশ্বস্ত হ'ল হীরেন কিন্তু সারা অন্তর তার যেন অপমানে পুড়ে গেল। সর্বনেশে নট মেয়ের এ আর এক রূপ। কিন্তু হিংস্রতা সে দেখতে চায়নি। এ যে অপরূপ নয়, এ যে বীভৎস, ভয়াবহ।

সেই ছোকরা উঠে হঠাৎ এ স্তব্ধতার মধ্যে ব'লে উঠল, 'বাবুজী আপ হুকুম দিজীয়ে, হম রামাকো সাদী করেগা।'

সাদী? কেউ বলল হাঁ, কেউ বলল, না। আবার গণ্ডগোল। হীরেনের বুকের মধ্যে যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ল। কথা কিছুতেই সরছে না তার মুখ থেকে। আর আশ্চর্য, রামা আবার হাসছে। বুঝি বিয়ের কথা শুনেই হাসছে।

একজন টলতে টলতে এগিয়ে এল হীরেনের দিকে। হাতে তাড়ির ভাঁড়। ব'সে পড়ে বলল, 'বাবুজী আপ পিলিয়ে। ইলোগ্‌কো বাত ছোড়িয়ে।'

তার পেছনে আর একজন এল। আরও একজন। হীরেন আতঙ্কবোধ করল। এ কোথায় এসে পড়েছে সে। এরা কারা? এরা তো সেই শান্ত ঝাড়ুদারও নয়। সে উৎকণ্ঠায় ত্রাসে রাগে বলে উঠল, 'এসব কি বলছ তোমরা।'

লোকগুলি অচেতন উন্মাদ। চোখ বুজে ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'হাঁ বাবু, এ হ্যায় আদত। হমারা জাতকে আদত, সচ্ মহারাজ। রাজা হো, পরধান হো, হমারা সাথ্ পি'তা' বলে, একজন ভাঁড়টা তুলে ধরল হীরেনের মুখের কাছে। ঠিক এই মুহূর্তে রামা বাঘিনীর মতই লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিল চড় ঘুষি বসাল পাগলিনীর মত। 'কমিনা শুয়ার কো বাচ্চা, বাবুজী কো বে-ইজ্জৎ করতা তু।'

কিন্তু নেশায় মত্ত লোকটা সে মার গ্রাহ্যই করল না। হড়হড় করে ঢেলে দিল তাড়ি হীরেনের সর্বাঙ্গে।

হীরেন প্রায় প্রাণভয়ে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে উঠে পড়ল। কিন্তু তাকে কেউ-ই লক্ষ্য করল না। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বস্তির ভিতর থেকে বাইরে এসে পড়ল। অপমানে বেদনায় সে পাগলের মত মাঠের উপর দিয়ে চলল। অসহ্য কান্নায় তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। সামনে অন্ধকার, চোখ দৃষ্টিহীন হ'য়ে গিয়েছে। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল তার দেবতার মূর্তি। এ কি করলে তুমি? এ কি হল? আমাকে মরতে হবে, আমাকে আত্মঘাতী হ'তে হবে। ভগবান আমাকে মৃত্যু দাও।

পেছন থেকে একটা চীৎকার ভেসে আসছে, 'বাবুজী...বাবুজী...।'

না, আর কোনদিন ওই ডাকে সাড়া দেওয়া যাবে না। এ মুখ দেখানো যাবে না। সে অক্ষম, সে দুর্বল, সে ভীরু, সে ভিক্ষুক, সে অপমানিত। তবু, হে ভগবান, আমি চাইনি পাপ করতে। তবে কোথায় আমি ভুল করেছিলুম, আমি কি বোঝাতে পারিনি!

'বাবুজী...বা—বুজী!' প্রাণপণে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে রামা। একলা আলুথালু বেশে, চোখের জলে অন্ধ হ'য়ে।

'না না, ডেকো না।' হীরেন ছুটে চলেছে উর্ধ্বশ্বাসে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে সে। 'মরণ, আমাকে তুমি নাও, আমাকে নাও।'

'বাবুজী....বাবুজী।' ...ছুটতে ছুটতে এসে রামা আছড়ে পড়ল হীরেনের পা'য়ের কাছে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তার হাঁটু। পায়ে মুখ চেপে বারবার বলতে লাগল, 'বাবুজী....বাবুজী....হমার বাবুজী!'...

গতিরুদ্ধ হ'য়ে হীরেন দু'হাতে মুখ চেপে কেঁদে উঠল।

অন্ধকার মাঠ। ওই দূরে গঙ্গা। আকাশে ঝিকমিক করছে তারা।

'বাবুজী।' নির্ভয়ে অসঙ্কোচে হীরেনকে লতার মত জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল রামা। কেঁদে উঠল হা হা ক'রে। 'বাবুজী হমারা গোস্তাকি.....হমারা। হমকো পিটিয়ে, গালি বকিয়ে। বাবুজী হমকো লে চলিয়ে আপকো সাথ। হম এঁহা নহি রহেগা......নহি......।'

হীরেনের বুকের মধ্যে থরথর ক'রে কাঁপছে। রামার তপ্ত আলিঙ্গন, নিঃশ্বাসের আগুন পুড়িয়ে দিল তার সর্বাঙ্গ। সে ভয়ে বিস্ময়ে চোখ নামাল। অন্ধকারেও দেখতে পেল, তার মুখের সামনে রামার ঠোঁট, জলে ভেজা চোখ, রামার সর্বাঙ্গ।

শিউরে উঠল হীরেন। এই তো মৃত্যু। মৃত্যু তার বক্ষলগ্ন। কিন্তু সে এত ভীষণ, এত ভয়ঙ্কর! না না, মরতে সে চায় না। মরতে সে পারবে না।

দু হাতে সে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিল। 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও রামা। যেতে দাও, আমাকে মুক্তি দাও।'.....নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে আবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল।

রামা ডুকরে উঠল, 'বাবুজী।'....

তারপর সেইখানে বসে পড়ে মাটিতে মুখ দিয়ে কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

একটু পরেই অন্ধকারে একটা যোয়ান মূর্তি এসে দাঁড়াল সেখানে। সেই ছোকরা ঝাড়ুদার। হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে টেনে তুলল রামাকে। রামা জোর করল না। সে তাকে টেনে তুলে দাঁড় করাল। কোন কথা না ব'লে তাকে আস্তে নিয়ে চলল বস্তির দিকে। কেবল একবার সে ফিরে তাকাল পিছন দিকে। চোখদুটো জ্বলছে বন্য শ্বাপদের মত।

হীরেন রাবিশ মাড়িয়ে নর্দমা পেরিয়ে শ্রীমতী কাফের পেছন দরজা দিয়ে ঢুকল। সামনে দিয়ে আসতে পারেনি সে। এ মুখ সে দেখাতে পারেনি।

চরণ উনুনের পাশে চা তৈরী করতে করতে চমকে উঠল। চল্‌কে গেল গরম জল। বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ সে। হীরেনের এলোমেলো চুল, বুক খোলা জামা, যেন ঝোড়ো পাখী। সারা গায়ের থেকে ভক্‌ভক্‌ ক'রে বেরুচ্ছে ট'কো তাড়ির গন্ধ। এসে উদভ্রান্তের মত বলল, 'চরণ, ভজুকে একবার ডেকে দাও।' চরণ তাড়াতাড়ি ভজনকে ডেকে নিয়ে এল। ভজন এখনো নেশায় টলমল করছে। এসে বলল, 'কি বাবা, তুমি টেররিষ্টের দলে ভিড়লে?'

কিন্তু কথা তার শেষ হওয়ার আগেই হীরেনের দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেল। জোর ক'রে চোখ মেলে বলল, 'কিরে কি হয়েছে তোর?'

লজ্জা, অপমান, ঘৃণা, হীরেন কিছুই মানল না। সে ভজুর দু' হাত ধরে ছেলেমানুষের মত হু হু ক'রে কেঁদে উঠল। টেনে নিয়ে এল ভজুকে মাঝের ঘরে। হ্যাঁ, ভজনের কাছেই একমাত্র এমনি ক'রে কাঁদা যায়। কৃপাল নয় শঙ্করদা নয়, কেউ নয়।

ভজু উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বলল, 'কিরে, মারধোর খেয়েছিস্‌ নাকি কোথাও?'

হীরেন ব'লে উঠল, 'না, না।'

'তবে?'

হীরেন বলল, 'ভজু, মদ খেলে কি হয়?'

ভজন বলল, 'কেন রে?'

হীরেন বলল, 'বুক জ্বলে? বুদ্ধি হারায়?'

বিস্মিত হ'য়ে ভজু বলল, 'বুদ্ধি হারায় কি জানিনে। তবে বুক জ্বলে, তারপর নেশা হয়। কিন্তু কেন রে?'

হীরেন ব্যাকুল গলায় ব'লে উঠল, 'কিছু নয়। আমাকে একটু মদ দে ভাই.......দে আমাকে। আমি একটু নেশা করব।'

'আমাকে দেখছি ফ্যাসাদে ফেলবি।'

'না, না, ভজু ভাই, একটু দে।'

ভজন তার সেই কটা চোখের তীব্র চাউনি দিয়ে একবার হীরেনের সর্বাঙ্গ দেখল। হীরেন কেঁপে উঠল সে চাউনি দেখে।

'হুঁ! আচ্ছা দিচ্ছি।' ব'লে ভজন তার খোলা বোতল থেকে মদ ঢেলে দিল গ্লাসে।

হীরেন এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বিকৃত মুখে চোঁ চোঁ ক'রে গিলে ফেলল মদ। তারপর দু'হাতে মাথাটা ধরে ব'সে পড়ল সেখানেই।

ভজন খালি বলল, 'অবাক করলি হীরেন।'

বাইরে ট্যাং ট্যাং ক'রে ক্যানেস্তারা বেজে উঠল। কৃপাল বেরিয়েছে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে। চেঁচাচ্ছে, 'ভোট ফর সারদা চৌধুরী!'

একদল খদ্দের মেতে উঠেছে গোলক চাটুজ্জেমশাইকে নিয়ে।

বিস্ময়ে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করছে ছোকরা পুলিশ অফিসার। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখছে শ্রীমতী কাফের দিকে। এখানে সেখানে ঘাপটি মেরে রয়েছে গুপ্তচরেরা। কোথায় সে। সেই পাখী কোথায় উড়ে গেল। কোন্‌দিকে। অর্থাৎ নারায়ণকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ আসেনি প্রিয়নাথ, রথীন, সুনির্মলেরা।

রাত্রি এগারোটার পর হীরেন বেরিয়ে এল পেছনের ঘর থেকে। ভজনের কথা মত ভুনু তুলে নিল তাকে গাড়ীতে বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এখন যেমন ভুনুর অবস্থা, তেমনি তার রাজা-রাণীর। চলেছে ঠুক্ ঠুক্ ক'রে। আর বিস্মিত বিরক্ত হ'য়ে ভুনু ভাবছে, 'এ শালা বাবুগুলোর কি হয়। কেতাব পড়ে, সুতো কাটে আর সারাদিন ব'সে থাকে চা খানায়। মাঝে মাঝে আপদের মত সরাপের দোকানে সরাপ বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চিল্লাচিল্লি শুরু ক'রে দেয়। জেল খাটে। যোয়ান বয়সের মরদ, বাপের পয়সা আছে, বাপু বিয়ে সাদী কর। ঘর আগলাও। তা নয় জিন্দিগী ফালতু কাটাচ্ছে।'

বৃথাই সব করেছে জীবনে? সে কথাই ভাবছিল হীরেন গাড়ীর গায়ে মাথাটা এলিয়ে। তবে কি সবই শেষ হল? এখন লজ্জায় সে কুঁকড়ে যাচ্ছে! কেন সে মদ খেতে গেল? অবিবেচকের মত সে একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে গিয়েছিল, তার শাস্তি তাকে পেতে হয়েছে। সে অনুভব করছে, ওই ঝাড়ুদার মানুষগুলির চরিত্র সে মোটেই বুঝতে পারেনি। সে বুঝতে পারেনি রামার মত মেয়ে-চরিত্রকে। এখনও পারছে না।

তা' বলে কি বিশ্বাস হারাতে হবে? মাথা তুলে বসল হীরেন। না, সে বিশ্বাস হারাবে না। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। গান্ধীজীর কথা মনে পড়ছে তার। অসহিষ্ণু হ'লে তার চলবে না। আজ যারা তাকে লাঞ্ছিত করেছে, তারা ভুল করেছে। এমনি ক'রেই তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে অনাচারের পথ থেকে, দিতে হবে শিক্ষা।

তবে এ লাঞ্ছনার উপর আবার সে কেন মদ খেয়ে তা বাড়াতে গেল। ছি ছি, ভজন না জানি মনে মনে কত কি ভাবছে আর হাসছে। হাসছে চরণ আর ভুনু গাড়োয়ান।

কিন্তু রামার মুখটা যতবার মনে আসছে, ততবার কচি শিশুর মত তার কান্না পাচ্ছে। সে চলে আসতে চেয়েছিল তার সঙ্গে। কোথায় নিয়ে আসবে তাকে হীরেন। তা তো সম্ভব নয়। কিন্তু রামা যদি অনাচারের পথে পাপের পথে ভেসে যায়, দু' চোখ দিয়ে হীরেন তা কেমন ক'রে দেখবে।

মস্তবড় পুরোনো বাড়ীর ফটকের কাছে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বাড়ী তো নয়, অন্ধকারে যেন একটা ভুতুরে পুরী। নিঃশব্দ। বাইরে থেকে মনে হয়, লোক নেই। কিন্তু লোক ঠাসা।

হীরেন নেমে বলল, 'ভুনু কাল তোমার ভাড়াটা নিও।'

'যব্ আপ কা মর্জি।' গাড়ী আলস্যভরে মোড় ঘুরল।

ভোরবেলা যুঁইয়ের ডাকে ভজনের ঘুম ভাঙ্গল। পুলিশ এসেছে খানাতল্লাসীর পরোয়ানা নিয়ে। এসেছে মহকুমা এস. ডি. ও সাহেব। বিলিতি সাহেব।

সারা বাড়ীটা অনুসন্ধান ক'রে পাওয়া গেল শুধু একখানা বই। নজরুলের একখানি কবিতার বই। তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পালা। হালদারমশাই থেকে শুরু করে ছেলে নিতাইকে পর্যন্ত।

যুঁই শুধু জানাল, 'রাত্রেও সে তার ভাসুরকে খেতে দিয়েছে, তিনি খেয়ে শুয়েছিলেন।'

তারপর শ্রীমতী কাফের পালা। ভোর থেকে ঘেরাও হ'য়েছিল প্রহরী দিয়ে। ভজনকে নিয়ে সদলবলে এস-ডি-ও এল খানাতল্লাসীর জন্য। পুলিশ অফিসাররা এসেছে প্রায় সারা মহকুমা ঝেঁটিয়ে। যে সে কথা নয়, স্বয়ং এস-ডি-ও এসেছে।

অন্যান্য এলাকার অফিসারদের চক্ষুশূল হয়ে এখানকার ছোকরা অফিসার সাহেবের পাশে পাশে ঘুরে সব দেখাচ্ছে, বোঝাচ্ছে, 'স্যার, এটা একটা সাংঘাতিক ঘাঁটি। কাফে নাম দিয়ে আসলে এটা একটা রাজনৈতিক দলগুলির কেন্দ্র। যদি কিছু মনে না করেন স্যার, এই রেষ্টুরেন্টটা আপনি উঠিয়ে দিন।'

সাহেব পাইপ কামড়ে ধরে একবার বাইরের দিকে তাকাল। রাস্তায় অনেক লোক জমে গিয়েছে! রাস্তায়, ষ্টেশনের রকে। ষ্টেশনের ছাদে ভিড় করেছে ষ্টাফ, এ. এস. এম., টিকেট কালেক্টর, কেরাণীরা। কিন্তু সাহেবকে বাইরের দিকে তাকাতে দেখেই অনেকে মুখ নামাল, মুখ ফেরাল, পাশ ফিরে চলতে আরম্ভ করল।

কিন্তু সাহেব সেসব ভাবছিল না। সে ভেবে দেখছিল ছোকরা অফিসারটির কথা। মনে মনে ভেবে দেখল সে, ঠিক বলেনি অফিসারটি। কাফেটা থাকুক। এটা যদি কেন্দ্রই হয় তা'হলে পুলিশের কাজের সুবিধাই হবে। সে কাফের পেছন দিকে গেল।

লোকের ভিড় হটিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। চেঁচাচ্ছে সেই ডালপুরীওয়ালাটা। পুলিশের সঙ্গে কুটে পাগলা লোকজনকে ঠেলা দিয়ে বলছে, 'যাও, সব বাড়ী যাও। নইলে সাহেব শ্বশুরবাড়ী চালান দেবে।'

কে একজন খবরের কাগজ পড়ছে, 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত। গান্ধীজীর পুনরায় সংগ্রামের আহ্বান। সুভাষ বসুর পাল্টা সরকার গঠনের প্রস্তাব টিকল না।'

আর একজন বলল, 'একটা কিছু হবে।'

শ্রীমতী কাফের দোকান দেখিয়ে জবাবে বলল একজন, 'তারই শুরু হল দেখছি।'

বেরিয়ে এল এস-ডি-ও সদলবলে। কিছুই পাওয়া যায়নি। লোকে বলাবলি করছে, 'হুঁ হুঁ, ভজুলাট ঘুঘু ছেলে বাবা।'

কিন্তু সত্যি, শুরু হল দেশময় একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার। এ অঞ্চলে তল্লাসীর একটা হিড়িক প'ড়ে গেল।

তিন মাসের মধ্যে আরও দু'বার তল্লাসী হ'য়ে গেল ভজনের দোকানে। শ্রীমতী কাফে যেন নিষিদ্ধ এলাকা ব'লে গণ্য হ'য়ে গেল। খদ্দের নেই, বেচা কেনা নেই।

কিন্তু প্রত্যহ ষ্টেশনের দেয়ালে আর গাছে সর্বত্র পোষ্টার পড়তে লাগল।

'সত্যাগ্রহী প্রস্তুত হও।' 'স্বায়ত্তশাসনে আমাদের জন্মগত অধিকার।' 'বিলিতি কাপড় আর মদ ছেড়ে দাও।' 'লবণ আইন ভাঙ্গো।' 'স্কুল কলেজ ছাড়ো, ছাড়ো সরকারি চাকরি।'

কাগজে কাগজে গান্ধীজীর ছবি। মনের মত দলবল নিয়ে দণ্ডি সত্যাগ্রহ ক'রে তিনি চলেছেন সমুদ্রোপকূলে।

চাপা পড়ে গেল এখানকার স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ইলেক্‌শন। মহকুমা কংগ্রেস কমিটি প্রায় প্রত্যহ একবার ক'রে সমবেত হ'তে আরম্ভ করল।

প্রিয়নাথকে বাড়ীতে অন্তরীণ হ'তে হ'ল। রথীন, সুনির্মলও বৈঠকে বসে গেল শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে।

সে মাসে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অবস্থা একেবারে বদলে গেল। হরতাল হ'ল সমস্ত দোকানে। কৃপাল আর শঙ্কর ঘোষ সভা করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হ'লেন।

আশ্চর্য! শ্রীমতী কাফের প্রতি মানুষের ভয় যেন যাদুবলে কেটে গেল। নিষিদ্ধ এলাকা হ'ল প্রসিদ্ধ অবারিত। নিষিদ্ধ কিছু করার জন্য যেন সবাই সুযোগের সন্ধানে লেগে গেল। এমন কি অনেকে ঠাট্টা ক'রে হ'লেও বলতে লাগল, 'এটা স্বদেশী রেষ্টুরেন্ট।'

বাঁকা কথাটাকে সোজা মনে করে নিলে বলা যায় অবস্থাটাও স্বদেশী হয়ে দাঁড়াল। ঘর বার একাকার শতছিদ্র ও শতছিন্ন। আয় কমে গেল আশাতীত রকম।

সমস্ত দেশশুদ্ধ মাতামাতিতে মাততে পারল না ভজন। সে একটা নিছক বোকার মত সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে লাগল। তার নিয়মিত পানের সঙ্গী ভুনু ও বাঙ্গালীর সঙ্গে রোজ সস্তা দামের মদ গিলতে লাগল। অনেক রাত্রের এই আসরে তারা দেশের কথাই বলাবলি করে। তারা যেন একটা মস্ত রঙ্গমঞ্চের অদ্ভুত নাটকের তিনজন দর্শক।

বাঙ্গালীর ভেতরে ভেতরে কি রকম একটা অস্থিরতা। একটা বোবা অস্থিরতা। থেকে থেকে তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। হাতের মুঠি পাকিয়ে ভাবে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা করা দরকার। প্রত্যহ-ই পুলিশের নিদারুণ অত্যাচারের কাহিনী সে শোনে অথচ একটা বিহিতের কথা কেউ বলে না। সে নিজেও জানে না, কোথায় যেতে হবে, কি করলে নিরসন হবে প্রাণের এ যন্ত্রণা, জুড়োবে জ্বালা।

ভুনুরও অবস্থা তাই। তার মনে হচ্ছিল, এ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে একটা খেলাও রয়েছে। এক ছাদের কার্ণিশ থেকে আর ছাদের কার্ণিশে লাফিয়ে যাওয়ার মত ছেলেমানুষি খেলা। হাসি ও আনন্দের মাঝে একটা বিপদের উত্তেজনা, অথচ জেদে পরিপূর্ণ। কেউ ভীত নয়, সবাই যেন উল্লাস ভরে হাসছে। এমনকি, বাবুদের জেনানারাও রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে পুলিশের মুখোমুখি। তাদের গাড়োয়ানদের মধ্যে অনেকে বলাবলি করে এসব বিষয়ে। একটা গল্পের আলোচনার মত।

কিন্তু তাদের কিছুই করবার নেই। কিছু করার নেই অথচ এ দর্শকের ভূমিকাও যেন সহ্য করা যায় না।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ পড়তে পড়তে ভজনের চোখে ভেসে ওঠে দাদার মুখ। হয়তো তিনি সেখানে নেই। তবু ভজনের মনে হয়, দাদা-ই যেন সেখানে লড়াই করছেন।

বোম্বাই শহরের শোলাপুরের মজুরদের লড়াইয়ের কাহিনী একটা অদ্ভুত রূপকথার মত মনে হ'ল তাদের। সে কথা শুনতে শুনতে বাঙ্গালীর চোখ ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ ক'রে জ্বলতে থাকে। এসব কথা তারা বলে, কিন্তু তিনজনে বসে যখন মদ খায়, তখন মনে হয় অসহ্য অবসাদে তারা মাথা গুঁজে পড়ে আছে। উদ্দীপনা ও অবসাদের একটা যুগপৎ লীলা খেলা যেন তাদের ন যযৌ ন তস্থৌ করে দিয়েছে।

চরণেরও যেন কি হয়েছে। তার মুখে কেন যেন ভাতও রোচে না! সে মদ খায় না।

এমনিতেই সে মাতাল হ'য়ে আছে! তারও ইচ্ছে করে সে সভা সমিতিতে চলে যাবে, পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে তাকে। সে চীৎকার ক'রে আকাশ ফাটিয়ে বলবে 'বন্দেমাতরম্।'

গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার। বন্দেমাতরম্! মানে কি কথাটার? জানে না সে। তবুও পেছনের রান্নাঘরের অন্ধকারে একলা ব'সে সে আপন মনে বরাবর বলে বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! মনশ্চক্ষে দেখতে পায়, তার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ-বাহিনী। তাকে শাসাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে, পিটছে সেই ছোকরা পুলিশ অফিসার। আর তার চোখ বড়বড় হ'য়ে ওঠে, গলার শির ফুলে ওঠে, তবু তার ঠোঁট নড়তে থাকে। বলতে থাকে, বন্দেমাতরম্!

এই ভাবনার ঘোরে সে যখন আচ্ছন্ন থাকে তখন মনে হয়, একটা ভূত বসে আছে অন্ধকার ঘরটাতে। মন্ত্র আওড়াচ্ছে বিড়বিড় ক'রে। কিন্তু কেন, সে জানে না। তারপরে তার মনে হয়, সে এবার চীৎকার ক'রে উঠবে। জন্তুর মত, হিংস্র ক্ষিপ্ত হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কারুর উপর। যে তার পথের সামনে দাঁড়াবে, তাকেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে সে।

যুঁই রাত্রে অপেক্ষা ক'রে থাকে রোজ ভজুর জন্যে। যুঁইয়ের একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হ'য়েছে। সে অভাব অনটনের কথা বলে না, বলে সংসারের কথা। সে ভজনের কাছে দাঁড়িয়ে নতুন রূপে। সে ভজনকে চায়। চায় পরিপূর্ণরূপে, নিজের মত ক'রে। ভজনের ব্যক্তিত্বকে মাড়িয়ে, তিরস্কার ক'রে সে নিজের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। তার তিনটি সন্তান হ'য়েছে, আট বছর তার বিয়ে হয়েছে, নিজের অন্তরের বিরুদ্ধে সে আত্মসমর্পণ করেছে ভজুর কাছে। কখনো কখনো প্রতিবাদ ক'রেছে, কিন্তু তার তীব্রতা ছিল না। আচমকা তার হৃদয়ের মোড় ফিরেছে। এতদিন বাদে হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এতদিন তার হৃদয়ের অপূর্ণতায় শুধু বাজছিল বেদনার ধীর লয়। পেয়েও না পাওয়ার বেদনার মাঝে সান্ত্বনার সন্ধান। আজ বেজেছে দীপক রাগিণী। এ বড় অদ্ভুত, বড় বিচিত্র। আজ সে ভজুর কাছে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বুকের মধ্যে তার পুড়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে কোন খালি ঘর আর সে রাখবে না। হয় সে সবটুকু পাবে, পাবে তার কৈশোরের স্বপ্নকে, নয় তো সে পুড়ে মরবে নিজেরই বিদ্রোহের আগুনে।

এ কথা ভাবতে তার মনের মধ্যে কোথায় একটু লজ্জা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, উঁকি দিয়েছিল একটু-বা ভয়। কিন্তু সেসব পুড়ে গেল এক হুঙ্কায়। একবার মনে হয়েছিল, সত্যি, কি তার চাই। কিন্তু সে ধন্দও সে উড়িয়ে দিয়েছে। কিছু চাই যা পাইনি। যা পাইনি, যা না পেলে আর চলে না। মনের মধ্যে আগুন জ্বলেছে তার।

এ আগুন জ্বলার সঙ্গে দেশের বর্তমান আবহাওয়ার কোথাও একটা যোগাযোগ ছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু যুঁই এরকম একটা কথাও চিন্তা করেছে। সেও যাবে স্বদেশী করতে, যাবে জেলে।

কিন্তু সেখানে ভজন নেই। জেল তুচ্ছ, মৃত্যুও কিছুই নয়। কিন্তু ভজন যদি নির্বিকারভাবে তার পথ ছেড়ে দেয়, সে অপমানও যে সহ্য করা যাবে না।

ভজুকে দেখাল সে অপরিসীম অবহেলা। চলতে ফিরতে প্রকট হ'য়ে উঠল তার অশ্রদ্ধা। তার মৌনতা অপমানকর। নিয়ত তার চোখে জ্বলে বিদ্রূপ বহ্নি, ঠোটের কোণে কঠিন নির্বিকার ভাব। ভজনও মনে মনে অবাক হল। কথা বলে জবাব পেল না। যা পেল তা জবাব নয়। এ রূপ সে কোনদিন যুঁইয়ের দেখেনি। অনভ্যস্ত হৃদয় তারও ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল। সে যে জীবনে কতখানি

ব্যর্থ সেটা খানিকটা জানলেও মাথা নোয়ানো তার চরিত্রেও নেই। তবু তার বুকের কয়েকটা হাড় বেঁকে মুচড়ে অষ্টপ্রহর একটা অসহ্য টনটনানি লেগে রইল।

তারা কেউ কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলল না। কিছুদিন ধরে চলল অমীমাংসিত রক্তক্ষয়ের পালা। মাঝখান থেকে লাভ হল, ভজুর যেন জেদের বশে নেশা গেল বেড়ে। বাড়ী আসতে লাগল অর্ধেকের বেশী রাত কাবার ক'রে।

এ সময়ে এখানকার স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্তিমিত ভাবটা কাটিয়ে একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ের মত ভেঙ্গে পড়ল। এ জেলার শ্রেষ্ঠ নেতা নবীন গাঙ্গুলির গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ এল।

সকালবেলার দিকে হীরেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা অগ্রাহ্য ক'রে বেরুল একটা ছোটখাটো মিছিল নিয়ে। গন্তব্য তাদের ডায়মণ্ডহারবার! যত সময় ও দিনই লাগুক তারা পায়ে হেঁটে যাবে বি, টি, রোড ধরে, কলকাতা পেরিয়ে দক্ষিণের সমুদ্রোপকূলে। লবণ তৈরী করতে।

গরমের জন্য স্কুল বসেছে সকালবেলা। সেখানে এমনিতেই ছাত্রদের আসা যাওয়া অনিয়মিত হয়ে উঠেছে।

সকালবেলার দিকেই রথীন হাইস্কুলের ছাত্রদের ধর্মঘট করিয়ে বার ক'রে নিয়ে এল। ওদিকে সুনির্মল মেয়ে স্কুলে ধর্মঘট করলে।

সকালবেলার সদ্য জমে ওঠা বাজার ভেঙ্গে গেল। দোকানগুলি ঝাঁপ বন্ধ করতে আরম্ভ করল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অবস্থাটা এমন হয়ে উঠল যেন, যাদুবলে সমস্ত অঞ্চলটা মেতে উঠল এক নতুন উৎসবে! রাস্তার রাস্তায় লোক, মোড়ে মোড়ে ভিড়, হাসি, হল্লা আর চীৎকার।

ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল ক'রে বেরিয়ে পড়েছে পথে। কাপড়ের দোকানগুলির সামনে এসে তারা বিলাতি কাপড় বয়কটের শ্লোগান দিতে আরম্ভ করল।

ওদিক থেকে আসছে হীরেনের ধীর ও শান্ত মিছিল। তার দলে রয়েছেন সন্তোষ মাসীমা। আরও কয়েকজন মহিলা। একজন মহিলা, হীরেনেরই পাশে পাশে চলেছেন। অপূর্ব সুন্দরী, অল্প বয়স, বিধবা। হীরেনের ভ্রাতৃবধূ। শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত অনুশাসনকে ভেঙ্গে তিনি বেরিয়ে এসেছেন দেওরের সঙ্গে। ভাঙ্গতে চলেছেন বিদেশী সরকারের অনুশাসন। ঘরের আইনকে ভেঙ্গে, রাস্তায় এসে অমান্য করেছেন আর এক আইন। তাঁর সারা চোখে আলোর ছড়াছড়ি। বাইরের শতশত দৃষ্টির সামনে তাঁর মুখে লজ্জার ছাপ পড়েছে। লজ্জা আর হাসির দীপ্তিতে তিনি অপরূপ হ'য়ে উঠেছেন। চোখের দৃষ্টি তাঁর অন্তরাবদ্ধ। থেকে থেকে তাকাচ্ছেন হীরেনের দিকে। তাকাতে গিয়ে তাঁর মুখ লাল হ'য়ে উঠছে। একটা বিচিত্র আবেগে বুক ভরে উঠছে তাঁর। অত্যন্ত নীচু গলায় বলছেন বন্দেমাতরম! মনে মনে বলছেন, হে ভগবান, আমি যেন এমনি চিরকাল ধরে চলি। এ পথ যেন কোনদিন শেষ না হয়। আমি আর কোনদিন ফিরব না। ফিরব না।

হীরেন ব্যাকুল চোখে রাস্তার প্রতিটি মুখের দিকে তাকাচ্ছে। তাকে কি দেখা যাবে! পথের ভিড় ঠেলে আচমকা সেও কি এসে ভিড়বে তার দলে। চলবে সামনের সারিতে।

ঝাড়ুদার বস্তির সেই ঘটনার পরেও সে প্রায় রোজই এসেছে ভজনের দোকানে। অবশ্য আগের চেয়ে অনিয়মিত। কিন্তু রামা আর কোনদিন আসেনি।

এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। যেন হীরেন দেখতে না পায়। কিন্তু হীরেন দেখেছে। বুকের

মধ্যে নিশ্বাস আটকে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে থেকেছে সে। হয় তো আসবে রামা। এখুনি হয়তো তার কানে ঢুকবে সেই মিঠে গলার নমস্তে বাবুজী ধ্বনি। আসুক। এলে সহজ হ'তে পারবে হীরেন। তার সেই দুর্দশার এবং অপমানের ব্যাপারটাকে সে একটা জ্বলন্ত ধারালো ছুরির মত গ্রাস করেছে। তাতে তার দেহের ভিতর ও অন্তর ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গিয়েছে। হরণ করেছে তার শরীরের কমনীয়তা, তার বয়স। সে যেন বুড়িয়ে গিয়েছে।

তবু, সে আসুক। হীরেন তার পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। ত্রুটি করবে না তাকে অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু রামা আসতে পারেনি। তার ভয় ছিল, এমনকি তার চাকরির ও আশ্রয়ের আশঙ্কা পর্যন্ত ছিল। সেই ছোকরা ঝাড়ুদারকে সে ভালবেসেছে। কোন বিয়ের অনুষ্ঠান না ক'রেও তার মিলন হ'য়েছে। কিন্তু একটা অস্বস্তি তাকে অষ্টপ্রহর পীড়ন করছে। সে অস্বস্তি তার বাবুজীকে নিয়ে। সে চেয়েছিল, বাবুজীর কাছে আবার আসবে আগেরই মত। তার প্রাণ চাইছিল, বাবুজীকে বুঝতে, একটা কিছু করতে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা মাঝপথেই ভেঙ্গে গেল। সত্যি, সে নেশা করে মাঝে মাঝে। ওই মরদ ঝাড়ুদারের জন্য প্রাণ তার উন্মুখ হ'য়েছিল কিন্তু তার সঙ্গে ঝাড়ুদারণীর যেন সামান্য হ'লেও অল্প একটু পার্থক্য পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে। সে পুরোপুরি এদিকে আসতে পারল না, না পারল পুরোপুরি অন্যদিকে যেতে। অস্বীকার করবার উপায় নেই, হীরেন তার মনে একটা নতুন ক্ষুধার উদ্রেক করেছিল। সে ক্ষুধা কিসের, কেন, তা সে জানে না।

সত্যি, সে ভিড়ের আড়াল থেকে দেখছিল তার বাবুজীকে। তার ইচ্ছে করছিল, সেও গিয়ে ভিড়ে পড়ে ওই দলে, কিন্তু অত সাহস হল না তার। ভয় হল, বাবুজীকে আর ওই দলের অন্যান্য মেয়েপুরুষকে। মেয়েরা হয় তো সিটিয়ে গিয়ে দূরে সরে যাবেন, ঘৃণা করবেন। ছেলেরা হাসবে। বাবুজী কঠিন মুখটা থাকবেন ফিরিয়ে।

ভাবতে ভাবতে তার চোখে ফোঁটা ফোঁটা জল জমে উঠল। ঝাপসা হয়ে গেল রাস্তা ও জনতা। কেন সে কাঁদছে, সে জানে না। বাবুজীকে হারিয়েছে সে, শুধু সে জন্য নয়। তার মনে হচ্ছে, সে যেন আরও কিছু হারিয়েছে যা আর কোনদিন তার কাছে আসবে না। ওর মরদ নর্দমা সাফ করার বুরুশটা ক্রাচের মত বগলে চেপে খালি বলল, 'নমক বানানে যাতা হ্যায় লোগ।'

'বন্দেমাতরম্..............

হীরেনরা এগিয়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

ওদিকে রথীন ও সুনির্মলেরা কাপড় ও সিগারেটের দোকানে পিকেটিং করছে। বিলাতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব চলেছে রাস্তার উপর। কিছু কাপড় দোকান থেকে এসেছে। জোর ক'রে ছিনিয়ে এনেছে। কেউ কেউ বাড়ী থেকে বোন বউদি ও মায়ের বিলাতি সায়া ব্লাউজ আর শাড়ী নিয়ে এসেছে। ছুঁড়ে ফেলছে রাস্তার আগুনে। কেউ কেউ রাস্তার শুকনো রাবিশও ছুঁড়ে ফেলছে। যেন আগুন নিয়ে খেলায় মেতেছে সবাই। হাসছে, চীৎকার করছে, 'বিলিতি কাপড়, পুড়িয়ে দাও। বিলিতি মাল, ধ্বংস কর।'

বড় রাস্তা থেকে পশ্চিমের রাস্তা ধরে ছাত্র-ছাত্রী যুবক-যুবতীরা ভিড় করছে।

গলি থেকে বড় রাস্তায় এসে পড়েছে দেহোপজীবিনীর দল। তারাও হাসছে, চীৎকার ক'রে বলছে, 'বন্দেমাতরম্!' তারাও তাদের বিলাতি জামাকাপড় ছুঁড়ে ফেলছে রাস্তার আগুনে। তাদের পাশ ঘেঁষে একদল লোক হাসতে হাসতে রসালো খিস্তি জুড়েছে।

ভজন দাঁড়িয়ে আছে বাজারের কাছে, রাস্তার উপর। স্থাণুর মত, বোবার মত, বোধ

করি জড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে সে। সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না, অথচ তার বুকের মধ্যে একটা জ্বালা ধরে গিয়েছে। তার চোখের কোলের অনেকটা জুড়ে কালো দাগ পড়েছে। মুখটা লাল টকটকে। কপালের শিরাগুলি ফুলে-উঠেছে।

ভুনু তার গাড়ীর চালকের গদীর উপর বসে আছে। মস্ত শক্ত লোমশ শরীরটা তার খালি। গোঁফের দুপাশ ছুঁচলো করে পাকানো। গাড়োয়ান হিসেবে তার কিছু করণীয় আছে কিনা, সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ একটা কিছু আজ জরুর ঘটতে চলেছে! জরুর। হয় তো স্বরাজ হ'য়ে যাবে আজ। স্বরাজ, মানে থানা বারিক বিলকুল সাফ হ'য়ে যাবে। সেপাইগুলির বে-ফজুল জুল্‌ম, পাঁচ আইন আদায় বন্ধ হ'য়ে যাবে।

তার গাড়ীর কাছে এসে ভিড় করেছে অন্যান্য গাড়োয়ানরা। তারা ভুনুকে জিজ্ঞেস করছে, সে কিছু বলতে পারে কিনা। সে ওস্তাদ মানুষ, লাটবাবুর সঙ্গে দারু খায়, তার জানা উচিত।

কিন্তু ভুনু কিছুই জানে না। সে গদী থেকে নেমে এল। আফজল বলল, 'ক্যায়া, হমলোগ্ গাড়ী লেকে ঘর চলা যায়েগা?'

ভুনু একমুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'নহি। মগর, হরতাল হো গিয়া তো হামরা ভি হরতাল হ্যায়। সোয়ারী হমলোগ নহি চড়ায়েগা।'

'সওয়ারি।' একটা বুড়ো গাড়োয়ান ভেংচে উঠল। 'সওয়ারি কা ক্যায়া ফোকোট কা পয়সা হ্যায়? উলোগ কাঁহে নিকালেগা ঘর সে। এ হুজ্জোত মে কৌন্ নিকলাতা!'

'হ্যাঁ সচ্, কৌন্ নিক্‌লেগা?'

আর একজন বলে উঠল, 'শালা, ইয়ে হুজ্জোত গাড়ী কো বেকার কর্ দিয়া। না আপনা, না ঘোড়াকা দানাপানি। ক্যায়া, ভুখ রহনে হোগা হমলোগোকো?'

যেন ভুনুকেই তারা কথাটা জিজ্ঞেস করছে। ভুনু নির্বাক। কি বলবে সে ভেবে পাচ্ছে না। সত্যি, তারও ট্যাঁক শূন্য। সওয়ারি আসবে না। যদি আসে তবে হরতাল করা কি ক'রে চলবে। সবাই খাবে কি?

গাড়োয়ানেরা একযোগে সবাই খিস্তি খেউড় আরম্ভ করল এ মাতামাতিকে।

ভুনু বলল, 'তব ক্যায়া তুলোগ মাংতা সিপাই কা জুলুম? বিনা পয়সা মে উলোগকো গাড়ীমে চড়ানে মাংতা? মাংতা পাঁচাইন দেনেকে?'

'নহি মাংতা।' সকলেই বলল।

ভুনু বলল, 'তব? ইয়ে হ্যায় স্বরাজি কা লড়াই। হম্ শুনা, স্বরাজ হোনেসে হামরা তখলিফ মিট যায়েগা।'

সকলেই চুপচাপ। স্বরাজি আর লড়াই দুটো দুর্বোধ্য কথা। তার সঙ্গে একটা আশা। এ কথার কোন জবাব তাদের কারুরই জানা নেই। এমনকি ভুনুরও নয়।

ভাগন আর মনোহর রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সঙ্গী নেই। তারা দুজনে দুটো ছাড়া গরুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কিছুই করার নেই, উপরন্তু নেই পেটে দানা।

লোকাল আর রেলওয়ে পুলিশ একযোগে বেরিয়ে পড়েছে পথে। যেসব এলাকায় গণ্ডগোল নেই, সেখানকার পুলিশও এসেছে। মহকুমা সদর থেকে এসেছে দুজন গোরা সার্জন।

সেই ছোকরা অফিসার সেপাইদের দাঁড় করাচ্ছে। ষ্টেশনের সামনে, তেরাস্তার মোড়ে। যেখানে এসে মিশেছে গঙ্গার পশ্চিমের রাস্তাটা।

এদিকে বহ্নুৎসব লেলিহান শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলছে। কয়েকজন তাদের গায়ের জামা পুড়িয়ে দিল। এমনকি মেয়েরাও বিলিতি কাপড়ের জামা ছেড়ে দিচ্ছে পোড়াবার জন্য। আস্তে আস্তে একটা ক্ষিপ্রতা দেখা দিল। ছাত্ররা অন্যান্য কাপড়ের দোকানে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল। মনিহারি দোকানের বিলিতি মালগুলি তাদের দিকে নজর পড়তে তারা চীৎকার জুড়ে দিল। কয়েকজন ছেলে একটা সিগারেটের দোকান থেকে টেনে নামিয়ে নিল কতকগুলি প্যাকেট। ছুঁড়ে দিল কাপড়ের আগুনে। কিছু ছড়িয়ে পড়ল। সেগুলি কুড়িয়ে নেবার জন্য হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ল কতকগুলি হা-ভাতে ছেলে।

সিগারেটওয়ালা চীৎকার আর কান্না জুড়ে দিল।

মনিহারি দোকানের মাথায় টাঙ্গানো একরাশ বিলিতি খেল্‌না ছিঁড়ে নিয়ে ফেলে দিল আগুনে।

দোকানদার হাত জোড় করছে, পায়ে পড়ছে। কেঁদে উঠে মিনতি করছে।

এদিক দিয়ে বেশ্যাপল্লীতে যাওয়ার গলির মোড়ে ওত পেতে আছে কতকগুলি ওঁচা বদমায়েসের দল। লুটের সন্ধানে ঘুরছে তারা।

ভজন হঠাৎ মাথা তুলল। সিগারেটওয়ালার কান্না শুনে চোখ দুটো জ্বলে উঠল তার। মনে হল, অন্যায় করেছে এরা। মনে হ'তেই দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে সে সেখানে ছুটে এল। এসেই একটা ছেলের হাত চেপে ধরল, 'এ কি করছিস্? কে বলেছে তোকে এসব ছিনিয়ে নিতে?'

খ্যাপা ছেলের দল থম্‌কে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল ভজুলাটকে। লাল টক্‌টকে মুখ, আগুনের মত ধ্বক্‌ধ্বকে বাঘের মত কটা চোখ! নারাণদার ভাই। রগচটা আর মাতাল ভজুলাট! মানুষ নয়, একটা খ্যাপা সিংহ যেন।

ছেলেটা কান্না জুড়ে দিল ভয়ে। বড় বড় কয়েকটি ছেলে বলল, 'বিলিতি মাল যে।'

'বিলিতি মাল যে!' তীক্ষ্ণ গলায় ভজু ব'লে উঠল, 'কিনিস্‌নে বিলিতি মাল। কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে। গরীবের মাল তোরা নষ্ট করবি কেন? নষ্ট করতে হয় পয়সা দিয়ে কর।' বলে সে ছেলেটাকে ছেড়ে দিল।

তারপর সিগারেটওয়ালাকে বলল, 'বন্ধ কর দোকান। ঘুমুচ্ছিলে চাঁদ?'

দোকান বন্ধ হ'তে লাগল। ছেলেরা অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য! ভজুদা'র মত মানুষ এ ব্যাপারে কি ক'রে বাধা দিল। তারা জানত, ভজুলাট একরকম ভাবে তাদেরই দলে। এমনকি ওঁর দোকানে পুলিশের হানা পর্যন্ত হ'য়ে গিয়েছে।

কিন্তু তাদের সাহস ছিল না ভজুলাটের কথার প্রতিবাদ করার! তারা সবাই সরে পড়তে আরম্ভ করল। ভিড়ের মাঝখান থেকে কে একটা ছেলে ব'লে উঠল, 'ভজুলাট, লাটের বাট।'

ভজুলাট মাথা তুলে তাকাল। চকিতের জন্য তার চোখ জোড়া জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তেই হা হা ক'রে হেসে উঠল সে। মনে মনে বলল, 'লাটের বাট নই রে, চাটওয়ালা!' কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ফিক ব্যথা চাড়া দিয়ে উঠল তার।

ইতিমধ্যে রথীন, সুনির্মলেরা এগিয়ে চলেছে বড় রাস্তার দিকে। ওদের পেছনে একটা মস্ত দল। কিন্তু অনেকেই পেছিয়ে পড়েছে! ভীত চোখে দেখছে সামনের দিকে। লাল মুখ আর লাল পাগড়ি।

সুনির্মল যতবার চোখ ফিরিয়েছে, ততবারই একজনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হ'য়ে যাচ্ছে। ছাত্রীদের দলের মধ্যে এক যুবতী। সে শুধু তাকিয়ে দেখছে সুনির্মলকে। কেন? সুনির্মলের মুখ লাল হ'য়ে উঠছে কিন্তু আবার মন ঘুরে যাচ্ছে অন্যদিকে।

রথীন চীৎকার ক'রে বলছে, 'বন্দেমাতরম্'।

উত্তরদিক থেকে আসছে হীরেনের দল। তারাও দেখছে পুলিশ। তবু তারা এগুচ্ছে। তারা এগুবে, তারা পথ পাওয়ার জন্য বসে থাকবে চিরদিন। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে। কিন্তু তারা যাবে।

বিধবা ভ্রাতৃবধূ আরও ঘন হয়ে এসেছেন হীরেনের গায়ে গায়ে। তিনি বলছিলেন মনে মনে, 'কি করবে ওরা আমাদের। আমাদের মেরে ফেলবে? ফেলুক। তবু ঠাকুরপো, আমি পেছুব না। কিন্তু ভগবান, যদি মরতে হয়, আগে যেন আমি মরি।'

অবস্থাটা পরিবর্তন হ'য়ে গেল। উত্তেজনা আর ভয় ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। থম্থমিয়ে উঠেছে আবহাওয়া। একটা বিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্তের থম্থমানি।

বন্দেমাতরম্। গান্ধীজীকি জয়। স্বরাজ চাই...........

থর্থর্ করে কাঁপছে চরণের বুকের মধ্যে। কি করবে সে। সে কি নেমে যাবে। সে কি চীৎকার ক'রে উঠবে বন্দেমাতরম্ বলে। একলা থাকতে পারছে না সে আর। এই ঘরটা কি ভীষণ নিঃশব্দ। কি বিশ্রী রকম জনহীন। কর্তা আসছে না কেন?

কুটে পাগলা পেছনদিকে নর্দমার ধারে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে আর বলছে, 'কইরে শালা, গেলি কোথা? কাল রাত্তিরে খুব ফাঁকি দেওয়া হয়েছিল। আজ না দিলে আর ছাড়ছিনে।'

সাড়া শব্দ না পেয়ে বলল. 'শালা না আমার শালী। হারামজাদী ভয় পেয়েছে।' বলে হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল।

ষ্টেশনের রকে একটি ভীত উৎকণ্ঠিত লোকের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে ভিক্ষে চাইছে একটা ছেলে, 'বাবু, একটা আদলা পয়সা দিন। দিন বাবু। আজকের দিনটাতে একটা আদ্‌লা প'সা দিন।'

পুলিশের সমারোহ দেখে আশেপাশের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে মরছে।

প্রথমেই একজন গোরা সার্জন হীরেনকে ধাক্কা দিল, 'গেট ব্যাক। ডোণ্ড উ নো হান্‌ড্রেড ফরটিফোর? আই ওয়ার্ন ইউ, গেট ব্যাক্।'

বউদির চোখ আগুন জ্বলে উঠল। তিনি একটা হাত ধরলেন হীরেনের। হীরেন হাতটা ছাড়িয়ে নিল। বলল, 'বন্দেমাতরম'। সবাই বলে উঠল, 'বন্দেমাতরম।'

পশ্চিম দিক থেকে একটা ভীষণ চাপ প্রায় হুড়মুড় করে এসে পড়ল সেখানে। 'বন্দেমাতরম।'

গোরা সার্জন চীৎকার ক'রে উঠল, 'আই সে গেট ব্যাক্।'

আরও জোরে শব্দ উঠল, 'বন্দেমাতরম্'। পশ্চিমের ধাক্কাটা এল আরও জোরে। অর্থাৎ যুবক ছাত্রদের ধাক্কা।

হীরেন আবার এগুবার চেষ্টা করতেই, সার্জন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

বউদি দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য, মারমুখ হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'খবরদার গোরা শুয়ার কোথাকার।'

হীরেন ধুলোয় বসেই বলল, 'ছি ছি বউদি, কোন কথা বল না, রাগ ক'রো না।'

'কেন করব না।' বউদি চোখে জল নিয়েই ঝেঁজে উঠলেন, 'শয়তানটা তোমাকে মারবে?'

কিন্তু রথীন সুনির্মলের দল একেবারে পুলিশের গায়ে এসে পড়ল। তারা বসে পড়বার আগেই গোরা সার্জন দুজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। একসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশজন সেপাইয়ের লাঠি পড়ল তাদের উপর। একটা বিকট চীৎকার গোলমাল, হল্লা আর মার চলল।

পশ্চিমের রাস্তা থেকে ঢিল পাটকেল এসে পড়তে লাগল। চীৎকার উঠছে, রথীনদা! সুনির্মলদা! চীৎকার, বন্দেমাতরম্!

এবার পুলিশবাহিনী দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে লাঠি চালাল। হীরেনের দল শান্ত থাকলেও, তাদের উপরেও লাঠি চলল।

একটা হুড়োহুড়ি ধস্তাধস্তি ছুটোছুটি পড়ে গেল। বউদি জড়িয়ে ধরে আছেন হীরেনকে। জীবনে এই তিনি প্রথম লাঠির আঘাত খেয়েছেন তাঁর দেহে। জীবনে এই প্রথম হীরেনকে দু' হাতে সাপটে ধরেছেন। জীবনে এই প্রথম পুরুষের জন্য অসহ্য পীড়ন গা' পেতে নিয়েছেন। কিন্তু হীরেনকে আগলে রেখেছেন। হীরেন ছাড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি ছাড়ছেন না।

একদল লোক হুড়মুড় করে শ্রীমতী কাফেতে ঢুকে পড়ল। সেই ছোকরা অফিসার এবং পুলিশও তার ভেতরে ঢুকেই লাঠি চার্জ করল, কারুর মাথা ফাটল, হাত ভাঙ্গল। কান্না আর চীৎকার।

ঝন্ ঝন্ করে ভেঙ্গে পড়ল শ্রীমতী কাফের সামনের কাঁচের দরজা। উল্টে ফেলে দিল টেবিল চেয়ার। দেয়াল থেকে ভেঙ্গে পড়ল ছবিগুলি লাঠির আঘাতে।

ছোকরা অফিসারের পায়ের কাছে ভেঙ্গে পড়েছে সি, আর, দাশের ছবিটা। সে বিড়বিড় করে পড়ল, 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' তার চোখের সামনে ভাসছে একটা কালো কাপড়ের উপর সাদা সুতো দিয়ে ওই কথাগুলি বড় বড় করে লেখা। এম্ব্রয়ডারি করেছে তার স্ত্রী। তার বউ লিখেচে, 'তোমাকে পুলিশের পোষাকে ভাবলে আমার বড় ভয়.....।' বিরক্ত হল সে। এসব কি ভাবছে।

আজকে সে মাথা তুলে ঢুকেছে এখানে। হঠাৎ হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে সে ঘড়িটার কাঁচ ভেঙ্গে ফেলল। একটা জখমী লোককে আর এক ঘা কষিয়ে পায়ের ধাক্কায় ফেলে দিল ভজুর চেয়ারটা। ওই চেয়ারটার উপর তার বড় রাগ।

একদল লোক পেছনে ঢুকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল। সেপাইরা সেখানে ঢুকেও লাঠি চালাল। ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলল কাপ আর ডিস্। জলের জালা ভেঙ্গে ভেসে গেল রান্নাঘরের কাঁচা মেঝে।

কুটে পাগলা নর্দমায় পড়ে গিয়েছে আরও দুজনের সঙ্গে। সারা গায়ে তাদের পাঁক আর দুর্গন্ধ। তবু কুটে দেখতে চেষ্টা করছিল চরণকে। তার পাগলা চোখে উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা।—'ওই ছোঁড়াটা মার খায়নি তো!'

খেয়েছে। চরণ ঘাড়ে আর হাঁটুতে লাঠি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জলে আর কাদায়। ওঠবার চেষ্টা করছে, পারছে না।

গাড়ীর ঘোড়াগুলি ভয়ে চীৎকার করছে চি হিঁ হিঁ ক'রে। গাড়োয়ানেরা সব উঠে পড়েছে ষ্টেশনের রকের উপর। কিন্তু ভূনু নেই সেখানে।

ভুনু মোড়ের ময়রার দোকানের নর্দমার পাশ থেকে মাথা ফাটা অবস্থায় অচৈতন্য সুনির্মলকে তুলে নিয়েছে কোলে। ঢুকে পড়েছে পশ্চিমের রাস্তায়, বাজারের মধ্যে।

ছড়িয়ে পড়ছে লোকজন এদিকে ওদিকে। পুলিশ দলে দলে গ্রেপ্তার ক'রে সবাইকে গাড়ীতে তুলছে। সুস্থ আর আহত কেউ বাদ যাচ্ছে না। হীরেন, বউদি, সন্তোষ মাসীমা, রথীন, আরও অনেকে অগুণতি। অসংখ্য। এমনকি দুজন বেশ্যাও বাদ যায়নি। তবু পশ্চিমদিকের হিংস্র আক্রমণটা বন্ধ হচ্ছে না। এখনো ঢিল পাটকেল এসে পড়ছে পুলিশের উপর। এসে পড়ছে কোন অদৃশ্য জায়গা থেকে।

আহত হীরেন চীৎকার ক'রে বলবার চেষ্টা করছে, 'কেউ ঢিল মেরো না, আঘাত ক'রো না। এ পথ আমাদের নয়!'

বউদি বলছেন, 'ছেলেগুলোকে মেরে হাড্ডি ভেঙ্গে দিল। যোয়ান ছেলে ওরা, কি ক'রে সইবে?'

হীরেন তাকিয়ে দেখল, বউদির চোখ জ্বলছে একটা বাঘিনীর মত। ব্লাস্তার! সমস্ত কিছু ভেস্তে গেল। কান্না পেল হীরেনের। বুলেটের মত ঢিল এসে পড়ছে পশ্চিমের রাস্তাটা থেকে।

এবার পুলিশ তাড়া করল এই রাস্তায়। একদল ছাত্রকে ধাওয়া ক'রে চলল গঙ্গার ধারের দিকে।

একদল পুলিশ গোরা সার্জনের হুকুমে একটা দীর্ঘ নারকেল গাছে উঠবার চেষ্টা করছে। কোন এক অজানা দুঃসাহসী ওই সুউচ্চ নারকেল গাছের মাথায় পতাকা বেঁধে দিয়েছে। গ্রীষ্মের পোড়া আকাশের গায়ে উড়ছে পতাকা। অধৈর্য হ'য়ে উড়ছে কোন্ এক অসীমে ছুটে যাওয়ার জন্য। সেই পতাকা নামাতে হবে। কিন্তু কোন সেপাই গাছে উঠতে পারছে না। খেপে উঠছে গোরা সার্জন। রাস্তার লোক ধরে গাছে ওঠাতে চাইছে, কেউ উঠছে না।

একটি মহিলা, বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হবে, এসে দাঁড়াল ভুনুর পাশে। সুনির্মলকে দেখিয়ে বলল, 'ইনি কে? বাড়ী কোথায়?'

ছাত্রীরা ব'লে উঠল, 'সুনির্মলদা। আমরা চিনি দিদিমণি। বাড়ী অনেকটা দূরে।'

দিদিমণি বলল, 'ওকে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দাও, কাছে হবে।'

ভুনু বলল, 'বহুত আচ্ছা দিদিমণি।'

পুলিশ সরে গিয়েছে। ফাঁকা হ'য়ে গিয়েছে রাস্তাটা। গাড়োয়ানেরা সব গাড়ী নিয়ে চলে গিয়েছে। কেবল ভুনুর রাজারাণী পরস্পর নাকে নাক ঠেকিয়ে বোধ হয় তাদের অসহায় মনের কথা আদানপ্রদান করছে।

ভজন এসে দাঁড়াল দোকানের বারান্দায়। তাকানো যায় না তার মুখের দিকে। মনে হ'চ্ছে গন্‌গনে আগুনের গোলা দিয়ে একটা মুখের অবয়ব তৈরী করা হয়েছে। সে মুখটা ভজনের। পৃথিবীর কোন দুঃসাহসী বোধ করি এখন তার ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে সামনে বড় দরজার পাল্লাটা ধরল সে। ঠাণ্ডা হ'য়ে এল তার চোখ মুখ। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় নীল হ'য়ে উঠল সে। মুখটা বিকৃত হ'য়ে গেল।

সামনের দরজার বড় পাল্লার কাঁচ নেই। নেই সেই আমন্ত্রণের কথা, 'শ্রীমতী কাফে, ভিতরে আসুন।' জ্যৈষ্ঠ মাসের খরো হাওয়া বইছে তার ফাঁক দিয়ে। ভেঙ্গে প'ড়ে আছে কয়েকটা চেয়ার।

উল্টো সোজা হ'য়ে পড়ে আছে ছবিগুলি। ফেটে গিয়েছে পাথরের টেবিল একটা। ঘড়িটা চল্‌ছে টক্ টক্ ক'রে। ভাঙ্গা কাঁচের এক চিল্‌তে ঝুলছে তার এক পাশে।

ভজন ঘরের মধ্যে ঢুকল। যেন একটা পাগল ঢুকেছে, বহুদিনের পোড়ো বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। সে ডাকল, 'চরোণ!' সাড়া নেই। হয় তো পালিয়েছে। বিশের কথা মনে পড়ে গেল তার।

মাঝের ঘরে ঢুকল সে। বোতল আর কাপ ডিস ভাঙ্গা ছড়িয়ে রয়েছে সারা ঘরটায়। রান্না ঘরে ঢুকে দেখল, কাদার উপরে চরণ বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে। উনুন জ্বলছে। কেতলির ঢাকনাটা ফুটন্ত জলের ধাক্কায় ঠক্‌ঠক্ ক'রে নড়ছে। একটা ক্ষিপ্ত তেজে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাষ্পের গোলা।

ভজু ডাকল, 'চরোণ!'

চরণ ভজুর দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ভজু বলল, 'কিরে, মার খেয়েছিস্? সবাইকে নিয়ে গেল, তোকে নিল না?'

তাকিয়ে দেখল চরণের হাঁটুটা ফুলে কালো হ'য়ে উঠেছে। ফুলে উঠেছে কাঁধটা। কান্না মারের ব্যথার জন্য না কি, পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি, বোঝা গেল না।

ভজন তাকে তুলে এনে শোয়াল বেঞ্চির 'পরে। নরম গলায় স্নেহভরে বলল, 'কাঁদিস্‌নে হারামজাদা। দোকানটা চালু করতে হবে। কুটে পাগলাকে বলে দিচ্ছি দোকানটা সাফ করার জন্য। ডাক্তারের কাছ থেকে এনে দিচ্ছি তোর ওষুধ।' বলে সে সামনের ঘরটায় এসে আবার থম্‌কে দাঁড়াল। দু'একজন ছুটে পালাল দোকানের সামনে থেকে। আশেপাশের কয়েকজন লুকিয়ে দেখতে এসেছিল ব্যাপারটা। ষ্টেশনের রকে কয়েকজন হাঁ ক'রে এদিকে তাকিয়ে আছে।

ভজু বসে পড়ল। ভাঙ্গা চেয়ারের তলা থেকে টেনে টেনে বার করল ছবিগুলি। মুক্ত বাউলের উদাস গভীর চোখ রবীন্দ্রনাথের—কিশোর নবাব সিরাজদ্দৌলার তীব্র কটাক্ষ, ভুবনমোহন যীশু, যুবতী ধরিত্রীর কোলে মানব শিশু—র‍্যাফেলের আঁকা। সি. আর দাশ, নারায়ণ, কচি কচি সবুজ ঘাসে মুখ ঠেকানো রাঙ্গা সাদা গাই।

চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এল ভজনের। হঠাৎ কানে এল কচি গলার ডাক, 'বাবা!'

চমকে উঠল ভজন। ফিরে তাকাল। দেখল গৌরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুঁই! যুঁই এসেছে শ্রীমতী কাফেতে, ভয়ে উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হ'য়ে। ভাঙ্গা শ্রীমতী কাফে।

যুঁই ভেতরে এসে দাঁড়াল। কোনদিকে তাকাল না। কথা ফুটছে না তার গলায়। তবু বলল, 'বাড়ী চল।'

ভজন তাকাল যুঁইয়ের মুখের দিকে! এখনো যুঁইয়ের মুখে সেই কাঠিন্য। তবু নিজে না এসে পারেনি। এখনো তার মুখে মনান্তরের উদাসীনতা।

তবু যুঁই দাঁড়িয়ে রইল! আশপাশের লোকেরা আর কৌতূহল চাপতে পারল না। কেউ কেউ সমবেদনা জানাবার জন্যও রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

যুঁই বলল, 'তোমাকে ডাকতে এসেছি আমি।'

'বুঝেছি।' ভজু বলল, 'আমি পরে যাব, তুমি যাও।' সে উঠে দাঁড়াল।

যুঁইয়ের বুক ফুলে উঠল। বাধা মানল না চোখের জল। গলা ভেঙ্গে এল তার। তবু বলল, 'তুমি বাড়ী চল!'

ভজু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যুঁই।' আবার ফিরে বলল, 'নিতাইয়ের মা, তুমি বাড়ী যাও। আমার অনেক কাজ রয়েছে, সেগুলো শেষ ক'রে যাব।'

যুঁই জলভরা চোখে তাকাল ভজুর দিকে। ভজুও তাকিয়েছিল। তারও চোখ আর শুষ্ক থাকতে চাইছে না। বলল, 'যাও। আমি ধরা পড়িনি, মার খাইনি, ভাল আছি। দোকানটা ঠিক ন ক'রে আমি কেমন ক'রে যাই?'

গৌর মাতৃভক্ত। বাবাকে তার নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল। তার কান্না পাচ্ছিল। তাই সে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছে। যুঁই ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে বেরিয়ে গেল গৌরের হাত ধরে। বৃথাই ব্যাকুলতা, কান্না আর মাথা কোটা। পাথর যে কিছুতেই টলতে চায় না।

পতাকা উড়ছে। অনমনীয়, অজেয়ভাবে এক দুরন্ত দুষ্ট শিশুর মত হা হা করে, উড়ছে আকাশের গায়ে। পারেনি নামাতে পুলিশ।

সুনির্মলের জ্ঞান হল। চোখ চাইল। চোখের সামনেই একখানি মুখ। যেন চেনা চেনা, দেখা দেখা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখে ব্যাকুলতা। সারা মুখে উৎকণ্ঠা। রূপবতী নয় তবু রূপসী।

সুনির্মল বলল, 'কার বাড়ী?'

জবাব এল, 'আমার।'

আমার। সুনির্মল শুনল, মিষ্টি পরিষ্কার গলা। বলল, 'পুলিশ কোথায়?'

'চলে গিয়েছে। ধরা পড়েছে অনেকে।'

'রথীন?'

'চিনিনে। বোধ হয় ধরা পড়েছেন।'

'আপনি কে?'

হাসি ফুটল সেই মুখে। বুদ্ধি ও হৃদয়দীপ্ত হাসি। বলল, 'সরসী রায়। মেয়ে স্কুলে মাষ্টারি করি।'

সুনির্মল একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ বুজল। হৃদয়ের তালে তালে বাজতে লাগল, 'সরসী রায়, সরসী রায়'।

এর কয়েকদিন পরেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল।

কিন্তু সারা দেশের উদ্দীপনার জোয়ার কাটল না। তবে আঞ্চলিকভাবে এখানকার আবহাওয়ার ঝ'ড়ো বেগটা অনেকখানি প্রশমিত হ'য়ে এসেছে। অনেকেই গ্রেপ্তার হ'য়ে গিয়েছে।

প্রিয়নাথ বাড়ীতে অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছে। সে পালিয়ে গিয়েছে।

ক'দিন ধরে এখানে ভয়ানক ঝড় জল শুরু হ'য়েছে। সারাদিনে শুধু জল, রাত্রের দিকে সামুদ্রিক ঝড়ের দক্ষিণ হাওয়া যেন গোটা দেশকে উত্তরদিকে মুখ আছড়ে ফেলতে চাইছে।

এখনো কাটেনি শ্রীমতী কাফের সেই ভগ্নদশা। সামনের দরজার কাঁচের ভাঙ্গা টুকরোগুলিকে আঠা দিয়ে কাগজে জোড়া লাগানো হয়েছে। সেই জোড়া তালি দেওয়া কাঁচ লাগানো হয়েছে দরজায়। মনে হয়, লেখাগুলি মাঝখান দিয়ে ফেটে ফেটে গিয়েছে। ভাঙ্গা চেয়ার ক'টা জড়ো করা রয়েছে এক কোণে। ছবিগুলি বাঁধানো হ'য়েছে আবার। ঠিক তেমনিভাবে টাঙ্গানো হ'য়েছে দেয়ালে। ঘড়িটা রয়েছে তেমন। এমনকি এক চিলতে কাঁচের টুকরোটুকুও।

ভজন পড়ে আছে টেবিলে মাথা এলিয়ে। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব। একটা খদ্দেরও আসেনি সন্ধ্যাবেলা থেকে। আসেনি রোজকার সাথী বাঙ্গালী। গাড়ী বের করেনি ভুনু।

কিছুক্ষণ আগেও ভজু দুর্যোগময়ী আকাশের দিকে তাকিয়ে, মত্ত চিত্তে একটা প্রতিশোধ

নেওয়ার কথা ভাবছিল। দোকানের মাল পড়ে আছে যেমন তেমনি। চরণ মাঝের ঘরের বেঞ্চিতে বসে আছে হাঁটুতে মাথা দিয়ে।

এমন সময় পেছনের দরজা দিয়ে এলেন নারায়ণ। কাঁধে সেই ঘরছাড়া বাউণ্ডুলে ব্যাগ। চরণ দপ ক'রে জ্বলে ওঠা একটা আগুনের শিখার মত লাফিয়ে উঠল।

নারায়ণ কোনদিকে না তাকিয়ে একেবারে সামনের ঘরে এসে ভজনের মাথায় হাত রেখে ডাকলেন, 'ভজু, ভজন, আমার পেছনে পুলিশ রয়েছে ভাই। এখনো গঙ্গার ওপার। আমাকে এখুনি হাড়মুণ্ডি পুলের ধারে পৌছে দিতে হবে।'

ভজুর প্রতিহিংসা নেওয়া দূরের কথা, নেশাটাই যায় আর কি। একে এই দুর্যোগ, তায় হাড়মুণ্ডি পুল? দিনের বেলাই যেখানকার নাম শুনলে গা ছম্‌ছম্‌ করে?

সে তার স্বাভাবিক জড়ানো গলায় বলল, 'কে হে ভদ্রবেশী ঠ্যাঙ্গাড়ে, হাড়-মুণ্ডি-পুলের ধারে নিয়ে প্রাণে মারতে চাইছ?'

শত্রু তাড়িত সন্ত্রস্ত নারায়ণ চকিতে একবার হতাশ হয়ে ফের দৃঢ় গলায় বললেন, 'ভজু যেমন ক'রে হোক, পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা একটা তোকে করতেই হবে। তোর প্রাণের ভার আমার।'

'আমার প্রাণের ভার?' মুহূর্তে মাথা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ভজু যেন এতক্ষণে দাদাকে চিনতে পেরে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল। হেসে বলল, 'দাদা তুমি? ভজু কাউকে তার প্রাণের ভার দেয় না, নেয়। তুমি একটু ব'সো, এলুম বলে।'

বলেই সে চকিতে বেরিয়ে গেল বাইরের ঝড় বাদলের মধ্যে। এমনভাবে গেল যেন, এ ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুতই ছিল, একটু বোঝার বাকি ছিল, এই যা।

নারায়ণ একবার চমকালেন, তাঁর আকাশের মত ললাটে হালকা মেঘের মত একটা চিন্তার রেখা দেখা দিল। ভয় হল ভজনকে এই ঝড়ের মধ্যে বাইরে পাঠিয়ে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার স্বাভাবিকভাবে তাকালেন বাইরের দিকে। নিজের ছায়া দেখলেন একবার 'শ্রীমতী' নামাঙ্কিত ভাঙ্গা আয়নায়। তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন শ্রীমতী কাফের অবস্থা।

এমন সময় চরণ এসে ঢিপ ক'রে একটা প্রণাম করল।

চরণের মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন নারায়ণ, 'কেমন আছ চরণ?'

'ভাল আছি।'

'আমাদের বাড়ীর সব ভাল?'

চরণ একটু থেমে বলল, 'ভাল।'

নারায়ণও একটু থেমে বললেন, 'তোমার বাবুর দোকান কেমন চলছে?'

চরণ এবার অনেকক্ষণ থেমে রইল। তারপর সমস্ত ভাঙ্গাচোরা জিনিসগুলি দেখিয়ে বলে গেল সেই ঘটনা।

নারায়ণ শুনতে শুনতে ভাবছিলেন খালি ভজুর কথা।

চরণ হঠাৎ ব্যাকুল গলায় বলল, 'আপনি একটু বাবুকে মদ খেতে বারণ করুন।'

'কেন রে?'

'নইলে বাবু বাঁচবেন না।'

চরণের চোখে জল দেখা দিল। নারায়ণ নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে বাইরের ঝড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু পরে বললেন, 'চরণ জীবনে তুমি কি চাও ভাই?'

চরণের মনে হল বুঝি দেবতার বর দেবে। সে বোকার মত বলল, 'জানিনে।'

নারায়ণ বললেন, 'না জানলে কি চলে। কিছু চেও যা চাইলে তুমি মুক্তি পাবে। মুক্তির সাধনা-ই জীবন!'

ভজু ততক্ষণে ভুনুর আস্তাবলে গিয়ে হাজির। অতিরিক্ত মাতাল হওয়ার জন্য ভুনুর বউ সেদিন ভুনুকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। সে আস্তাবলের মধ্যেই, গাড়ীর ভিতর দরজা বন্ধ করে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। ভজুর চেঁচামেচি ও অন্ধকারে সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলোর ফোঁসানি ও পা ঠোকাঠুকিতে ভুনুর নেশাচ্ছন্ন ঘুম কেটে গেল। সে গাড়ীর দরজা খুলে খিঁচিয়ে উঠল, 'এটা তোমার বাড়ীর দরজা লয় লাটঠাকুর। এগিয়ে যাও।'

ভজু তার স্বাভাবিক মাতাল আবেগে বলে উঠল, 'সে কি ভুনু সারথি, এই তো আমার ছিরি বেন্দাবন। তোমাকে এখুনি একবার উঠতে হবে।'

ভুনু ভাবছে, ভজুলাট মাতলামো করছে। সে বলল, 'বউ আনতে যাবে তো লাটবাবু? কাল যেও, এখন ঘরে যাও অনেক রাত হয়েছে।'

'তোর মাথা হয়েছে।' বলে ভজু একেবারে এগিয়ে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'বউ নয় সারথি, নতুন মহাভারতের ব্যাপার। রথে ঘোড়া জুড়তে হবে, যেতে হবে হাড়মুণ্ডি পুল।'

'হাড়মুণ্ডি পুল?' ভুনুর মাতাল চোখ গোল হয়ে উঠল।

অন্ধকারে ঘোড়াদুটোর চোখ, এমনভাবে চক্‌চক্ করে উঠল যেন তারাও ওই নামে আতঙ্ক বোধ করছে।

ভুনুর মুখ থেকে স্ব-ভাষা বেরিয়ে এল, 'এ ঝড়-বরসাত মে হাড়মুণ্ডি পুল? কেয়া, তুম্‌হারা দিমাক বিলকুল খারাপ হো গয়া?'

ভজু প্রায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করল, 'দুনিয়াতে এখন, এসময়ে কেবল আমার দিমাকই ঠিক আছে। হ্যাঁ, তোকে এখুনি যেতে হবে হাড়মুণ্ডি পুল। না পারিস ঘোড়া জুড়ে দে। নিজে চালিয়ে যাব।'

মনে হল ভজুর নেশা-জড়ানো গলা হঠাৎ অনেকখানি গম্ভীর ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। বোধ করি এ মুহূর্তে নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় বেদনাকে নিজের মুখে স্বীকার করে ফেলল সে, 'দ্যাখ ভুনু, পয়সা আমার না-ই থাক্, পেছনের ঘরে নিজের মাল বানিয়ে যতই কেন না কাউন্টারে কোঁচা লুটিয়ে বসি, আর মাল বিক্রি না হোক্ কেবল মাতাল হয়েই পড়ে থাকি, তবু মাঝে মাঝে এ প্রাণের জ্বালা দাউ দাউ করে ওঠে বুঝলি? আজ আমি প্রাণ দিতে পারি। আর প্রাণ দেওয়ারই অভিসারে যাব আজ। দাদাকে পৌঁছে দিতে হবে হাড়মুণ্ডি পুল, পেছনে তার পুলিশের তাড়া। আমার কাছে এসেছে বিপদে। আমি কি চুপ করে থাকতে পারি। আজ যে দেবতা আমাকে বর দিতে এসেছে রে ভুনু। সময় নেই, ঘোড়া জুড়ে দে।'

গলায় তার কিছুটা হুকুমের সুর ফুটল।

ভুনু ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'কে, লারাইন ঠাকুর? আরে বাপ্‌রে!'

কথার স্বরে তার যত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়, তত ভয়। ওই নামটার সঙ্গে পরিচয় সকলের এবং সেটা মানুষের নাম নয়, মহামানুষের। এক মুহূর্ত চুপ থেকে সে আবার বলল, 'লাটঠাকুর, তা' হলে তুমি বলছ তোমার সঙ্গে জানটা দিয়ে আসতে?'

'হ্যাঁ!'

ভুনু নেমে এল গাড়ী থেকে। দুজনেই মাতাল, কিন্তু হঠাৎ তারা ভীষণ গম্ভীর ও কর্মতৎপর হয়ে উঠল। অবশ্য পায়ের তলায় মাটি তাদের অস্থির।

বাইরে দুরন্ত ঝড়ের শাসানি, মেঘ গর্জন, অবিশ্রান্ত বর্ষণ ও গাঢ় অন্ধকারকে তীব্র বিদ্যুৎ ঝলক ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলছে।

ট্যাঁক থেকে দেশলাই বার করে গাড়ীর বাতি জ্বেলে ভুনু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘোড়া দুটোর উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। গায়ে চাপড় মারল, কান ধরে টানল। ঘাড়ের ঝুটিতে রদ্দা মারল, কয়েকটা হিস্ হিস্ শব্দ করল বিচিত্রভাবে। তারপর টেনে এনে জুতল গাড়ীতে। দেখা গেল তার পঙ্খীরাজ ও রাণীও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সারাদিনটা তাদের ঝিমিয়ে আর খেয়ে কেটেছে। এখন তারা তৈরী।

সব ঠিক করে গাড়ী বার করতে যাবে, এমন সময় দেখা গেল, আস্তাবল থেকে বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার গলিপথটায় একটা টিমটিমে লম্ফ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ভুনুর বউ। এ ঝড়ে বাদলের রাতে মাতাল সোয়ামীকে আস্তাবলে ঠেলে রাখলেও ফাঁকা বিছানায় তার ঘুম ছিল না। তার উপরে এত রাতে গাড়ী বের করার শব্দে সে এসেছে মনের উৎকণ্ঠা চেপে, কপট রাগে মুখ ভার করে।

ভজু দেখল, তার ভুনু সারথির রাধিকা যাকে বলে রীতিমত রূপসী। সত্যি বলতে কি, এ সঙ্কট মুহূর্তেও ভজুর মনে হল, আলো আঁধারিতে ভুনু কোচোয়ানের কোচোয়ানী যেন দ্য-ভিঞ্চির ক্যান্‌ভাসে জ্যান্ত মোনালিসা।

বউ নির্ভীক ও গম্ভীর গলায় বলল, 'অব ক্যা, মাতোয়ালেকা দুস্‌রা খেল্ সুরু হোতা? কঁহা নিকল্‌তা তু এ তুফান বরসাত্ মে?'

ভুনু ঘোড়ার লাগামে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'লাটঠাকুর বাতায়া, দেওতা আয়া হ্যায়। বর লেনে যাতা। সচ্।'

ঠাণ্ডা গলায় বলেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'মেরা সোয়ারী আয়া হ্যায়, কাম মে যাতা, মুঝে মাতোয়ালে মত্ ব'লো। চালো লাটবাবু।'

বলেই সে ঘোড়ার পিঠে কষে এক চাপড় দিতেই, গাড়ী বেরিয়ে পড়ল। মুহূর্তে গাড়ীটা যেন দুরন্ত বর্ষণে নেয়ে উঠল, ঘোড়া দুটো কান নেড়ে ঝাড়তে লাগল জল।

ভুনু আবার ফিরে বলল তার বউকে, 'কোই পুছনে আয়ে তো বোল দে, মরদানা তোহার মাতোয়াল বন্‌কে, রাত ভর ফুর্তি মাচানে গয়া রেণ্ডিখানা মে।'

ভজু তার ঘাড়ে চাপড় মেরে বলল, 'ঠিক বলেছিস্।'

ভুনু আস্তাবলের টিনের ঝাঁপ ঠেলে দিয়ে উঠল তার গদীতে। তারপর ভজু উঠতেই, ওই আকাশের বিদ্যুতের মতই মাথার উপর তার চাবুক শিস্ দিয়ে উঠল।

চোখের পলক না পড়তে গাড়ী এসে দাঁড়াল শ্রীমতী কাফের দরজায়। নারায়ণ হালদার বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীর ভিতর ঢুকে খালি বললেন, 'গাড়ীর মাথার বাতিটা নিভিয়ে দাও।'

ঘোড়ার গাড়ীর হাল দেখে তাঁর মনে আবার একটা হতাশার ভাব চেপে এল।

ভজু চরণকে সব ভার দিয়ে বলল, 'ঘুরে আসছি, দোকান বন্ধ করবি দেরী হ'লে।' তারপর ছুটল ভুনুর পঙ্খীরাজ। ততক্ষণে নারায়ণ আড়ষ্ট শরীরে থ' মেরে গিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতে

পারছিলেন না, এ ছ্যাকরা গাড়ীটা এত দ্রুতবেগে চলছে কি করে। বাইরে দুরন্ত ঝড় জলের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছে গাড়ী ও ঘোড়ার পায়ের আঘাতে।

বাইরে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ চোখে সামনে চেয়ে আছে ভুনু। আজকে এ রাত্রের নায়ক যেন ভজু বা নারায়ণ নন, ভুনু নিজে। ঝড়ের ঝাপটা, জলের তোড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চলেছে উত্তরের সড়কে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। চাবুকটা কেবল পাক খাচ্ছে মাথার উপর। ঘোড়ার পিঠে নয়, চাবুকের কষাঘাত পড়ছে ঝড়ের পিঠে। বিদ্যুতের চমকানিতে হকচকিয়ে উঠেছে পৃথিবী। কিন্তু ভুনুর রাজা ও রাণীর ভ্রূক্ষেপ নেই। কেবল তাদের বিস্ফারিত চোখ বিদ্যুতে ধাঁধিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে যেন জ্বলে উঠেছে আরও। নারায়ণ হালদার দেখলেন ভজু নিশ্চিন্তে ঝিমোচ্ছে। তিনি একবার কাঁধের ব্যাগটা হাতালেন, ডাকলেন, 'ভজু!'

কোন জবাব নেই।

এক মুহূর্তের জন্য সন্ত্রাসবাদী নেতার মুখের সমস্ত কাঠিন্য কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে এক বিচিত্র বেদনায় ভরে উঠল। মাতাল ভজুকে ঘুমন্ত ভেবে তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আপন মনে ফিস্-ফিস্ ক'রে বলে উঠলেন, 'এ সংসার মানুষকে সবই তৈরী করতে পারে, প্রাণের জ্বালায় মানুষ কী না হতে পারে।'

সে মুহূর্তে মনে হ'ল যেন গাড়ীটার উপরেই একটা বাজ পড়ল। গাড়ীর অন্ধ কক্ষের ফুটো ফাটা দিয়ে উঁকি বিদ্যুতের রেখা। নারায়ণ বলে উঠলেন আবেগভরা অপরিস্ফুট গলায়, 'তুমি তাকে পথ দেখাও, ছিঁড়ে ফেলো এ অন্ধকার, ভাঙ্গো এ পথের বাধা।'

কিন্তু ভজু ঘুমোয়নি। অন্ধকারে তার দুই বন্ধ চোখের পাতা ভিজিয়ে জল গড়িয়ে এল। তা বুঝি সে নিজেই টের পেল না। কাকে বলছেন এ কথা তার দাদা? তাকে না, তার ঈশ্বরকে! কেন বলছেন?

কেন, সেকথা বুঝেছে ভজু। বুঝেছে, সংসার বলতে শুধু ঘরের কথা বোঝেনি। তিনি বলেছেন এ পৃথিবীর কথা, ভজনের ব্যর্থতাও বোধ করি তার বিশ্বাসহীনতার কথা। বলেছেন, ভজুর এ মাতাল ও ভাঙ্গা জীবনের জন্য, তাকেই পথ দেখাবার জন্য।

বাইরে ভুনু পাথর হয়ে গিয়েছে যেন। শুধু তার হাতটা দম দেওয়া মেশিনের মত চাবুক ঘোরাচ্ছে। আর বিড় বিড় করে বলছে 'হে ব্রহমদেও! হামারা রাজা-রাণীকো আশমান মে উঠা লো। ই-লোককে কৃপাসে পন্থা দে দেও! ব্রহমদেও! এ অন্ধেরা মিটা দো, বাত্তি বাঢ়াও চারো তরফ্ মে। লাটবাবু বাতায়া, আজ হ্যায় মওকা জান দেনে কা।'

সত্যি, ঝড় বিক্ষুব্ধ কালো আকাশের পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা বিরাট বাঁকা তলোয়ারের মত রূপালী রেখা দেখা গিয়েছে। সে আলোর রেখায় ঘন বৃষ্টির ছাঁট ফুঁড়ে অদূরেই মাথা জেগে উঠেছে কিম্ভূতাকৃতি হাড়মুণ্ডি পুলের। সেখানে নিয়ত ঘাপটি মেরে থাকে গুপ্তঘাতক ডাকাত খুনী ঠ্যাঙ্গাড়ে। সেখানে কত অসহায় পথিকের ছিন্ন মুণ্ড ও হাড় ছড়িয়ে আছে। অন্ধকারে যেন জীবন্ত মৃত্যু।

হাড়মুণ্ডি পুল!

ভুনুর নজরে পড়তে সে আরও শক্ত হয়ে উঠল। তার চাবুক আরও জোরে শিস্ দিয়ে উঠল। সে বারবার বলে উঠল, 'মত রোখো রাজারাণী আগে বাঢ়ো.......আগে বাঢ়ো!.....'

নারাণ দরজা খুলে ফেললেন গাড়ীর। সঙ্গে সঙ্গে জলের ছাঁটে ভিজে উঠলেন।

ভজু আর একদিকের দরজা খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরে তাকাল। হাত পা শক্ত হয়ে উঠেছে তার।

গাড়ী ঠেলে উঠেছে পুলের উপর এঁটেল কাদা মাড়িয়ে।

মোরগের ডাকের মত তিন বার স্তিমিত শব্দ ভেসে এল। নারায়ণ হালদারও তেমনি শব্দ করে উঠলেন।

একটু পরেই দুজন লোক এসে দাঁড়াল গাড়ীটার সামনে। বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দের মধ্যে শোনা গেল,

'নারাণ দা?'

'হ্যাঁ', জবাব দিলেন নারায়ণ।

গাড়ী থেমে পড়ল। নারায়ণের পেছন পেছন ভজুও নেমে এল দাদাকে আগলাতে। নেমে এল ভুনু। কিন্তু সে আতিপাতি করে দেখছে হাড়মুণ্ডি পুল। যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে চলে এসেছে। এসেছে বুঝি ব্রহ্মদেওয়ের রাজত্বে, যেখানে ঠাসা আছে ভয় ও বিস্ময়।

নারাণ প্রথমে নেমেই ঘোড়া দুটোর গায়ে হাত রেখে বললেন, 'জীবনে এই প্রথম জানলুম জানোয়ারও মানুষের কতখানি।'

তারপর ভুনুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তুমি কি চাও ভাই?'

ভুনু নিঃসঙ্কোচে জবাব দিল, 'এক ভাঁড় তাড়ি।'

এই হাড়মুণ্ডি পুলের উপরে ঝড়জলের মধ্যে নারাণ ও তার অপেক্ষমান সঙ্গীরা হেসে ফেললেন। কেবল হাসল না, সবচেয়ে বকবকে মানুষ ভজু। নারাণ বললে, 'তাড়ি তো এখানে নেই। আর টাকাও নেই, তোমাকে আমি অনেকটা সোনা দিতে পারি।'

ভুনু বলল, 'বাবু'........থেমে আবাব বলল, 'লারাইন ঠাকুর, তুমার কাছে তাড়ি মেঙ্গেছি পিয়াসের জন্যে। না পারেন কথা নেই। মগর রূপেয়া আর সোনা। সে তো বহুত্ ছোট। আজ জান দেনে আয়া রহা। এ আঁখসে তুমাকে তো দেখে লিয়েছেন! আর কুছু চায় না ভুনু।'

নারাণের সঙ্গে যেন হাড়মুণ্ডি পুলটাই একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বিদায়ের স্বরে নারাণ ডাকলেন, 'ভজু।'

ভজু বলল তার স্বাভাবিক গলায়, 'তোমাকে তা' হলে এখানেই রেখে যাব?'

'হ্যাঁ, ভজন, তুই এবার যা।'......বলে তিনি সঙ্গীদের বললেন, 'ওদের একটু এগিয়ে দিয়ে এস।'

ভুনু ততক্ষণে ঘোড়ার লাগাম ধরে গাড়ীর মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। ভজু বলল, 'এগিয়ে দেবার দরকার নেই।' ব'লে আপন মনে পাগলের মতো বলে উঠল,

'ভয়ের মূঢ় অন্ধকারকে ছিঁড়েছি আজ আলোর তলোয়ারে
দেখিনি যা, দেখেছি তা, আমার অন্ধ ঘরের বন্ধ দ্বারে।
চলি দাদা! চল্‌রে ভুনু সারথি।'

ফিরে এসে তারা দুজনেই মদ খেয়ে ঘরে ফিরল। কেবল চরণ জিজ্ঞেস করল, 'কোন বিপদ আপদ হয়নি তো?'

ভজন জবাব দিল, 'আজ্ঞে না।'

তারপর ঝড়ের রাতকে তারা আরও মাতিয়ে তুলল প্রচণ্ড হল্লায়। কেবল ছাড়াছাড়ির সময়

ভজু বলল, 'ভুনু তোর রথ, আর আমার শ্রীমতী কাফে, এই নিয়ে আমরা। জীবনে কতকগুলি দিন আসে, ওগুলো বোধ হয় আমাদের জমায় পড়বে না যেমন আজকের রাতটা।......এবার তুই যা তোর মোনালিসার কাছে, আর আমি........আমি যাই আমার যুঁইয়ের কাছে।'

তারপর একলাই বলতে বলতে গেল—

দুয়ার খোল হে পুরবাসী
এসেছি রুদ্র সন্ন্যাসী
তোমার ঘুমন্ত ঝ'ড়ো কালো রাতে
জ্বাল আগুন, হানব বাজ, হৃদয় পাতে।

তারপর যেন কান্নাভরা গলায় বলে উঠল—

প্রেয়সী তোর উন্নত বুকে মরণ দেখি কার,
ঠোঁটে তোর খুনের হাসি দেখেছি আমার।

এর সাতাশ দিন পরে ভুনুর রাজা ও দু'মাস তিনদিন পরে রাণী ভাগাড়ের শেষ শয্যায় শুয়ে, শকুনের ঠোঁটে ছেঁড়া পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে, স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। আর একজোড়া কিনতে হল তাকে ঘটিবাটি বেচে।

তারপর অবসাদ। আপাতচক্ষে মনে হয় না শ্রীমতী কাফেতে কোন অবসাদ চেপে বসেছে। তার নিয়মিত খদ্দেরের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়েছে। রকমারি সব লোক। এক-একদিন অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে এখানে। যত রাজ্যের সংবাদ পরিবেশিত হয় এখানে। কোন্ পাড়ায় কি ঘটেছে, কোন্ ঘরের কি সংবাদ, তারই ন্যক্কারজনক কাহিনী। তবে ভজুকে লুকিয়ে, না শুনিয়ে। কয়েকদিন কয়েকজনকে ভজু ঘাড় ধরে বার ক'রে দিয়েছে দোকান থেকে।

তবুও অবসাদ। যেমন বেড়েছে ভজুর মাতলামি, তেমনি বেড়েছে পাগলামি। আগে তবু সে ভাল কথা কিছু বলত। আজকাল হাসে, কবিতা বলে, গান গায়। কখনো কখনো জ্বলে ওঠে। অকারণ। কেউ তার মানেও বুঝতে পারে না।

বাঙ্গালী আসে মাঝে মাঝে। থেকে থেকে সে খালি বলে, 'এ জীবনটা আর ধরে রাখতে প্রাণ চায় না গো ঠাকুর। ভাবি, শালা জম্মালুম-ই বা কেন, কেন বা রইচি বেঁচে।'

বোধ হয় অন্যরকম ভাবে এ প্রশ্নটা ভজুর নিজেরও। মাঝে মাঝে আসে ভাগন আর মনোহর। তারা দু'জনে অন্য এলাকায় চটকলে চাকরি পেয়েছে। তারা আসে, ফিস্‌ফিস্ ক'রে জিজ্ঞেস করে নারায়ণের সংবাদ। মনে হয়, তারা প্রতীক্ষা ক'রে আছে কোন কিছুর জন্য। কখনো বা জিজ্ঞেস করে প্রিয়নাথের কথা।

গোলক চাটুজ্জেমশাই আসেন তেমনি। কিন্তু গল্প করেন অনেক রকম। তাঁর পুরোনো বন্ধুদের কথা তিনি ভুলতে পারেন না।

সেই ছোকরা পুলিশ অফিসারটিকে আর কখনো দেখা যায় না। সে বদলি হ'য়ে গিয়েছে এখান থেকে। কুটে পাগলার বেড়েছে পাগলামি। রেলের মাল বইতে গিয়ে গঙ্গার খেয়াঘাটের কাছে নিয়ে লোককে ভয় দেখায়, পয়সা আদায় করে। এজন্য ক'দিন হাজতবাসও করেছিল। কিন্তু চরণের নিষ্কৃতি নেই তার হাত থেকে। আশেপাশের দোকানী আর বাজারের লোক কুটে পাগলার চরণ-প্রেম নিয়ে হাসাহাসি করে।

কৃপাল, শঙ্কর, হীরেন, রথীন, সুনির্মল এরা সকলেই জেলে। কয়েকদিন আগেই

'মিউনিসিপ্যাল' ইলেক্‌শন হ'য়ে গিয়েছে। স্বদেশী ক'রতে গিয়ে সারদা চৌধুরী জেলে গিয়েছিল।

ভজুর বাবা হালদারমশাই দোকানের ক্ষতিপূরণের জন্য একটা মামলা করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন তিনি নিজেই সব বন্দোবস্ত করবেন। ভজু বলেছে, 'কার কাছে মামলা? এ সরকারের বিরুদ্ধে, এ সরকারেরই কোর্টে? ওসব ধোকাবাজীতে যাচ্ছিনে আমি।'

একটা মানুষ একেবারে ভাবলেশহীন বোবা হ'য়ে যায় কি ক'রে হালদারমশাই তার একটা প্রমাণ। উনি সারাদিন সেই বাড়ীর ধারে বারান্দায় ইজিচেয়ারটাতে বসে থাকেন। কিছু ভাবেন কিনা তাও বোঝা যায় না। লোকে বলাবলি করে, 'পাগল হ'য়ে গেছে নেকো হালদার।' তবুও আশ্চর্য! ভজুর দেরাজ থেকে বোতল চুরি করা ওঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

যুঁই শান্ত হ'য়ে গিয়েছে। এখন শুধু তার দুশ্চিন্তা সারা হয়েছে। ভজুর জন্য। সাধারণভাবে সে ভজুর ভালবাসার কাঙ্গালিনী হ'য়েছে। দিন-রাত ছেলে মেয়ে শাসন করে, করে উপোস আর পার্বন। তার একটি মেয়ে হয়েছে।

বকুল মা শুধু ঘুরে বেড়ান। আজ কাশী, কাল বৃন্দাবন।

একটা অবসাদ এসেছে।

সন্ধ্যাবেলা-ই টলতে টলতে একটি যুবককে কামিজ চেপে ধরেছে ভজু। যুবক একেবারে ফিটফাট বাবু। কাচির ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে গ্রেসকিডের জুতো। মাথায় বাবড়ি চুল।

যুবক শ্রীমতী কাফের রীতিমত খদ্দের।

ভজু বলল, 'তুই আন্দু ভট্‌চাযের ছেলে না?'

যুবক অপমানে লজ্জায়, হঠাৎ আক্রমণের ভয়ে প্রায় ডুকরে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ক'বার ম্যাট্রিক ফেল করেচিস্?'

'আজ্ঞে চারবার।' যুবকের চোখে প্রায় জল এসে পড়েছে।

'গঙ্গায় মেয়েদের ঘাটে ব'সে থাকিস্?'

যুবক একেবারে চুপ। কেউ হাসছে। কেউ বলছে ছেড়ে দিতে। ভজু বলল, 'ছেড়ে দিলুম আজ। আর কোনদিন আসিস্‌নে শ্রীমতী কাফেতে, যা বাড়ী যা।'

কোনদিন কিছু নয়, আজকেই হঠাৎ কেন ভজুলাটের এ আক্রমণ, কেউ বুঝতে পারল না। একটা বিশ্রী স্তব্ধতা ভর করে এল সন্ধ্যাকালীন আসরে। বাকি কয়েকজন যুবক টুকটাক সরে পড়ে।

ভজু বলে, 'কই হে নরসিং, পড়ে যাও।'

নরসিং একজন খদ্দের। সে পড়তে থাকে কয়েকমাস আগের একটা মাসিক বসুমতী, বাঙ্গালার রাজনীতি।.....বাঙ্গালার রাজনীতি ক্ষেত্রে অধুনা যে ভূতের নৃত্য দেখা যাইতেছে.....যে স্বেচ্ছাচার ও পরমত অসহিষ্ণুতার জন্য আমরা বুরোক্রেশীকে দায়ী করিয়া গালি পাড়ি.....স্বরাজ্যদলের দলপতিদের মধ্যে এ দোষ দেখা দিয়েছে। তারই ফলে বাংলা কংগ্রেসে দলাদলি......পরন্তু 'তরুণ রাজনীতিক' বিজ্ঞের মত বুঝাইয়াছেন যে, গতানুগতিক শান্তি ও আরামের জীবন, জীবন নহে, উহা মৃত্যুরই লক্ষণ, বিবাদ বিতণ্ডাই জীবন!.....যেদিন বাঙ্গালা সংবাদপত্রসেবীদের সভায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বাবুর উপরে 'স্বাধীনতাকামী' তরুণ লেখকের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম........অদৃষ্টের পরিহাসের মত.......ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে অপমান ও প্রহার......বাঙ্গালী তুমি ভাবিয়া দেখ, আজ তুমি কোথায়.....

কুটে পাগলা হা হা ক'রে হেসে উঠল ষ্টেশনের রক থেকে। ভজু হেসে উঠে বলল, 'বুঝেছ নরসিং।'

'কি দাদা?'

'বাঙালী কোথায় দাঁড়িয়েছে?'

নরসিং অবাক হ'য়ে চুপ ক'রে রইল। ভজু বলল, 'বুঝলে না? বাঙালী কুটে পাগলা হ'য়েছে।'

তারপরে আবার বলল, 'আন্দু ভট্‌চাযের ছেলেও বাঙালী।'

সবাই হাসতে লাগল তার কথা শুনে। ভজু আবার বলল, 'নরসিং, আমিও বাঙালী। কিন্তু, নারায়ণ হালদার কি বাঙালী নয়? নেকড়ের মুখের শিকারের মত লুকিয়ে ফিরছে প্রিয়নাথ, সেও যে বাঙালী, সেটা তোদের সম্পাদক সতীশবাবুকে লিখে পাঠিয়ে দে।'

হাসতে হাসতে কপাল ব্যথার মত সবাই চুপ ক'রে রইল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ভজনের কি বিচিত্র রূপান্তর। সে আর একটি কথাও না ব'লে মাথা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রইল।

রাত্রি বাড়তে থাকে। ভজন চলে যায়। চরণ একলা ঘরে একটা বন্দী আত্মার মত ছটফট করে। এ ঘরটা যে খোলা আকাশের তলায় পর্বতের গুহার মত। এখানে নির্জনে অজান্তে লাফিয়ে লাফিয়ে তার বয়স বেড়ে উঠেছে। নতুন ও বিচিত্র সব চেতনায় ভরে উঠেছে তার বুক। সারা শরীর জুড়ে তার অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা। এতদিনের দেখা সমস্ত ছবি ও ঘটনা তার মাঝে নবরূপে প্রকাশ পেতে চাইছে। নিজের মধ্যে কি খুঁজে পেয়ে বেদনায় বুক ভ'রে উঠছে তার। আত্মহারা হ'য়ে উঠছে আনন্দে।

এ একাকীত্ব সে আর সহ্য করতে পারছে না। তার কাউকে চাই! কিছু চাই। সে ভালবেসে মুক্ত হ'তে চায়। কিন্তু জীবনটা অভিশপ্ত। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। দেখেও না তার আত্মহারানো, তার বেদনা।

সে অন্ধকারে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো হ'য়ে গিয়েছে। কাছেই পি, ডব্লিউ, ডি,-র শ্রমিকেরা আস্তানা পেতেছে। জ্বলছে লাল বাতি। রাস্তাটাতে পীচ্ ঢালা হ'চ্ছে।

চরণের সারা গায়ে অগ্নিস্রোতের জোয়ার বইছে। অন্ধকারে সাপের গায়ের মত চোখ চক্‌চক্ করছে তার। পা টিপে টিপে সন্তর্পণে সে এসে উঠল নাড়ু পুরোতের গলিতে। বারবণিতাদের আড্ডায়। ঢুকে পড়ল একটা বাড়ীর উঠোনে। ঢুকেই নির্বোধের মত শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এক ঝাঁক মেয়েমানুষ একটু অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। পরমুহূর্তেই তার একাকীত্ব, তার বেদনা, আনন্দ, প্রেম, সুখ সমস্ত কিছুকে উড়িয়ে দিয়ে ধেয়ে এল বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি, কুৎসিত সম্বোধন, জোড়া জোড়া শিকারী চোখের বিলোল কটাক্ষ।

চরণের মনে হল, যেন তার সৎমায়েরা এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। হাসি ও বিদ্রূপের মাঝে চরণ পাগলের মত, বোবা আর কালার মত দাঁড়িয়ে রইল।

একটা মেয়ে ব'লে উঠল, 'ছোঁড়া যে কথাই বলে না। পছন্দ হ'চ্ছে না বুঝি?'

আর একজন বলল, 'ওমা। এ যে ভজন ঠাকুরের দোকানের বাবুর্চি গো। কই লো গোলাপী, তোর বড় নোলা। এই নাগরকে নে, খুব মাংস খেতে পাবি।'

অশ্লীল কথার ঝড় বইল। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিতে মেতে উঠল উঠোনটা।

তবু অসহ্য বেদনা ও আনন্দে আগুন হ'য়ে উঠল চরণ। সে হাঁ করে তাকিয়েছিল একটা মেয়ের দিকে। দোহারা গড়ন, মাজা রং, শান্ত চোখ।

মেয়েটা এগিয়ে এসে ঘাড় বাঁকিয়ে হেসে বলল, 'আমাকে মনে ধরেছে বুঝি?'

চরণ ঘাড় নাড়ল। মেয়েটা তার হাত ধরে গায়ে টেনে নিয়ে বলল, 'তবে চল।'

কিন্তু চরণ তাকে আমন্ত্রণ জানাল তার পেছনের অন্ধকার ঘরটাতে। শুনে আবার একটা হাসির রোল পড়ল।

গৃহকর্ত্রীর অনুমতি নিয়ে মেয়েটি এল চরণের সঙ্গে তার পিছনের ঘরে। কিন্তু তার শান্ত চোখের চাউনি হয়ে উঠেছে বাঁকা। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের, তাচ্ছিল্যের হাসি।

দরিদ্র ভক্ত যেন তার দেবতাকে পেয়েছে, এমনিভাবে চরণ তাকে আদর করে বসতে দেয়। দেয় চেয়ার পেতে। ব্যাকুলভাবে তাকে খেতে দেয়। ডিসে করে সাজিয়ে দেয় চপ, কাটলেট, মাংস। কাছে বসে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম?'

তাচ্ছিল্য ভরে খেতে খেতেই জবাব দেয় মেয়েটি, 'নাম-টাম নেই। নামের মধ্যে এক নাম বেবুশ্যে।'

বলে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে। তবু এই হাসিই যেন এ ঘরটার মুক্তি এনে দিল। চরণ গল্প আরম্ভ করে, ইচ্ছে করে হৃদয়কে উজাড় করে দিয়ে নিবেদন করে তার বেদনা, দুঃখের কাহিনী। বুঝি কেঁদে ফেলবে এখুনি ওর কোলে মুখ রেখে।

কিন্তু মেয়েটা ডিস সরিয়ে রেখে তীব্র গলায় ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল, 'কাজ সেরে বিদেয় দেও বাপু, আর দেরী করতে পারব না।'

চকিতে সমস্ত আলো নিভে গেল। কোন কিছুর প্রতীক্ষা নেই, সময় নেই হাসি কান্নার।

জীবনের একটা নতুন অধ্যায় শুরু হল আজ পাশবিকতার মধ্যে। বাঙালী কিশোরের যৌবনের প্রথম পদক্ষেপ।

উৎকট লজ্জাহীনার মত মেয়েটি গোছগাছ করল বেশবাস। কিন্তু চরণ তেমনি ব্যাকুল। ব্যাকুলভাবে পাওয়ানার বেশী পয়সা দিয়ে হাত ধরে বলে, 'আবার এস। আসবে তো?'

মেয়েটা আঁচলে পয়সা বাঁধতে বাঁধতে, হেসে বলল, 'তা' হলে কিন্তু আরও বেশী দিতে হবে বাপু।'

চরণ বলে, 'সব দেব। যা আছে, সব দেব।'

তারপর মেয়েটা চলে যেতে দু হাতে মুখ ঢেকে সে বসে থাকে। তার লজ্জা ছিল, ঘৃণা ছিল, ছিল মান অপমান, তবু বারবার মনে মনে বলল, 'আমার যা আছে সব দেব। তবু এস।'

কেবল একটা অসহ্য যন্ত্রণার কান্না সে কিছুতেই আটকাতে পারল না।

চরণের এ-ব্যাপার ভজন জানতে পারল না।

মেয়েটি প্রায়ই আসতে লাগল। আস্তে আস্তে তার ঝাঁজ কমে আসে। ঠাণ্ডা হয়ে আসে তপ্ত মন।

চরণ নেশাচ্ছন্ন। ভালবাসার নেশা। কিন্তু ভালবেসে সে যে মুক্তি চেয়েছিল, সেই মুক্তি আসেনি। সে বাঁধা পড়েছে নতুন করে! মনে মনে বলে, আগুনে পুড়তে পারি, মরতে পারি, তবু ওকে ছাড়তে পারিনে। মেয়েটি তার নাম বলেনি। না-ই বা বলল। সে নিজেই তার নাম। ভাবে, মানুষ যখন প্রথম বিয়ে করে, তখন তার কেমন হয়। জীবনে বিয়ে বাসর সে দু' একটা দেখেছে। দেখেছে বর কনে, এয়ো আত্মীয়-স্বজন, হাসি গান, ঢোলক, কাঁশির তাল আর শানাইয়ের গান।

বাপের বিয়ে দেখতে নেই বলে তাকে গাঁয়ের কাছে পিঠের এক বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু সে শানাইয়ের সুর শুনেছিল। শোনা কথা, তার গর্ভধারিণী মাকে বিয়ের সময় খরচ হয়েছিল চার কুড়ি টাকা। সৎ-মাকে বিয়ের সময় খরচ হয়েছিল একশো দু কুড়ি টাকা। বাজনা বেজেছিল। ঢোলক আর শানাই। কিন্তু বড় আশ্চর্য। সেদিনের শিশু মনে এখনো তার সেই সুর বাজছে যেন কান্নার মত! মনে আছে, ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়াকে চিরজন্মের মত ফাঁকি দিয়ে যাবার বেলা নিমাই যে গান গেয়েছিল, সে সুরই বেজেছিল সেদিন শানাইয়ে।—

মায়ার বাঁধন ছাড়া কিগো যায়।
যাই যাই মনে করি, যাইতে না পারি,
মহামায়া আমার পিছনে ধায়।

কিন্তু চরণের মিলন রাত্রে সুর বেজেছে। সে সুরের নাম জানে না সে। কিন্তু সুর বিদায়ের নয়। সে সুরে বেদনা ও আনন্দ দুই-ই ছিল। মনে মনে ভাবে, হোক সে বেশ্যা, হোক সে পাপিষ্ঠা, তবু চরণের জীবনে সে প্রথম নারী। বহু বীভৎস দৃশ্য দেখে তার মনের মধ্যে একটা বিকৃতি বাসা বেঁধেছিল। বিকৃতি একটা অস্বাভাবিক তৃষ্ণার মত। আবার বিতৃষ্ণাও বটে। সে বিকৃতি মেয়ে দেহ নিয়ে।

কিন্তু এই মেয়েটি তার সেই বিকৃতি কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল! মন তার সহজ হয়ে এল। তার অস্বাভাবিক তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণা দুই-ই মিটে গেল। দেহকে ভালবাসতে শিখল।

কোন কোনদিন মেয়েটি চরণের মন না বুঝে অকারণ উৎকট ভঙ্গি করে। মুখে কিছু বলতে পারে না, মনে মনে তার কষ্ট হয়, অপমান বোধ হয়। কি ক'রে ওকে বোঝাবে, এ ভঙ্গির আমার প্রয়োজন নেই। এত সুন্দর যার শরীর, যার সবটাই এত ভরাট, তার কোন্‌খানটা এত শূন্য যে, তাকে এসব করতে হয়।

এক একদিন ভাবে, ওকে ব'লে ফেলি তোমাকে আর ছাড়তে রাজী নই। রেখে দেব তোমাকে আমার কাছে। মাথায় ঘোমটা দিয়ে তুমি আমাকে গালি পেড়, ব'কো, যা খুশী তাই ক'রো। কিন্তু আর যেও না সেখানে।

কিন্তু সে কথা বলতে তার ভয় হয়। মনে হয় একথা বললে সে বুঝি আর কোনদিন আসবে না। এমনকি হ'তেও পারে না। একদিন এই মেয়েই বলবে, তোমাকে ছেড়ে আর যাব না।

এরই সঙ্গে মনে পড়ে বার্মা থেকে ফেরার পথে জাহাজের সেই সঙ্গীর কথা, আর মনে পড়ে যায় নারায়ণের কথা। মনের ভেতর কে যেন বলে ওঠে, এই দেবতার মত মানুষদের ভালবাসা পেয়েছিস তুই, বিশ্বাস ও স্নেহ পেয়েছিস মাতাল ভজুলাটের মত মনিবের। আর তুই কিনা বিকিয়ে দিলি নিজেকে বেশ্যার পায়ে।

'কিন্তু হে দেবতা, বিশ্বাস কর, আমার পাপ নিও না, মেয়েটাও আমার ভগবান হ'য়ে উঠেছে। আমি ভাবি, জাহাজে সেদিন তোমার ওই হাড়সার বুক থেকে প্রাণটুকু বেরিয়ে কোথায় গেল? সেই অসীমের সন্ধানে কোথায় ঘুরছে তোমার অতৃপ্ত আত্মা। আমি ভাবি, আর একজনের কথা। এই সেদিন তুমি ঝড় জলের রাতে ভুনুর গাড়িতে করে কোথায় ছুটে গেলে। শত্রু তোমাকে ধরতে পারেনি তো! ভাবি, মনিববাবু আমাকে তুমি যত খুশী চড় চাপড় মার। আবার যত খুশী খাওয়াও আর ভাল্ল জামাকাপড় কিনে দাও, তোমার শরীরটাকে তুমি আর ক্ষয় ক'রো না। ভাবি, শ্রীমতী কাফের এই ঘর, তার দেয়ালের কোথাও একটু দাগ পড়েছে কিনা। কত তার আজকের বিক্রি, কত সে দিয়েছে, কত জনা খেয়েছে বাকি, কোন্‌ রান্নাটা লোকে ভাল ও মন্দ বলেছে, তার প্রতিটি খুঁটিনাটির বিষয় আমার না জানলে মুখে ভাত রোচে না।

আর ভাবি, এ মেয়েটার আর আমার কথা। ঘৃণায় ও অপমানে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে যখন ভাবি, সন্ধ্যাবেলা ওর ঘরে একটা পুরুষ ঢুকছে। আমার সারা গায়ে ছুঁচ ফুটতে থাকে, যেন ম্যালেরিয়া জ্বরে হাঁপাতে থাকি, যখন ভাবি ওর দেহের উপর একটা মানুষ চেপেছে। ভাবি, 'এ তো আর সইতে পারিনে। জীবনের এ বিধান কি বদলে যেতে পারে না কোনরকমে। সামনে যে কেবলি অন্ধকার। অন্ধকারে থেকে থেকে দেখছি, অন্ধকারেও সব পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে। এ জীবনে তা পরিষ্কার হবে কবে।'

অবসন্ন ভজু। কি অভূতপূর্ব ক্লান্তি।

রামা এল একদিন।—'লাট বাবুজী! নমস্তে!'

আদপ ভোলেনি। ভোলেনি নমস্তে বলতে। এখন ও ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলতে মুল্‌কি ভাষা বলে না। এখনো তার চাউনি চলনে বলনে একটা পরিচ্ছন্নতা ও নম্রতার ছাপ আছে।

ভজু যেন ঘুম ঘোরে চোখের পাতা খুলল। তাকিয়ে দেখল রামাকে। বেশভূষা আগের চেয়ে নোংরা হয়েছে। মাথার চুলে জট ধরেছে একটু একটু ক'রে। চেহারা রোগা হ'য়েছে। চোখের কোল বসা। কোলে একটা কালো কুত্‌কুতে কয়েকমাসের বাচ্চা।

ভজু বলল, 'কে, রজকিনী রামী?'

রামা কথাটার মানে জানে না। বলল, 'হাঁ।'

'তোর কোলে ওটা কে রে?'

রামার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সে হাসি লজ্জার, ব্যথার, আনন্দের, গৌরবের। বুঝি এই হাসি দেখতে চেয়েছিল হীরেন বারবার। কিন্তু এ হাসি ছিল না রামার মুখে। বলল, 'বাবুজী, মেরী বাচ্চা।'

বটে! ভজু একটু অবাক হ'য়ে বলল, 'তোর শাদী হ'ল কবে রে?' রামা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শাদী নহি হুয়া বাবু। সরপঞ্চকে রায় মোতাবিক বিশ রূপেয়া পঞ্চায়েত্ কো হাত মে দিয়া। এক মরদ হম্ সে মহব্বত করতা রাহা।'

বলতে বলতে লজ্জায় সে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

মহব্বত! ভজুর চোখে ভেসে উঠল হীরেনের মুখটা। কেন সেদিন হীরেন অমন ক'রে কেঁদেছিল। মদ খেয়েছিল। সে বাচ্চাটার দিকে তাকাল! স্নেহ ভরে দেখল। তারপর হেসে দেরাজ খুলে একটা টাকা রামার কোলে ফেলে দিয়ে বলল, 'তোর ছেলের মুখ দেখে দিলুম।'

রামা সেই টাকাটি বাচ্চার শিথিল মুঠোয় ভ'রে দিয়ে সোহাগ ভ'রে বলল, 'লে, লাটবাবু দিয়া। চুহাঁ কাহিকা, মেরে কালালাল।'

ব'লে সে হেসে উঠল। ভজুও হাসতে লাগল।

তাদের এই যুগল গলার হাসি শুনে আশেপাশের লোকেরা সবাই অবাক হয়। মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে হাসাহাসি করে।

তারপর হঠাৎ রামা জিজ্ঞেস করে, 'লাটবাবু, বাবুজীকো জেল্ সে কব ছোড়েগা?'

'তা তো বলতে পারিনে।'

রামার চোখে জল ভ'রে আসে! হীরেনের বসবার জায়গাটির দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ ধ'রে।......আজ আর সে সুতো কাটে না। প্রায় রোজ নেশা করে, মরদের মার খায়। মার দেয়ও। আবার দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে কাঁদে। কিন্তু এই একটি মানুষ বাবুজী, যাকে

কোনদিন সে ভুলতে পারবে না। সে আজও বোঝে না বাবুজী তার কাছে কি চেয়েছিল। বাবুজীকেও সে বুঝতে পারেনি। তবু তাকে অদেয় তার কিছু নেই। আজও যখন সে চোখ বুজে ভাবে, তখন অনুভব করে, বাবুজী তার হৃদয়ের অন্ধকুঠরির দরজায় একটা ভয়ানক আঘাত করেছিল। কিন্তু সে দরজা তার খোলেনি।

বাচ্চা বুকে নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সে বিদায় নিল।

এই পথের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে সরসী হেঁটে যায়। একলা। লোকেরা তাকিয়ে থাকে। ভাবে সাহস আছে। ভদ্র মেয়েমানুষকে সেজেগুজে একলা চলতে এখানে দেখা যায় না। তাই কিছুটা বিস্ময়ও আছে।

সরসী যাওয়ার সময় একবার ক'রে শ্রীমতী কাফের দিকে তাকিয়ে যায়, আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। এখনো তার সবটুকু পরিচয় পাড়া হয়নি, সুনির্মলের কাছে।

হীরেনের বউদি কয়েকদিন জেলে ছিলেন। আবার তিনি ঠিক আগেরই মত অন্দরবাসিনী হয়েছেন। মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে কোথাও যাওয়ার সময়ে খড়খড়ি তুলে শ্রীমতী কাফের দিকে তাকিয়ে যান। তাকিয়ে দেখেন এই রাস্তাটা। তাঁর জীবনে একটা অদ্ভুত ব্যাপার এইখানে ঘটেছিল।

নমদনাখ্ অয়গুল্ ঔ রিন্দিকুন্ ও খুশ্‌বাশ্,
বাশ্ তৌরে অজবলজিমে ঐয়ম-ইশবাহস্ত্।

টেবিলে মুখ ঘষতে ঘষতে বলছে ভজন। তার আধা কর্কশ আধা মিঠে নেশামত্ত গলায় আচমকা ফুটল আরবী কাব্যের বোল্। তারপর গলার স্বর তলিয়ে গেল যেন লৌহ দরজার ককিয়ে ওঠার মত।

এসময়ে ষ্টেশনের জনহীন এলাকাটা চৈত্রের ভর দুপুরে ঝিম মারা উদাসীনতায় মুসাফিরের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। ভজুর জড়ানো গলার কাব্যে মনে হল, মেতে উঠল বুঝি আরবের কোন কুঞ্জবীথি।

দক্ষিণ হাওয়ায় গরমের আভাস। সূর্যের প্রখরতায়, মেঘমুক্ত নীল আকাশটাকে দেখাচ্ছে যেন কাঁচের আবরণ লাগানো।

ষ্টেশনের রকে একটা পশ্চিমা কুলি কানে আঙ্গুল দিয়ে গান ধরেছে। সরু গলায় ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার মত। সুরের পর্দার সঙ্গে পর্দা মেলানোর মত এ গানের কোন আলাদা সুর নেই। এই ক্লান্ত চৈত্র দুপুরের সঙ্গে সুরটা মিশে গিয়েছে। কান পেতে সে গান শুনছে একটা পশ্চিমা সেপাই।

কুটে পাগলা রকের ধুলোয় শুয়ে আছে যেন পালঙ্কে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়েছে কোন রাজা ব্যক্তি।

এ সময়টাতে ট্রেন কম, তাই কম কোলাহল। সেডের তলায় ঘুমুচ্ছে কয়েকটা কুলি, যাত্রী আর ভবঘুরে ভিক্ষুকেরা।

ইয়ার্ড থেকে ভেসে আসছে লুজ শান্‌টিং-এর গুম্ গুম্ শব্দ। থেকে থেকে ভেসে আসছে বসন্ত পাখীর বিরহের গান।

ঝিমোচ্ছে চরণ। একরাশ আলুসেদ্ধ চাপিয়ে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ঝিমোচ্ছে।

ঘড়িতে টং টং ক'রে দুটো বাজল। ভজু মাথা তুলে বসল, কে? কেউ নয়। ভজু আদর ক'রে তার এ ঘড়ি বাজাকে বলত, এ ঘণ্টা নয়, যেন কোন রহস্যময়ীর চটুল হাসি। জলের তলা থেকে হাসে মৃণ্ময়ী।

একমুহূর্ত সে তার রক্তকটা চোখে ঘড়িটার দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। খুঁক খুঁক ক'রে হেসে জড়ানো গলায় বলল,

তোমার পায়ে নূপুর বাজে—
এখন এত কাজের মাঝে,
নয়ন মেলি এমন সময় কোথা?
জান নাকি কাজের মানুষ সব সময়ে ভোঁতা।

গলা ছেড়ে হেসে বলল,

সাকী তবে পিয়ালা ভর্‌র্‌,
কটাক্ষে মোর জানটি হর্‌র্‌।

তারপর হঠাৎ সে থামল। মনে হল একটা মেয়ে তার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে, আড় চোখে চেয়ে চেয়ে হাসছে। কে মেয়েটি। শ্যামলা রং, মাথায় একরাশ চুল, শক্ত গড়ন। মেয়েটা কে হে?.......কিন্তু মেয়েটা এবার কাঁদছে। কাঁদছে আর কয়েকটা ছেলেমেয়েকে জড়িয়ে ধরে আছে।

ও! যুঁই। ওরা গৌর নিতাই।

তারপরে আর একজন। দাদা নারায়ণ। প্রিয়নাথ, বাঙ্গালী, হীরেন, রামা। মাথাটা তার খারাপ হ'য়ে উঠল হঠাৎ। এসব কি? এরা তাকে এমন ঘিরে ধরেছে কেন? যেন গত জন্মের পাওনাদারেরা সব।

সে চীৎকার করে উঠল, 'চরণ!'

চরণ চমকে উঠে ছুটে এল। কিন্তু কোথায় কে। ভজন তেমনি টেবিলে মুখ দিয়ে প'ড়ে আছে। কেবল বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করছে তার।

হঠাৎ রাগ হয় চরণের। আজকাল তার মাঝে মাঝে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা মনে হয়। এমনকি আশেপাশের অনেক হোটেলওয়ালা তার রান্নার খ্যাতির জন্য বেশী মাইনেতে তাকে ডেকেছে।

কিন্তু সে যায় না। সেই নিমাইয়ের গানের মত, যাই যাই মনে করি, যাইতে না পারি। কেমন ক'রে যাবে। সে যে ভালবেসেছে এ দোকানটাকে, তার মনিবকে।

আবার হাঁক দিল ভজু, 'এ্যাই হারামজাদা।'

'আজ্ঞে এই তো!'

'কোথায় থাক ল্যাটের ব্যাটা।' ব'লে এমনভাবে সে উঠল বুঝি মারবে চরণকে। কিন্তু চরণকে পেরিয়ে কোঁচা লুটিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এল বারান্দার ধারে। হাঁকল, 'এ্যাই ভুনু সারথি, শুন্‌তা নেই যে ডাকছি।'

সে চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গা কুলি আর যাত্রীরা বিরক্ত মুখে এদিকে তাকিয়ে মনে মনে গালাগাল দিয়ে আবার ঝিমোতে লাগল। মনে মনে গালাগাল দিল কেউ। নির্জীব ঘোড়াগুলি বারকয়েক পিচুটি ভরা চোখ পিটপিট করল, কান নাড়ল, একটু টান ক'রে নিল বা গায়ের চামড়া।

ভুনু আধমাতাল হ'য়ে তার গাড়ীর মধ্যে দুদিকের সীটের মাঝখানে পেটটা দিয়ে শুয়ে আছে।

তার নতুন ঘোড়া দুটো বেঁটে আর লোমশ। একটা মরদা আর মাদী। এদেরও সে নাম দিয়েছে রাজারাণী।

কিন্তু এখন এ ভরদুপুরে যখন যাত্রী নেই, রোজগার নেই, তখন এসব ডাকাডাকি তার ভাল লাগল না। সে ভারী গলায় খিঁচিয়ে উঠল, 'ক্যা, ক্যায়া বোলতা।'

ভজু হাত ঝাপটা দিয়ে বলল, 'চালিয়ে দে।'

'চালিয়ে দে।' এতদিন ধরে ভজুকে সে দেখছে, কিন্তু লোকটার কথার মানে সে আজও বুঝতে পারে না। কেউ-ই বুঝতে পারে না। অনেকেই নেশা করে কিন্তু ওর মত দুর্বোধ্য কেউ নয়! এমনকি লারাইন ঠাকুরকে সে বুঝতে পারে। বাঙ্গালীকে তার নিজের ভাইয়ের মত মনে হয়। মাঝে মাঝে বাঙ্গালী তার প্রাণের মধ্যে কি রকম একটা অন্ধ রাগ জাগিয়ে তোলে। কার ওপর যে রাগ, সেটা ওর ঠাহর হয় না।

স্বরাজীর লড়াইয়ে যেদিন সে সুনির্মলকে নর্দমার ধার থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, যেদিন জান দেবার জন্য গিয়েছিল হাড়মুণ্ডি পুল সেইদিন তার রাগের একটা সুস্পষ্ট ধারা ছিল। সে রাগটা পুলিশের উপর। বাঙ্গালী চাকরি করে, ওর জেদ থাকতে পারে মালিকের কাছে পেট ভরানোর দাবীতে। তার তো মালিক ভগবান। যাত্রী এলে রোজগার, নয় তো সবই ফক্কিকাড়। সে কার 'পরে রাগ করবে? তবু রাগ হয়।

কিন্তু সে লাটঠাকুরকে বোঝে না। নাই-ই বুঝুক! কিন্তু এখন এ ভরদুপুরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডাকাডাকিতে তার মেজাজ বিগড়ে গেল। খদ্দের এলে, নগদ রোজগারের আশা থাকলে না হয় মেজাজটা চেপে রাখা যেত। গতকাল তাকে ঘোড়ার বকলেশের চল্লিশটা ঘুংগুর ও শিরস্ত্রাণ বিক্রি ক'রে দিতে হয়েছে অভাবের তাড়নায়। মনিয়া তাকে বিদ্রূপ করেছে। দিন রাত খোঁটা দেয়, আগের ঘোড়া দুটোকে সে ইচ্ছা করে নাকি মেরে ফেলেছে।

এসব ভেবে সে আবার দুই সীটের মাঝখানে পেটটা দিয়ে শোবার উদ্যোগ করতেই ভজু চীৎকার ক'রে উঠল, 'এ্যাই ভুনু সারথি, হাঁকাও। দেখনি কি দ্রোণাচার্য রণে মত্ত। মহামৃত্যুর হাসি হাসিতেছে বুড়া! পার্থের হস্তে'—

'শালা মাতাল কাঁহিকা।' মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে গাড়ীর ভেতর থেকেই হাত বাড়িয়ে, মুখে নানান শব্দ করে ঘোড়া দুটোকে কি ইঙ্গিত করল। অমনি ঘোড়া দুটো নড়ে চড়ে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে সোজা আস্তাবলের দিকে চলল।

ষ্টেশনের রকে চেঁচামেচিতে সদ্য ঘুমভাঙ্গা এক হতভম্ব যাত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল ভজু, 'যুদ্ধ শেষ!'.....

ভুনুকেও একটা অবসন্নতা ঘিরে ধরেছে। স্বদেশীর উন্মাদনায় সে পাগল হয়েছিল। তার কি রকম একটা বিশ্বাস হ'য়েছিল, সমস্ত দেশ জুড়ে কিছু একটা হ'তে যাচ্ছে। যদি সেটা স্বরাজ হয়, তবে কি হবে, সেসব সে বোঝে না। কিন্তু এত লেখাপড়া জানা ইমানদার আদ্‌মী যখন ক্ষেপে গিয়েছে, তখনই নিশ্চয়ই কিছু একটা চাই। যা চাই তা অজানা হ'লেও তার একটা উত্তেজনা আছে, একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু কিছু হয়েছে বলে তার মনে হ'চ্ছে না।

মন অবসন্ন, তবু লাটবাবুর কথা সে ভুলতে পারে না। পারে না বুঝতে। কিন্তু লাটবাবুর জন্য তার মনে একটা বিস্মৃতি বেদন লুকিয়ে আছে। শিক্ষিত, ভদ্রলোক আবার মাতাল, অথচ

এখানকার আর দশটা মাতালবাবুদের মত বেশ্যাসক্ত নয়। ভুনুর গাড়ীতে চেপে ফোতোবাবুর মত যায় না ভাড়াটে বাগানবাড়ীতে। এরকম কোন্ লোকটা আছে যে ভুনুর গলা জড়িয়ে ধরে। সে একমাত্র ভজুলাট। কোন্ বাবু তার সঙ্গে দোস্তি করে। লাটঠাকুর। দুটো পয়সার দরকার হলে কে দেয়। শরীফ মেজাজ লাটবাবু। সেইজন্যই তার ভাবনা হয়।

ভাবে, তার নিজের কানা ভাঙ্গা তলা ফুটো সংসারে না হয় অহরহ জ্বালা আছে। তারই না হয় একটা চাকা ভেঙ্গে গেলে, গদী একটা ফেটে গেলে, মাথায় হাত দিয়ে বসতে হয়। তার রাজারাণী ম'রে গিয়ে তাকেই না হয় ভিখিরী ক'রে দিয়েছিল। হাঁ, লাটবাবু তাকে টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু টাকা সে নেয়নি। কেন নেবে! নারাইন ঠাকুরের সোনা ছেড়ে এসেছি কি লাটবাবুর টাকা নেব বলে! গাড়োয়ান হতে পারি, তা বলে কি ইমানদারের তেজ নেই! সে ধার করেছে, মনিয়ার গায়ের সব রুপোর গয়না বিক্রি করেছে, বিক্রি করেছে ঘরের যাবতীয় বস্তু। সে রাগ মনিয়ার আজও আছে।

কিন্তু লাটঠাকুরের তখলিফ সে বোঝে না। যেমন বোঝে না সে তার বউ মনিয়ার সবখানি। তার এই ছ্যাকরা গাড়ীর গাড়োয়ানের প্রাণে তার রূপসী বউ মনিয়া, (লাটঠাকুর আবার তাকে মিনিলোসা কি বলে) কেবলি কি রকম একটা সংশয়ের আগুন জ্বালিয়ে রাখে। মনিয়ার পেটের ক্ষিধেটা সে বোঝে, কিন্তু মনের দুরন্ত ক্ষিধেটা এত কেন সে বুঝতে পারে না। হয় তো মনের নয়, সেটা দেহেরই। মনিয়া সবসময়ই পেটে খেতে যেমন ভালবাসে, দেহের ক্ষিধেটাও তার প্রায় সেই রকম! মায়ের কোলে শিশু যেমন কেবলি খায়, খায় আর ঘুমোয়, মনিয়া যেন তেমনি। চলতে ফিরতে হাঁসের মত তার জৈবিক তাড়না। হয় তো এটা তার শুধুমাত্র স্বভাব। চরিত্র নয়।

তা'হলে স্বভাববশেই সে বাঁকা হেসে বলে থাকে, ভুনু কোচোয়ানের বহুড়ি হওয়াটা তার পক্ষে খুবই অপ্রীতিকর। কি তার প্রীতিকর সেটার আন্দাজ নেই ব'লেই বোধ হয় রঙ্গ করে বলে ভুনুকে, কোন্দিন দেখবে কার সঙ্গে ভেগে গেছি। রাগ করলেও সে একথা বলে। বলার পরে তার খিল্‌খিল্ হাসির রন্‌রন্ শব্দ ভুনুর বুকের আগুন গনগনিয়ে তোলে।

ভুনু তখন ঠাণ্ডা হয়ে থাকলে কি হয়, বলা যায় না। কারণ ভুনু একথা শুনলে ঠাণ্ডা হয় না। এ যদি ঠাট্টা হয়, তবে তা ভুনুর সহ্যের বাইরে। সে রাগে কিন্তু খেই পায় না।

তা ছাড়া মনিয়ার একটু হলা গলা ভাব সকলের সঙ্গে। পড়শী ছোকরার অনেকে তার রূপমুগ্ধ অনুরাগী। মনিয়ার ভাবটা এমনি যেন, রূপ দেখে যদি কেউ মুগ্ধ হয়, হোক্। বলি কোন্ মেয়েটা তার রূপমুগ্ধকে প্রশ্রয় না দেয়।

তা বলে তার হাহাকার নেই। ভেতরটা তার ভরাট। সেইজন্যই বুঝি খর চোখের তারা দুটো তার সব সময় বিচিত্র অর্থে বেঁকে থাকে। এদিক থেকে ভেবে দেখলে, বাইরের জীবনে ভুনুর নায়কত্ব আছে, ঘরের জীবনে আছে শুধু নায়িকা।

ভুনুকে পেলে সব ভোলে। যাকে পেয়ে সব ভোলে, আবার তারই প্রাণে কেন এমনি ধারা হুল ফোটানো, সে সৃষ্টিছাড়া মনের কথা জানে মনিয়ার অন্তর্যামী।

তবু ভুনুর জীবন বিস্তৃত। গাড়োয়ান হিসাবে তার চিন্তার ক্ষেত্র খানিকটা প্রশস্ত। তার কাজের মাঝে ও অকাজে ভাবনা যখন বড় হ'য়ে ওঠে, তখন সে আর মেজাজ রাখতে পারে না। আর মনিয়া যদি খারাপ হয়, তা' হলেও এ জীবনে মনিয়াকে ছাড়া তার চলবে না।

বেশ, তার নয় সবটাই শ্রীহীন। কিন্তু লাটঠাকুরের প্রাণে এত বিরাগ কেন? বড় রাস্তার

উপরে অমন বাড়ী, ষ্টেশনের ধারে অমন চা-খানা একটা যার রয়েছে তার ভাবনা কি? চা-খানা নয়, লোকে এটাকে 'ছিমৃতী-কাফে' না কী একটা বলে। যে যা খুশী বলুক সিদানী সাউ যে তার ছোলা ছাতুর দোকানটার নাম দিয়েছে রাম-লছমন ভাণ্ডার। তাতে কি যায় আসে। দোকানটা ছোলা ছাতুরই, জরুর রাম-লছমন পাওয়া যায় না সেখানে। তবে হ্যাঁ, লাটঠাকুরের দোকানে মাংসের রকমারি মজাদার খাবার তৈরী হয়। তার দামও অনেক। ভুনু সেসব প্রায়ই খেয়ে থাকে। ভজুলাট তাকে ডেকে নিয়ে খাওয়ায়। ছিমৃতি টিমৃতি একটা কিছু হতে পারে এ দোকানটা।

আর সমস্ত দোকানটার দিকে তাকালে হঠাৎ চোখ ফেরানো যায় না। কিন্তু গণেশ ঠাকুরের মূর্তিটা তার দোকানে আছে কিনা সেটা নজরে পড়েনি কোনদিন।

আর লাটঠাকুরের ঘরের খবর অবশ্য সে জানে না। জানে না তার বউ ছেলেমেয়ের কথা। তার বাবাকে, দেখেছে বাড়ীর বাইরের বারান্দায় একটা চেয়ারে সারাদিন গা এলিয়ে দিয়ে বুড়ো মানুষ বসে থাকেন। সামনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। দৃষ্টিটা যেন একটু ঘোলাটে মনে হয়। শরীরটা এখনো শক্তই দেখায় কিন্তু সেটা যেন পাতাহীন ঝড়ো রুক্ষ মহীরুহ।

সংসারটা ভরাটই মনে হয়। তবু তার মনে হয় লাটঠাকুরের বুকের মধ্যে যেন কিসের আগুন লুকিয়ে আছে। সে আগুন কিসের তা সে ঠিক ঠাহর পায় না। কিন্তু লাটঠাকুরের সব সময়ের 'চলাও জ্বালাও', ছাড়া কথা নেই। প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে রয়েছে একটা ছটফটানি মনটার ঝ'ড়ো বেগ, অসহ্য তিক্ততা। এত কথাও হয় তো সে বোঝেনি, বুঝেছে তার প্রাণের জ্বালাটা। কাজে কথাতেও লোকটা দ্রুত, বেগবান।

সে ভেবেছিল, লাটঠাকুর হয়তো তার রূপসী বউয়ের প্রেমে পড়েছে। সে প্রায়ই মিনিলোসার কথা বলত, এখনও বলে। আর লাটঠাকুরদের মত লোকেরা যখন গাড়োয়ানের বউয়ের কথা এত বেশী বলাবলি করে, তখন বুঝতে হবে, বাবুর মনে রং লেগেছে। ব্যাপারটা ভুনুর ঠেকে শেখা। ছোট ঘরে রূপ থাকে সত্যি। বড় ঘরের রূপের সঙ্গে যেন তা আলাদা। ছোট ঘরের রূপকে ধুলোমাটি ও দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে হয়। বড় ঘরের রূপের উপর আবার ঘষা মাজা পালিস আছে। তা ছাড়া, গাড়োয়ানের ঘরের রূপ তো আর ধোয়া সাজির ফুলগুচ্ছ নয়। তাই ষ্টেশনের হেড় টিকেট কালেক্টর থেকে প্রতিবেশী ভদ্রঘরের পড়ুয়া অপড়ুয়া নোংরা যুবকদের দল ও ভুনুদের বস্তির বাড়ীয়ালা, জমিদার প্রসন্ন চাটুজ্জে নাকি নাম সেই লাল ড্যাবা চ'খো টেকো মাথা পর্যন্ত বেশ খানিকটা মনিয়া মনিয়া বাই আছে।

আস্তাবলের কাছেই নাড়ু পুরোতের গলি। নাড়ু পুরোতের গলি বলতে সবাই বোঝে ওটা বেশ্যা-পল্লী। ওই গলিটাতে যখন ওইসব ব্যক্তিরা ও ছোকরারা যায়, তখন বোধ হয় ওর কাছাকাছি বলেই মনিয়াকে আর আলাদা করে চিন্তা করতে পারে না।

পণ্ডিতজনেরা বলেন, নাচওয়ালী ও বেশ্যা স্বর্গেও আছে। দেবতাদেরও ওসব দরকার আছে। সেইজন্যই উর্বশী মেনকার জন্ম। এত রূপ তাদের যে, একজনের হৃদয় ভরানো তার দ্বারা সম্ভব নয়, শোভাও পায় না।

তাই ভুনু যখন অতিরিক্ত মাতাল হয় আর মনিয়ার দুর্জয় হাসিভরা মুখটা মনে পড়ে বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে, মনে হয় এ সংসারে সমস্তটাই মিথ্যে। তখন সে ভাবে, বুঝছি আসমানের চিড়িয়াকে সে তার ময়লা খাঁচাটায় বন্দী করে রেখেছে। হয় তো মনিয়া রাণী হওয়ার মত আওরত, যাকে নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে লড়াই ও অনেকের অনেক কথা হতে পারে। হয় তো সে

অনেকের জন্য, একলার নয়। ভুনু শুধু তাদের মত একজন কৃপাপ্রার্থী হয়ে কাছে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু লাটঠাকুরের ব্যাপারটা তাকে আবার কথঞ্চিৎ আরাম এনে দেয়। এ লোকটা মিনিলোসার কথা বলে বটে সেটা অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম। যেমন আর দশজনের কথা বলে, যেমন বলে ঘোড়ার কথা, চা-খানার কথা বা খদ্দেরের কথা, ঠিক তেমনি, আর কিছু নয়।

তবুও মনে হয় লাটঠাকুরকে বাইরে থেকে যা দেখা যায়, সে তা-ই নয়। তার একটা ভেতর আছে, যার প্রকাশ শুধু উচ্ছৃঙ্খল ভাবনার মধ্যে। কিন্তু ভুনু তার সবটুকু বোঝে না।

গাড়ীটা আস্তাবলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গেট বন্ধ আস্তাবলের। ভুনু নামতে যাবে এমন সময় দরজা খুলে গেল। ঘোড়া দুটো আপনি ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভুনু গাড়ী থেকে নেমেই দেখল পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মনিয়া। খরচোখের বাঁকা চাউনি। বলল, 'কেয়া, স্বরাজী কা লড়াই হোতা টিশান মে?'

বলতে বলতে দরজা বন্ধ ক'রে দিল সে। ভুনু বলল, 'কাঁহে?'

'এতনা জলদি চলা আয়া? ক্যায়া, কামায়া বহুত?'

ভুনুর মেজাজ খারাপ হ'য়ে উঠল, 'তুহার ক্যায়া জরুরত?'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে মনিয়া নির্বিবাদে ভুনুর ট্যাঁক হাতড়াতে লাগল। ভুনু খানিকটা সরে গিয়ে বলল, 'কাঁহে, বাতা পহ্‌লে।'

'হমারী খুশী।' বলে সে ভুনুর ট্যাঁক থেকে বার করলে পাঁচ আনা। পয়সা হাতে নিয়ে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল সে, 'এতনা কামায়া? হ্যায় মেরী মরদ?'

ভুনুর রাগ চড়তে থাকে। সে বলে উঠে, 'লে. শালা টিশান্ মে হ্যায় লাটবাবু, ঘর মে হ্যায় এয়সা না-বুজ আওরৎ।'

কিন্তু মনিয়া তবু হাসে। বলে, 'হ্যাঁ, লাটবাবু তুমকো ভাগা দিয়া? উস্‌সে পয়সা কাঁহে না মাঙ্‌কে লে আয়া?'

এমনি কাটা কাটা বেঁধানো কথা মনিয়ার। কিন্তু কটাক্ষে তার দুর্জয় হাসি চাপা পড়ে আছে।

এরপরে ভুনু বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই মনিয়া তাকে ধরে ফেলে। চলে খানিকটা টানাটানি হ্যাঁচড়াহেঁচড়ি।

আশ্চর্য, মনিয়া যেন ছেলেমানুষ। যেমনি তার কথা, তেমনি তার কাজ। হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিয়ে বলল, 'এ্যায়সা করেগা, তো হম জান দে দেগা।'

ভুনুও বলে, 'যা আভি যা।'

মনিয়া বলে, 'তুম ভি চল।'

এবার হাসতে হয় ভুনুকে। সে অবাক হয় মনিয়ার দিকে তাকিয়ে। এ রূপ ও কথার ধার সে বোঝে না।

এমনি বোঝে না লাটবাবুকে। চারটে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মনিয়া চারটে রুটি খেয়ে রঙ্গ করতে পারে। তবু সে তাকে বোঝে না। এমনও হয়েছে, উপোস থেকেও সে তেমনি হেসেছে ভুনুকে নিয়ে। ওর কিছু একটা চাই, জরুর। তা' নইলে এরকম হ'তে পারে না। যেমন চাই কিছু লাটবাবুর, বাঙ্গালীর। তেমন চাই আমার, দুটো আরও তেজী ঘোড়া, আর দিন ভর খালি সোয়ারী।

ভুনু বলল, 'ক্যায়া, ফিন রোতা কাঁহে?'

'হম রোয়েগা। খুশী হামারী!'

'কাঁহে?'

'তুম হমকো মরণে বোল্‌তা।'

'ও তো দিম্মাগি হ্যায়।'

চোখের জল প্রায় শুকিয়ে আসে মনিয়ার। বলে, 'দিন ভর তুম্‌কো ঘরমে রহ্‌নে হোগা।'

'কাঁহে?'

'একেলী হম্‌কো ডর লাগতা।'

'কিস্‌কা ডর্‌।'

'আদমি কা।'

বলতে বলতে এবার সে সত্যি কেঁদে ফেলে আবার। বলে 'তুম কুছ নেহি সমঝতা।' তার এ কান্না মিথ্যে নয়। সে একলা থাকতে পারে না। আদমির ডর নয়, কিছু চাই। তার কিছু করতে হবে। ভেতরে ভেতরে একটা অবুঝ বাসনা নিয়ত আবর্তিত হ'চ্ছে। এক এক সময় তার মনে হয়, ভুনুকে ঘরে রেখে সে নিজেই গাড়ী চালিয়ে আসে। কিন্তু একলা জীবনে তার বড় হাঁফ লাগে।

ভুনু একটু চুপ থেকে বলল, 'আচ্ছা চল্‌, ইটাগড় বড়া ভাইকে পাশ!'

বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল মনিয়া, 'সচ্‌?'

'হাঁ।'

'এত্‌না টাইম কাহে নহি বোলা?' ব'লেই মনিয়া ছুটল ঘরের ভিতরে।

ভুনু বোকাটে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল। এ আজব দুনিয়ার কোন কিছুর মানে বোঝে না সে। কই এক মিনিট আগেও তো সে একথা ভাবেনি।

নিজের উপরেই তার রাগ হ'তে লাগল। নিজের মনকেও সে চেনে না। চেনে না বলেই বোধ হয় আবার চুপচাপ সে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে গেল। গেল রাস্তায়। তারপর হাঁটতে আরম্ভ করল।

তিনটে বাজে। ভজু তখনো বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাগলের মত বকছে।

এ সময়েই এল ভজুলাটের দুই ছেলে, হাত ধরাধরি ক'রে। দূর থেকে মাতাল বাপকে দেখেই তাদের টানা টানা চোখে শঙ্কার ছায়া পড়েছে। বড় ছেলেটির ভয় একটু বেশী। সে নামে গৌর, দেখতে গৌরাঙ্গ। ভজনের নিখুঁত ছাপ তার মুখে। ভাবটা নেই। চিন্তায় ও জীবনধারণে যেন যুঁইয়ের আধিপত্যটাই তার উপরে বেশী। তের বছরের ছেলে নয় যেন শঙ্কিত কিশোরী। মামার বাড়ীর দিক থেকে টানে গৌরকে, গৌরও মামার বাড়ীর ভক্ত। বাপকে সে ভয় পায়। পারলে আর সামনে নড়তে চায় না।

পরেরটি এগার বছরের নিতাই! সে শ্যামবর্ণ, তার মায়ের মত। কিন্তু নিতাই সবল, স্বাস্থ্যবান। তার টানা চোখে যেটা শঙ্কা বলে মনে হয়, সেটা আসলে কৌতূহল। তার আবেগ হাসিতে, রাগে, হাতে পায়ে। মাথায় ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল, তার মায়ের মত। ঘরে তাকে সবাই নিষ্ঠুর ছেলে বলে জানে। গৌর থেকে শুরু করে ছোট ছোট আরও তিনটি ভাই বোন, কেউ

তার মায়ের হাত থেকে রেহাই পায় না। তার জেদ, তার রাগ, হাসি কান্না সবই বেশী। সে অশান্ত কিন্তু অকপট গাম্ভীর্য তারই বেশী। সে উদ্দাম, কিন্তু গান পাগল। সে যেন সুর লহরী, গানের অন্তরের অদৃশ্য মূর্ছনা। গানের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দিয়ে স্বপ্ন দেখে আর দোলে। তার ভাবনা আছে, ভাবুকতা নেই বুড়ো মানুষের মত। গৌরের মত নিস্পৃহ নয় সে। সরস্বতীকে তার ভূগোল বিজ্ঞানের চেহারায় বড় ভয় কিন্তু হাস্যময়ী নারীমূর্তিটার পরম ভক্ত। সে গৌরের ছোট, কিন্তু বড়। সব মিলিয়ে সে দুর্বার কিন্তু এ পোড়া সংসারের দুর্নীতি তার মান দেয় না। যুঁই তাকে সারাদিন চেঁচিয়ে বকুনি দেয়, রাতে তার ঘুমন্ত মুখে চুমু খায়! আর ঘুমের মধ্যে নিতাইয়ের বুক উজাড় করে যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে, তা যেন সারাদিনের জমানো সব বেদনাটুকু নিঃশেষ হয়ে যায়। সে নিঃশ্বাসটুকু হৃদয়ে ভরে যুঁই শুয়ে থাকে। পরদিন নিতাইয়ের ঘুম ভাঙ্গে বেদনাহীন ক্ষোভহীন পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে। গতদিনের কথা সে ভুলে যায়, হৃদয় যেন নিত্য কুঁড়ি ফোটা ফুলের মত সতেজ ও নতুন। কেমন করে, তা সে নিজেই জানে না। তারপরে আবার মায়ের বকুনি, দাদুর কানমলা, ভাইবোনের সঙ্গে ঝগড়া, পাড়ার নেড়িকুকুরটার অসহ্য বেঁচে থাকা, বাবার মাত্‌লামো, প্রতিবেশীদের হীনতা ইস্তক, একবার মাত্র খেয়ে সারাদিন কাজ করা মানুষগুলোর জন্য তার বিচিত্র টনটনানি। আর সব মিলিয়ে তার বুকের মধ্যে যেন একটা বিরাট ফানুস ফুলে ওঠে।

সে যেমন মামার বাড়ীর ভক্ত নয়, তেমনি মামার বাড়ীও তাকে টানে না। যদিও চেহারাটা তার নরাণাং মাতুলাক্রম। তাকে টানে খানিকটা ভজু, সেজন্য সেও বাপকেই রেয়াৎ করে বেশী।

বাপের কাছ থেকে খানিকটা দূরেই তারা দু'ভাই দাঁড়িয়ে পড়ে। গৌরই দাঁড়িয়ে নিতাইকে আগে ঠেলে দিল। নিতাইও শক্ত করে গৌরের হাত টানে। ঠেলাঠেলি করতে থাকে পরস্পরে।

ব্যাপারটা ভজুর নজরে পড়তেই সে জড়ানো গলায় চীৎকার করে উঠল, 'জরণ!' চরণ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, 'বাবু!'

চোখ বুজে বলল ভজু, 'লাটের পো'য়েরা দাঁড়িয়ে আছে হারামজাদা, হাত ধরে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।'

চড়চাপড় পড়ার আগেই চরণ ছুটে গেল। শুধু অবশ্য চড়চাপড়ই নয়, ছেলে দুটোকে, বিশেষ গৌরকে ভালবাসে চরণ।

ভজু দুহাত বাড়িয়ে ডাকে, 'এস.......আমার চোখের জোড়া মণি এস।' তারপর হঠাৎ গান জুড়ে দেয় বেসুরো গলায়।

এস দুটি ভাই,
গৌর নিতাই,
দ্বিজমণি দ্বিজরাজ হে।

ততক্ষণে ছেলে দুটোকে নিয়ে এসে পড়ল চরণ আর রাস্তায় ও স্টেশনের রকে আস্তে আস্তে মাতলামির মজা দেখবার লোভে ভিড় করেছে অকাজের লোকেরা।

ছেলে দটি কাছে আসতেই ভজু তাদের কাছে জানু পেতে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠল,

একি, একি হেরি বনমধ্যে,
দুটি নিরালার পুষ্পসম
জ্যোতির্ময় দুই বালকে? কেন বক্ষে

হাহাকার উঠিছে আপনি!
ওরে, তোরা কারা? কি বা পরিচয়?
কে সে ভাগ্যবান পিতা, কে বা মাতা—
যার কোল ভরে আলো করে—
বন মধ্যে ফুটেছিস্ বিশ্বের হাসির মতন?

ইতিমধ্যে লজ্জায় রাগে ও ভয়ে গৌরের মুখ লাল হয়ে চোখ ফেটে জল এসে পড়েছে ও নিতাই অশ্রুহীন চোখে শক্ত শরীরে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

চরণের রাগ হচ্ছে যেন স্বামী সোহাগিনীর রাগ। তবু কাণ্ড দেখে সে খুঁক খুঁক করে হাসছিল মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। সে হাসি ভজুলাটের চোখে পড়লে আর রক্ষে ছিল না কিন্তু ছেলেদুটোর জন্য তার মায়া হচ্ছিল। কর্তা নিজে মাতলামো করে, সেকথা আলাদা, এদের নিয়ে কেন?

কিন্তু ভজু কোনদিন তার ছেলেমেয়ের গায়ে হাত তোলেনি। এদিক থেকে তার অদ্ভুত সংযম। যুঁই যদি কোনদিন বিরক্ত হয়ে তার সামনে গায়ে হাত তোলে, তবে সে রাগের চেয়ে অসহ্য বিদ্রূপে যুঁইয়ের হৃদয় ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সেটাই অবশ্য যুঁইয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সে কেঁদে বলে, 'রাগ করলে মা বুঝি ছেলের গায়ে হাত তোলে না? তা বলে কি সেটা মার?'

তা বটে। ভজু স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে এটা আসলে মার নয়। তবু সে বলে, 'দেখ নিতায়ের মা, গন্ধ ছড়ালে যেমন ফুলের দোষ নেই আর ঝরে পড়লে দোষ নেই গাছের, তেমনি এই বাচ্চাগুলো। মেরে যদি তুমি ওদের ছেলেমানুষি বন্ধ করতে পারতে, আপত্তি ছিল না কিন্তু উলটে যে তুমিই পরে জব্দ হবে।'

তা ঠিক, তবু যুঁই না বলে পারে না, 'সে জব্দ হওয়া আমার ঢের ভাল তবু স্বস্তি তো পাব। এ জীবনে তো কেবলি জব্দ হয়েছি। স্বস্তিটুকু না থাকলে পারব না।'

সেই ভাল। সুখের চেয়ে স্বস্তি, এই তো সংসারের বেদ। চলতে গিয়ে যে পা'টি প্রথম ফেলছি কোথায়, খালি সেটুকু দেখে নেওয়া। তারপর সামনেটা কেবলি ধূধূ পেছনটা ধাঁধা।

কিন্তু ভজুর বুকের মধ্যে যেন একটা মস্ত পশু হাঁক পেরে গর্জে ওঠে। ইচ্ছে করে সমস্ত জগৎটাকে দু'হাতের মুঠোয় ধরে দুমড়ে ফেলে। সে স্বস্তি চায় না, চায় সুখ।

তবুও সামনে পিছনের সবটা ভুলে সে আকণ্ঠ পান করে। অ্যালকোহলের তীব্র ঝাঁঝ গলা বুক জ্বালিয়ে, লিভার কোষ্ঠ পুড়িয়ে খাক করে তার সমস্ত চেতনাকে গ্রাস ক'রে ফেলে। সে শুধুমাত্র ভজুলাট, শ্রীমতী কাফের মালিক। না, সে কোন কিছুরই মালিক নয়। একদিন সে শ্মশান থেকে তার জীবনের পথ বেছে নিয়ে ফিরেছিল। যেখান থেকে এসেছিল, আজ যেন সে আবার সেখানেই ফিরে চলেছে। আজ নিজেকে তার ভারবাহী পশু মনে হ'চ্ছে। জীবনের ভারবাহী। সেটাকে সে ছুঁড়ে ফেলতে চায়। এর অর্থ কি! আত্মহত্যা?

গৌরকে কাছে টানতেই সে এল, কিন্তু নিতাই শক্ত করে রাখল তার শরীরটাকে। ঘাড় বাঁকিয়ে রইল অন্য দিকে।

ভজু আদর ক'রে বলল, 'কি হয়েছে বাবা। রাগ হয়েছে?'

এবার নিতাইয়ের চোখে জল এসে পড়েছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ।'

ভজু গলা আরও নামিয়ে বলল, 'বেশ তবে আর কথা নয়।'

এক মুহূর্ত পরে নিতাই বলল, 'মা তোমাকে ডেকেছে। তাড়াতাড়ি চল।'

আচমকা যুঁইয়ের উপবাসী শুকনো মুখটা মনে করে বুকটা দুমড়ে উঠে উঠে নেশাটা টাল খেয়ে গেল তার। তার চোখে ভেসে উঠল, পেটে ক্ষুধা নিয়ে, সমস্ত কাজকর্ম সেরে, ভাত নিয়ে তার জন্য অন্ধকার গলিটার মুখে অপেক্ষা করছে। হয় তো বা ভ্রূ কুঁচকে নজর করছে, তাকে আসতে দেখা যায় কিনা। কিন্তু সেখানে, রাস্তার বাঁকে শুধু চৈত্র দুপুরের রোদ কাঁপছে ঝিলিমিলি।

বুঝি জীবনের পথের ওই দূর বাঁকটাতে সবটাই মরীচিকার মত মিথ্যের ঝিলিমিলি। এ জীবনে যার জন্য প্রতীক্ষা করা গেছে, সে কি এসেছে? না কি এ প্রতীক্ষা শুধু এ সংসারের আর দশটা নিয়মের মত!

'চরণ!' পরিষ্কার গলায় বলল ভজু, 'এদের কিছু খাইয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিস্।'

চরণ খালি বলল, 'আজ্ঞে!'

তারপব ফিরে ভজু বারান্দা থেকে নামতে গিয়েই দেখল মাতলামির মজা দেখার দর্শকের ভিড়। সবাই দাঁত বার করে হাসছে তার দিকে চেয়ে। অমনি সে চীৎকার করে উঠল, 'চরণ!'

'আজ্ঞে!' চরণ ছুটে এল।

লোকগুলোকে দেখিয়ে বলল, 'এ সব শালার কাছ থেকে চার আনা ক'রে প্যালা নে মজা দেখার।'

বলে সে জনতার দিকে এগুতেই সব এধারে ওধারে ছুটে পালাতে লাগল। ছুটতে গিয়ে আছাড় খেল কেউ কেউ। যেন একটা সাংঘাতিক জীব এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

ভজু আপন মনে হেসে উঠে বলল,

মাগো, জন্ম দে' জগৎ হাসালি,
ছেলে ব'লে পুতুল দিলি।

শালাদের গায়ে একটু মদের ছিটা দিয়ে দে।' বলে সে এগুতে গিয়ে আবার থামল। দেখল, সবাই পালাল, একটি ছেলে পালায়নি। ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে বুক টান করে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে. অপলক চোখে ভজুর দিকে তাকিযে।

ভজু জিজ্ঞেস করল, 'তোর নাম কি?'

জবাব এল, 'কানু।'

'কানু? তা' বেশ! তুই কেন পালালি না?'

ছেলেটি বলল, 'কেন?'

কেন? তা ঠিক। ভজু বলল আপন মনে, 'কানু আর কেন? বেশ। তোদের বাড়ী কোথায়?'

'ঠাকুরপাড়া।'

'বাপের নাম?'

'শ্রী শ্রীধর—'

ভজু বলে উঠল, 'চাটুজ্জে। তুই যে অসুরের ঘরে দেবসূত রে! তুই মাংস খাস?'

এইবার ছেলেটি কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে বলল, 'খাই।'

'আমি খাওয়ালে খাবি?'

ছেলেটি নিশ্চুপ। ভজু ডাকল, 'চরণ'।

চরণ রুষ্ট মুখে বলল, 'আজ্ঞে।'

'একে চপ কাটলেট আর মাংস খাইয়ে দে।'

বলে সে এগুবার উদ্যোগ করতেই চরণ বলে উঠল, 'কিন্তু আজকে যে মাল একেবারে—'

'চোপরাও হারামজাদা। যা বল্‌ছি তাই কর।' বলে সে চলে গেল।

ছেলেটি লজ্জায় তাকাতে পারল না চরণের দিকে। বোধ হয় পালিয়ে যাবার কথা ভাবছিল। কিন্তু চরণ তার আগেই তাকে টেনে নিয়ে গেল দোকানের মধ্যে।

গৌর নীরবে কিছুটা গোমড়া মুখে অভ্যর্থনা করল ছেলেটিকে। নিতাই ইতিমধ্যে সোজা গিয়ে বসেছিল বাপের চেয়ারটিতে। সে বলল, 'নাম কি?'

কানু বোধ হয় একবার ভেবে দেখল তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কিনা। পরে বলল, 'কানু'।

'তুই স্কুলে পড়িস্?'

'পড়ি।'

'কোন্ ক্লাশে?'

'ক্লাশ সেভেন।'

একটু দমে গেল নিতাই। সে পড়ে ক্লাশ ফাইভে। কিন্তু কানুকে তার ভাল লেগে গিয়েছে। বলল 'বোস্ এখানে।'

তারপর শুরু হয় তার নিজের আধিপত্য। সে ভেতরের অন্ধকার ঘরটায় গিয়ে সব খুঁটে খুঁটে দেখে। কৈফিয়ত তলব করে চরণের কাছে কোন জিনিসটা মনঃপূত না হলে। মাংসের ঢাকনাটা খুলে দেখে সেটা ঠিক আছে কিনা, কিংবা চেখে দেখে। উনুনের কাছে গিয়ে বায়না ধরে রান্না করবে বলে। কিছু না করতে দিলেই যুদ্ধ শুরু হয় চরণের উপর। হয় তো কয়লা ভাঙতে শুরু করে, পেঁয়াজ, শসা কুচোয়, খায়, ছড়িয়ে ফেলে খানিকটা মাষ্টার্ড।

তারপর খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, 'সামনের ঘরটা সাদা, ওটা আমাদের দোকান। এ ঘরটা কালো, এটা আমাদের নয়।' টিনের চালা থেকে বেয়ে পড়া মাকড়সার ঝুলগুলো দেখে হাসতে গিয়ে শিউরে ওঠে। যেন কোন ক্লেদাক্ত সরীসৃপ ঝুলছে তার সামনে। হয় তো মনে হয়, এ অন্ধকার ঘরটাতে লুকোচুরি খেলা ভাল জমতে পারে। সেজন্য মাঝে মাঝে হামলা পড়ে গৌরের উপর। কিন্তু ইঁদুর ও আরশোলার লুকোচুরি হুটোপুটি এমন শুরু হয় যে, তার লুকোচুরি জমে না। তখন সে একটা লাঠি নিয়ে বন্য ব্যাধের মত ইঁদুর ও আরশোলার পেছনে তাড়া করে। বাড়ীর সবাইকে ফাঁকি দিয়ে যে গালাগালগুলো শিখেছে, সেইসব 'শালা বানচোত' খৈ-এর মত ফুটতে থাকে তার মুখের মধ্যে।

চরণ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে কখন বুঝি বা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে জ্বলন্ত উনুনে, ফেলে দেবে জলের জালাটা, ভাঙ্গবে কাপ প্লেট, আছাড় খেয়ে চূর্ণ করবে নিজেরই হাত পা।

তারপর হন্তদন্ত হয়ে বাইরের আলোকিত ঘরটায় ছুটে গিয়ে আবার সন্তর্পণে উঁকি মারে এ অন্ধকার ঘরটার দিকে। যেন বিভীষিকাময় রাজ্যটার সীমা পেরিয়ে গিয়ে সে দূর থেকে এ জায়গাটাকে দেখছে। তারপর চোখ বড় বড় করে হাতছানি দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে চরণকে ডাকে, 'চলে এস, ও ঘরে ভূত আছে।'

কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপরেই সে লাফ দিয়ে উঠে যায় প্রোপ্রাইটারের চেয়ারে। ক্যাশের ড্রয়ারটা খোলে আর বন্ধ করে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'চরণ, এখানে কত হয়েছে?

অন্যমনা চরণ ভাবে বুঝি সত্যিই বাইরে কোন খদ্দেরকে খেতে দিয়ে এসেছে। সে ছুটে আসে তাড়াতাড়ি হিসেব দিতে।

নিতাই তখন প্রাণভরে হাসে।

গৌর অত্যন্ত রুষ্টমুখে এসব চুপ ক'রে দেখে, একটি কথাও বলে না। কিন্তু বাড়ী গিয়ে প্রত্যেকটি কথা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার মায়ের কাছে অভিযোগ করে এবং তার শান্ত চোখ বড় করে আগ্রহভরে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, এ ব্যাপারের কোন প্রতিকার বা শাস্তির আশা আছে কিনা।

ভজু নিতাইয়ের এসব দেখেশুনে বলে, 'যাক, জীবনে যদি কিছুই তোর না হয়, শ্রীমতী কাফের প্রোপ্রাইটারিটা তোর জন্য রইল।'

আর নিতাইয়ের এ খেলা দেখে চরণ যেন সত্যি পেছনের এ ধোঁয়াচ্ছন্ন, ঝুলপড়া এবড়োখেবড়ো উনুন ঘরটায় ভূতের মত শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে। এই শ্রীমতী কাফেতে একটি কথা সে বারবার শুনেছে, 'আমরা সর্বস্ব পণ করা মুক্তি চাই।' নারায়ণ যাবার সময় বলেছিলেন,'চরণ, মুক্তির সাধনা কর।' সে মুক্তি কী? তার বদ্ধ প্রাণের মুক্তির জন্য একজনকে সে ভালবেসেছিল। বারবণিতাকে। কিন্তু দুজনেই তারা আজ নতুন ক'রে বাঁধা পড়েছে। মুক্তি তো তারা কেউই পায়নি। তবে কি মুক্তির সাধনা তার বিফলে চলে গিয়েছে? কিন্তু তাকে ছাড়া চরণ সে মুক্তি চায় না। তবে কি মুক্তি পাওয়া যাবে না? যে মুক্তির কথা শুনেছে এখানে সে মুক্তির অর্থ কি?

সে মুক্তির অর্থ জানে না চরণ!......এ অন্ধকার ঘরে হুস ক'রে একটু হাওয়া এসে মাকড়সার ঝুল দুলে ওঠে। নিঝুম পেয়ে ইঁদুর আরশোলার হুটোপাটি শুরু হয়। কাঁচা মাটির ভেজা মেঝে, কয়লা ঘুঁটে জল, জালা, টিন, উনুনের গন্‌গনে্ আঁচে চরণের মূর্তিটা জ্বলজ্বল করে।

প্রাণটা তার কিশোর নিতাইয়ের মত খেলা করতে চায়।......মানুষের যে আত্মা স্বর্গগামী না হয়ে মর্ত্যে ফেরে, তাকে সবাই বলে ভূত। চরণ যেন তাই। সে মুক্তি চায়। এ ভূতুড়ে জীবন, নিতাইয়ের এ শঙ্কা ভরা ভূতুড়ে ঘরটা ছেড়ে মুক্তি চায় সে।

কিন্তু ঘরের বাইরে মুক্তি কোথায়! মুক্তি দাও চরণকে, সর্বস্ব পণ করা সেই মুক্তি!

মুক্তি! কে জানে, কোথায় আছে চরণের সেই সর্বস্ব পণ করা মুক্তি! যদি বল, স্বরাজ হল সেই মুক্তির প্রতীক, তবে বলতে হয় উনিশশো চৌত্রিশ, অর্থাৎ গত বছরের পর থেকে সেই মুক্তির স্বাদ নোন্‌তা হয়ে গেছে। বাইশ সালের মত আবার একটা বিশ্রী অবসাদ এসেছে।

মুক্তির মারের দাগ শ্রীমতী কাফের সর্বাঙ্গে। তার দরজায়, জানলায়, আসবাবে, তার মালিক ও চাকরের হৃৎপিণ্ডে। তার দাগ ঘরে ঘরে, পথে পথে, দেয়ালে দেয়ালে। দাগ তার ঠোঁটের কোষে রক্তে, বুকের ছিন্ন পাঁজরে, মায়ের কান্নায় ও প্রেয়সীর ভাঙ্গা বুকে।

আবার সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। গান্ধীজী বলেছেন, দেশবাসী তাঁর সত্যাগ্রহের মর্ম অনুধাবন করতে পারেনি, আমরা পারিনি ইংরেজ শাসকদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে। এর পরে আইন অমান্যের দায়িত্ব তিনি একলা গ্রহণ করবেন।

বাংলা এসেম্বলীতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কংগ্রেসকে যেন পরবাসী ক'রে তুলল। তাদের মন বেঁকে গেল বাংলার প্রতি। সমস্যা শুধু বামপন্থী সুভাষবাবুকে নিয়ে। সাবা ভারতের, এমনকি গান্ধীজীরও সমস্যা।

ফলে বাংলার বুকে অবসাদ। অবসাদ শ্রীমতী কাফেতে।

এখানকার সকলেই জেল থেকে ফিরে এসেছে। আবার তাদের আড্ডা জমেছে শ্রীমতী কাফেতে। কিন্তু অন্তর্স্রোতে কিছু একটা ঘটে গিয়েছে, একটা অদ্ভুত পরিবর্তনও চোখে পড়ে।

আসেননি শুধু নারায়ণ। তাঁকে আর তাঁর বন্ধুদের ইংরেজ সরকার দেশের মাটিতে রাখতেও অরাজী। তাঁদের নিয়ে গেছে সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে, আন্দামানে। যেখানে মাতৃভূমির কোন কলকাকলি পৌঁছয় না।.......মাঝে মাঝে ভজুর কাছে নারায়ণের চিঠি আসে। রাণাঘাটের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে একটি সম্পন্ন ঘরের বউ প্রায়ই ছুটে ছুটে আসে এই চিঠিগুলি দেখতে। সে প্রমীলা। কিন্তু চিঠিগুলিতে, দ্বীপ-নির্বাসিতের চারধারের বেড়া মহাসমুদ্রের মত উদাত্ত জিজ্ঞাসা এখানে যেন দূরাগত গুন্‌গুনানির মত বাজে। অসহ্য প্রতীক্ষার আবদ্ধ প্রাণ সে গুনগুনানিতে মুক্তি পায় না। মাতে না। ভয়ঙ্কর একটা ঝড় না হ'লে সে যে ভাঙ্গবে না। অন্ধকারে আর কতদিন এ মুখ লুকিয়ে রাখা চলে। তার চেয়ে সে তার জীবনের সব অভিশাপ নিয়ে ঘুচে মুছে যাক।

নারায়ণের পথ-বিশ্বাসী সুনির্মল আর রথীনও মুক্ত হ'য়ে এসেছে জেল থেকে। প্রিয়নাথের উপর থেকে পরোয়ানা তুলে নিয়েছে সরকার। সে এখন কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠক।

কমিউনিষ্ট পার্টি! রাজনৈতিক মহলে এ দলটির নাম প্রায়ই শোনা যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এ্যালান হিউম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত 'কংগ্রেস' নামটা বিদেশী ও দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। নামের মাঝে কোথায় যেন একটা বিদেশের গন্ধ ছিল। অথচ আজ 'কংগ্রেস' নামটা একটা দেশীয় শব্দ হয়ে উঠেছে। ভাবা দায়, এর আবার কোন দেশীয় অর্থ আছে।

আজকে কমিউনিষ্ট নামটা তখনকার কংগ্রেসের মত। হয় তো বা আরও কিছু নতুন নাম, নতুনতর তার কাজ। যেন সভ্য আর্য ঋষির আশ্রম কুঞ্জে, অসভ্য অনার্য উলঙ্গ শিবের আবির্ভাব। সেই শিবের মোহন মূর্তি দেখে ঋষি বধূর অঙ্গবাস খুলে যায়। কে জানে, একদিন গণমনের সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে দেবে কিনা কমিউনিষ্ট পার্টি।

প্রিয়নাথ যে পথ নিয়ে একদিন নারায়ণের বিশ্বাস হারিয়েছিল, সেই পথেই সে তার সিদ্ধির অন্বেষণে ছুটে চলেছে। উপকণ্ঠের মজুরবস্তি তার কর্মক্ষেত্র। যে রথীন একদিন তার বিরুদ্ধ ছিল, সেই রথীন আজ তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

সর্বস্ব পণ করা মুক্তির সন্ধানে ছুটেছে তারা। কিন্তু সারা দেশে আবার একটা দারুণ অবসাদ এসে পড়েছে। পরাজয়ের অবসাদ।

পথ বিচ্যুত হয়েছে সুনির্মল। সে দূরে সরে গেছে। রুক্ষ শীতের কাঁটাভরা পথ থেকে সে উষ্ণ নরম কোটরে আশ্রয় নিয়েছে।

অবসাদই এসেছে। নইলে, কৃপাল দলাদলি ভালবাসত সত্যি, কিন্তু গোপনে মদ খাওয়া ধরেনি। আজকাল ধরেছে। সে লুকিয়ে সিগারেট খায়, বিলাতী মদ খায়। শঙ্করদা'ও ম্লান। তিনিই কৃপালের গুরু। তাদের চিন্তার মধ্যে একটা ভয়াবহ ফাটল ধরেছে।

অবসাদে ভেঙ্গে পড়েছে হীরেন। রাজনীতি থেকে অনেকখানিই দূরে সরে গেছে। আজও সে তেমনি সুতো কাটে, ধর্মগ্রন্থ পড়ে। মাঝে মাঝে বেদ-বেদান্ত ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্রবন্ধও লেখে।.....কিন্তু সে যে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল, তা' যেন আজ ভোজবাড়ীর ছায়ার মত কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

জেল থেকে এসে রামাকে দেখে সে চিনতে পারেনি। অসহ্য যন্ত্রণায় ও ঘৃণায় বুকের মধ্যে রি রি ক'রে উঠেছিল তার।.......জট পাকানো, উকুনের সাদা লিকি ভরা এক মাথা চুল, ধুলো মলিন

কাপড়, তাও ছেঁড়া। গায়ে জামা নেই। ফুক্ ফুক্ ক'রে বিঁড় ফোঁকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খ্যাল্ খ্যাল্ ক'রে হাসে। কাছে পিঠে থাকে এক গাদা বাচ্চা। তার ঝাড়ু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে বাচ্চাগুলি! এতগুলি বাচ্চা কি ক'রে হ'ল রামার! শুধু তাই নয়। ওর সেই আগের বরটা ম'রে গেছে। আবার একটা লোকের ঘরে চলে গেছে রামা। ......গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে ওঠে হীরেনের। এই সেই রামা! এখন মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় মেথরদের একটা ইউনিয়ন হয়েছে প্রিয়নাথের চেষ্টায়। রামা সেখানেই যায়।

তবু বুকের মধ্যে সহস্র কীটের দংশন অনুভব করে হীরেন। মনে পড়ে বস্তি থেকে ফিরে আসার দিন রামার সেই আলিঙ্গন। যদি সেদিন নিয়ে আসত সে তাকে, তা'হলে কি হত! জানে না সে। সে তো মনে করেছিল, ওটা মহামৃত্যুর আলিঙ্গন। কিন্তু সেই আলিঙ্গনেই তো সে বাঁধা পড়েছে। সে তার বৌদির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আলিঙ্গনটা রামার নয়, বৌদির। হীরেনের তাতে সুখ নেই, দুঃখেরও কোন অনুভূতি নেই তার। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে সে মুক্তি চায়। কতবার ভেবেছে সে, আত্মহত্যা করবে। কিন্তু ভবিষ্যতের একটা বিচিত্র কৌতূহল তাকে বার বার বাধা দিয়েছে!.....আর বিচিত্র তার মতি, রামাকে দেখলে আজও তার হৃদয় অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে ওঠে।

এই বিরাট ঘুরপথ। আর প্রতিটি মোড়ে মোড়ে ঠেকে যাওয়া অসহ্য অবসাদ।

সকলেই চলছে, ঠেকছে, নিজের মত ক'রে মুক্তি চাইছে। চরণের সেই সর্বস্ব পণ করা মুক্তি।

বোধ হয় লীগ মিনিষ্ট্রির দরুনই ললিত মুখুজ্জেরা একটা আন্দোলনের পথ পেয়েছে। শ্রীমতী কাফেতে তার বজ্রকণ্ঠ আজকাল ঘন ঘন ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে।

ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে, কংগ্রেস, গান্ধী, আইনসভা, ইকনমিস্টের সম্পাদকীয়, শ্রমিক তদন্ত রিপোর্ট, ফজলুল হকের বিবৃতি, নবীন শ্যামাপ্রসাদের সিংহনাদ, সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস বিরোধিতা, কমিউনিষ্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, বাটলিওয়ালা, ডাঙ্গে আর মুজঃফর আহমদ, অর্থাৎ এদেশীয় রাজনীতির আদি ও শেষ। তারপরে হিটলার, হিমলার-হেস-গোয়েরিং তোজো-মুসোলিনী-চেম্বারলেন-ট্রটস্কি তার উপরে রাশিয়া ও ষ্ট্যালিন।

তারপরে পরস্পরের দলাদলি ও বিবাদ।

সেই পুলিশ অফিসারটি বদলী হয়ে গেছে একত্রিশ সালের মাঝখানেই। শ্রীমতী কাফের উপর ততখানি কড়া নজর হয় তো এখন নেই।

নজর এখন শুধু প্রিয়নাথের উপর। এই শিল্পাঞ্চলের গোলযোগের সৃষ্টি এখন ওরাই করতে পারে।

এদের কাছ ঘেঁষেই রোজ বসে থাকে—সুনির্মল। সে বেশীর ভাগ সময়েই কোন কথা বলে না! কোন কোন সময় হঠাৎ গান্ধী বিরোধী উক্তি করে বসে, নয় তো ফ্রান্সে আগামী নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্টের অবশ্যম্ভাবী জয়ের আশা দীপ্ত গলায় বলে।

যখন সবাই অসম্ভব চেঁচামেচি শুরু করে, সে তখন জনবহুল রাস্তাটার দিকে স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে বোধ হয় এ গণ্ডগোলের জন্যই প্রথমে গায়,

তোর মলিন বসন ছাড়তে হবে,
হবে রে এইবার,
ও তোর মলিন অহঙ্কার।

তাতে কেউই কর্ণপাত করে না, যে যার নিজেকে নিয়ে মশগুল। তখন সে তার গলার মধ্যে সমস্ত সুর মাধুর্যটুকু ঢেলে গেয়ে ওঠে,

যৌবন সরসী নীরে
মিলন শতদল,
কোন চঞ্চল বন্যায় টলমল, টলমল্।

কিংবা,

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।

জীবনে তার যদি কোন উদ্দেশ্য এখন থেকে থাকে, তবে তা প্রেম। প্রেমে সে সত্যি পড়েছে এবং সেটাই তার মানসিক সংগ্রামের আকার ধারণ করেছে। সে ভালবেসেছে সেই সরসী রায়কে।

সে শাড়ী পরে, গয়না পরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল সোনার তারকা তার প্রশস্ত কপালে জ্বলজ্বল করে। তার ঘন কালো ঢেউ দেওয়া চুল, বিশাল চোখে ব্যথিত হাসি, বলিষ্ঠ শরীরে তার নম্রতার ছাপ। তার ভরা জীবনের শূন্য বুকে সে গ্রহণ করেছে সুনির্মলের নিবেদিত প্রেম। জীবনের দিকপাশে ভুল ছিল না, ছিল না চিন্তার দুর্বলতা! তারই সমবয়সী ছন্নছাড়া, দিকপাশ ভোলা সুনির্মলকে সে আশ্রয় দিয়েছে। সে জড়ায়নি সুনির্মলকে।

ত্রিশোর্ধ্বের এ ছেলেগুলো যেন ঝড়ো পাখী। ওদের মাতামাতির অন্ত নেই, অন্ত নেই উন্মাদনার। বুকে ওদের বারুদ ঠাসা, দিকে তাই কেবলি বিস্ফোরণ! প্রেমে অন্ধ এ সুনির্মল আবার কালকে মাতবে। তখন ফিরে আসবে এই কুলায়, সরসীরই বুকে। ওদের ভালবেসে স্বস্তি নেই, না ভালবাসলে স্বস্তি নেই, না ভালবাসলে সুখ নেই। ওরা এমনি।

তাই সরসী তার বৈধব্যের বুকের বাসা খুলে দিয়েছে। ওদেরই একজন ক্লান্ত হয়ে ছুটে আসবে তার কাছে, ক্ষত বিক্ষত করবে বাসা, জরাকে সরিয়ে করবে নবীনের প্রতিষ্ঠা।

ক্লান্তি যখন গ্রাস করবে তখন উত্তাপের অগ্নিশিখা নিয়ে রণডঙ্কায় ঘা দেবে সরসীরা। কটাক্ষে আগুন হেনে রক্তশাড়ী উড়িয়ে ওরা নির্দেশ দেবে পথের।

সুনির্মল হেসে ওঠে। থাক্, ওসব থাক। জনারণ্যে শুধুই সে সরসী, বিধবা, বিদুষী। থাক রাজনীতি, অপরে করুক ছাত্র আন্দোলন, না থাক উত্তাপ, সংবাদ বন্ধ থাক পপুলার ফ্রন্টের, ফ্রাঙ্কো-স্পেনের, থাক কিশোর ছাত্রের জ্বলন্ত অভিনন্দন। সে কবিতা বাঁধে,

এমন করে ঘুম ভাঙ্গায়ো না মোর
প্রেমের তৃষ্ণাতে আমি মাতাল ঘোর,
কেন এ বিশ্বের ঝম্‌ঝামেলা?
এবার শুরু হোক প্রেমের পালা।

বিধবা বিয়ে কি বিদ্রোহ নয়? সেই বিদ্রোহই করবে সুনির্মল। সে বাজ হানবে এই পয়সা পিশাচ চাঁদির জুতোখোর সমাজের বুকে। সে তার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত অর্থ উইল করে দেবে সরসীকে, তার সন্তানকে।

তেমনি আসেন বৃদ্ধ গোলক চাটুজ্জে। কাহিনীর থলি ঝাড়তে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন সবই সত্যি। কেবল শ্রোতারা হা হা করে হাসে।

'আম খাওয়ার কথা বলছ?' তিনি শুরু করেন। 'সেবারে আশু বাবু বললেন, আশু বাবু হে।

চেনো না তোমাদের কলকেতার আশু মুখুজ্জেকে, রয়েল বেঙ্গল টাইগার? বললেন, এস গোলক, দুটো আম খাওয়া যাক। বসলাম দুজনে আম খেতে দুপাশে, মাঝখানে বসে আম কেটে কেটে দিতে লাগলেন আশুবাবুর মা।......তারপরে জান মশাই, আমি তো খাচ্ছিই খাচ্ছি। খাওয়া যখন শেষ হল তখন আর আশুবাবুকে খুঁজে পাই না, তিনিও আমাকে খুঁজে পান না। পাবেন কি করে? মাঝখানে যে আমের আঁটি আর খোসার পাহাড় উঠে গেছে মানুষ সমান। দেখা কি যায়?'

এরকম অদ্ভুত রকমের বহু গল্পের ঝুড়ি তিনি রোজ খালি করেন। এরপরে কারুর কার্পণ্য আর টেকে না চা-য়ের ব্যাপারে।

আর একজন আসেন ভবনাথ বাঁড়ুজ্জে। তাঁর কথা না বললে শ্রীমতী কাফের কথা শেষ করা যাবে না। তিনি বসেন ভজুর একেবারে পাশে এবং যতক্ষণ ভিড় থাকে, ততক্ষণই চকচকে টেকো মাথাটা নিয়ে মহা বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে দু চারটা কথা বলেন ভজুর সঙ্গে। বয়স প্রায় ছাপ্পান্ন। ছিলেন রেলওয়ে পার্শেল ক্লার্ক, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। বিপত্নীক। ঘরে তাঁর নতুন দম্পতি, ছেলে আর ছেলের বউ। আরও দুটি ছেলে, স্কুলে পড়ে। বিবাহিত ছেলে বড়টির বয়স প্রায় তিরিশ।

ভজু তার চেয়ে অনেক ছোট হলেও উভয়ের বন্ধুত্বটা গভীর। চেহারায় চরিত্রে প্রায় পুরোপুরি ফারাক থাকলেও তাদের দুজনে জমে অদ্ভুত। ভজু বলে তাকে 'তুমি' আর বাঁড়ুজ্জে দা। ইনি বলেন শুধু ভজু। এককালে তাঁর ঘর ছিল বরিশাল জেলায়, এখন রেল কলোনীই তাঁর ঘর।

ভবনাথের ইদানিং জীবনটা একটু অদ্ভুত। তিনি আসেন সন্ধ্যাবেলা, এক কাপ চা খান, তারপর খালি ভজুকে বলতে থাকেন, 'চল না, একটু পেছনের ঘর থেকে ঘুরে আসি।' অর্থাৎ তিনি মদ পান করবেন, কিন্তু লুকিয়ে ভজুলাটের সঙ্গে, ঠিক যেমন নতুন লোকে মদ খাওয়া ধরে। চিরটা জীবনভরে এমনকি বিড়ি, সিগারেট, পান কিছুই খাননি। নিয়মিত চাকরী করেছেন, সংসার করেছেন, পালন করেছেন স্ত্রী পুত্র পরিবার, উপরি রোজগার করে পয়সাও কিছু জমিয়েছেন এবং জীবনকে শেষ করে যেন তিনি আবার শুরু করেছেন। চিরকাল নিয়মের মধ্যে থেকে স্বাস্থ্যটা অটুটই রেখেছেন বলা চলে। কিন্তু জীবনের একটা নতুন কৌতূহল ফুটে উঠেছে তাঁর চোখে। গত ত্রিশ বছরের এ বিশ্বের কোন কথা জিজ্ঞেস করলে বলেন, কই কিছুই তো জানি না। এতদিনের ভাবলেশহীন চোখ জোড়াতে তাঁর নতুন ভাবের সঞ্চার হয়েছে। ক্লান্তি আছে, গোলমাল সইতে পারেন না, কিন্তু জীবনটাকে চেখে দেখার ভারী সাধ।

তিনি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন, ততক্ষণই আড়চোখে লুকিয়ে লক্ষ্য করেন ঘরের নতুন দম্পতি তাঁর ছেলে-বউকে। তাদের কথা হাসি ঝগড়া খুনসুটি। দেখে তাঁর কৌতূহল ও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। এ জীবনটার যেন কিছুই তাঁর জানা নেই, কিছুই দেখা নেই। যেন একটি নতুন জগৎ। তিনি যেন এ খেলার মাঝে শিশু দর্শক।

এসব কথা তিনি এসে আবার গল্প করেন ভজুর কাছে। এ সাধারণ কথাগুলো ভবনাথের মুখ থেকে শুনে ভজুর কাছেও যেন অসাধারণ ঠেকে। তিনি বলেন, 'জান ভজু আমার ভারী অবাক লাগে। আমি এর কিছু ভেবে পাই না।'

তারপর সব ঝামেলা কেটে গেলে তিনি দোকানের পেছনে গিয়ে কয়েক পাত্র পান করেন। এমনকি তখন চরণও কাছে থাকতে পারে না। যদি দেখে ফেলে। কিন্তু পরে তিনি আরম্ভ করেন

বক্‌বক্। তার মধ্যে কতই না অভিনব দর্শনের বিচিত্র তথ্য উঠে পড়ে। এমনকি রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করেন, চেঁচিয়ে ফেলেন।

তারপর টলতে টলতে বাড়ী ফিরে যান। ভজুকে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয় কোন কোন দিন।

ভজু বলে, 'আচ্ছা বাঁড়ুজ্জে দা, এ তোমার কেমন ধারা লুকিয়ে নেশা করা? সব্বাই তো জেনেই যায়। তবে সামনে বসে খাও না কেন?'

ভবনাথ বলেন, 'তা যদি বললে, অবশ্য বলতে নেই এমন কথা কিন্তু সৃষ্টিটা গোপনেই হয়। প্রকাশ তার বাইরে।' ভজু ভাবে, ভবনাথদা'ও মুক্তি চান। কিসের মুক্তি, কার মুক্তি!

বাঙ্গালী আর আসে না। যদিও আসে, খুব কম। তার মাত্‌লামি অনেক ঘুচে গেছে। সেও দিবারাত্র ওই প্রিয়নাথ, তার পাননাথদাদার সঙ্গেই ঘোরে। সে মুক্তি-উন্মাদ নয়, বিদ্রোহী। এই কয়েক বছরের মধ্যে বউ ছেলে মরে, ঘর বিকিয়ে পথে এসে আশ্রয় নিয়েছে সে। দিবানিশি তার কাজ। বলে, 'লাটবাবু, জীবনে হার জিত্ আছে। আজ হারছি কাল কিন্তুক্ ঠিক জিতে নোব!'

ভজু বলে 'কার কাছ থেকে কি জিতবি?'

অন্যমনস্ক হ'য়ে যেন অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বাঙ্গালী। একটু পরে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে, 'কেন, বউ ছেলে আর ভিটে।'

জিতে নেবে! শুনে ভজু হাসে না কাঁদে বোঝা যায় না। কেবল পানের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেয়। মাতলামির ঘোরেও অবাক হয় ভজু যখন দেখে, শ্রীমতী কাফের পিছনে বসে দলের সভা বসায় প্রিয়নাথ ওই বাঙ্গালীকে নিয়ে। এই সভায় আসে সেই চটকলের শ্রমিক ভাগন আর মনোহর। এখনো ভজুর প্রতি ওদের অবিশ্বাসটা যায়নি। কিন্তু লাটবাবুকে একটি সেলাম জানিয়ে দিব্যি ভেতরে গিয়ে বসে। সেই কানপুরের সুরজ সিং আজকাল এ অঞ্চলেই বাসিন্দা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক সে। সেও আসে। কিন্তু তাদের তর্কের অবসর নেই। তারা কেউ-ই শ্রীমতী কাফের সামনের ঘরের লোক নয়। তাদের এই বৈঠকে আসে আরও কয়েকটি ছেলে, স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা। এ বিশ্বে ওরা আর কোথাও ঠাঁই পায়নি, পেয়েছে ভজুলাটের শ্রীমতী কাফেতে।

কোন কোনদিন ভজু জিজ্ঞেস করে প্রিয়নাথকে, 'কি চাস্ তোরা?' কি চায়। প্রিয়নাথ বলে অনেক কথা, শ্রমিক বিপ্লব, সাম্যবাদ, কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো, অক্টোবর বিপ্লব........

ভজু তাড়াতাড়ি বলে, 'থাম।' তারপর যেন খুবই কৌতূহল ভরে একটি কথা জিজ্ঞেস করে বোঝে একটা প্রস্তুতি চলছে। যাত্রার প্রস্তুতি, লক্ষ্যের প্রস্তুতি। কিন্তু ওদের মুক্তির অর্থ সে বোঝে না।

মুক্তি! অ্যালকোহলের তীব্র ঝাঁজে পোড়া পেটটা চেপে ভজু বিড়বিড় করে,

এ মহানিদ্রা ঘুচিবে জানি
আকাশে ধ্বনিবে অভয় বাণী
মন্ত্রের মত ছড়াবে মর্তে
মহাদেশ দেশ ঘরে পল্লীতে।

হ্যাঁ, আজকাল নেশার ঝোঁকে ভজন এমনি কবিতা আওড়ায়। মাঝে মাঝে হীরেনের বড় ভাল লাগে এই কবিতা। বিস্মিত প্রশংসাভরে সে ভজনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তার দিকে তাকিয়ে ভজন ব'লে ওঠে,

(সেদিন) বাউলের সুরে বেহালার তারে
জ্বলিবে আগুন গ্রামে প্রান্তরে।
দেখবি তোর সোনার কানন নাই,
ধরিত্রী মুখ রহিবে ফিরায়ে
না দিবে তোরে ঠাঁই।

হীরেন একটা দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে কবিতাটা নিজের নামে আওড়ায়। তাকে এ কবিতা শোনাবার অর্থ কি।......ঠিক এই কবিতার মত তার মনে পড়ে যায় বউদির কথা। একদিন ছোকরা ঝাড়ুদারের প্রেমে পড়ে যেমন রামা বিচিত্র হাসিতে ঘুমন্ত শিশুর দেয়ালা করত, তেমনি হাসে বউদি। সে হাসিতে যেন একটা ভয়াবহ সর্বনাশের ইঙ্গিত রয়েছে। বউদিকেও তার বড় ভয়। বউদি'র ইচ্ছা, ওই রামার মত। একখানি ছোটমোট বাসা, সেখানে হীরেন আর বউদি। বউদি নয় বউ। ছি ছি ছি, ততখানি নীচে কেমন ক'রে সে নামবে।

এমনি ভয় ধিক্কার তার প্রিয়নাথের প্রতি। সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে ওরা আবার একটা নতুন পথে এসেছে। একদিন এ পথও ওদের ছেড়ে দিতে হবে। দিতে হবে, কেননা, এ পথে ভারতের সেই অতীত আত্মাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

কোন কোন সময়ে ভজনকে একলা পেয়ে একঘেয়ে কান্নার মত নানান কথা বলে যায়। বলে, 'দেখ ভজু, যেদিন রাজনীতি করতে এসেছিলুম, সেদিন কিন্তু অন্যরকম ভেবেছিলুম। ভাবি, এত যে ছুটে চলেছি, জেল খাটছি, কি পেয়েছি। এ তো সবই দলীয় রাজনীতির চূড়ান্ত হচ্ছে। কিন্তু ভারতের সেই মহাতীর্থ রূপটি কোথায় তাঁকে তো দেখতে পাইনে।.......জান, একসময়ে ভাবতুম ভারতের সব নারীই বুঝি মহাশ্বেতা। নাঃ, আমি চলে যাব ভাবছি। সরে যাব এসব থেকে।'

ভজন অমনি তীব্র গলায় চীৎকার ক'রে ওঠে, 'পেঁয়াজি পেয়েছিস্ হীরেন, অ্যাঁ? কাব্‌লে দেখেছিস্, পাওনাদার মরে গেলে কবরে লাঠি পেটা করে। কোথায় পালাবি?'

হীরেন যেন সত্যি যমদূতের শমনের মুখে পড়েছে, এমনি আতঙ্ক ফুটে ওঠে তার চোখে। বলে, 'কেন বলছ একথা। কোন পাপ তো করিনি।'

'করনি?' কিসের একটা চাপা ঝাঁজে যেন জ্বলে ওঠে ভজন। বলে, 'তবে কি পাপ করেছে আন্দামানের বন্দীরা? তাদের জন্য একটি কথা তোমরা বলেছ? বলি ফাইল বগলদাবা ক'রে ইংরেজের অফিসে গিয়ে কোন্ স্বরাজের জন্য তোরা লড়ছিস্? বন্দীদের এই তিলে তিলে মরণ, তোমাদের এ শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানো আর পরস্পরের সাহায্যের রাজনীতির জন্যে? তোমাদের এ খাতা-বদলীর দাবী আর সমাজ সংস্কারের ধাপ্পা দিয়ে ভেবেছ এ রেল আর চটকল মজুরদের তোমরা ঠাণ্ডা ক'রে রাখবে? ভজুলাটকে বাজে কথা বুঝিও না নিয়োগী। আগামী দু'চার বছরে তোমরা আরও ক্ষমতা পেতে পার, এমনকি তুমি, কৃপাল, তোমরা সবাই কর্তা'হতে পার, কিন্তু জেনো সেটাই শেষ নয়। তোমরা ভেক্ নিতে পার, সাধু হতে পার না।'

সে চুপ করে, কিন্তু শান্ত হতে পারে না। বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দাদা নারায়ণ হালদারের মুখ। তিনি আছেন এখন আন্দামানে। মাঝে মাঝে চিঠি আসে ভজুর নামে। সে চিঠির সামনে পেছনে সবটাই কালি দিয়ে লেপা, খালি কয়েকটি কথা, যে কথা দিয়ে মানুষটাকে মনে করা গেলেও স্পর্শ করা যায় না।

তারপর চীৎকার ক'রে ওঠে, 'চরণ, হীরেনকে চা দে।'

ব'লে আবার বলে নিয়োগীকে, 'না কি, এক পেগ্ হবে। তোমরা তো আবার নিরামিষাশী।' নিয়োগী যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। বলে, 'দাও।'

তারপর আপনমনে আওড়াতে থাকে ভজু।

লন্ডনের রাজার ভারতবর্ষ
মোরা যোগাই সুধীজনের হর্ষ।

আর একজন আসে শ্রীমতী কাফেতে প্রায় প্রত্যহ, কিন্তু কোনদিন বসে না। লোকে তাকে বলে তিলকঠাকুর, ভজু বলে ঠাকুরকাকা। সবাই জানে লোকটা সাংঘাতিক চসমখোর। কারবার তার তেজারতি।

তার পয়সা লুকোন থাকে নাকি মাটির তলায়। যাকে বলে যখের ধন। পাড়ার আইবুড়ো আর অল্পবয়সী মেয়ে দেখে বেড়ায় বড় মানুষ প্রসন্ন চাটুজ্জে, যার নিজের ঘরে সুন্দরী বউ, তবু ভুনুর মনিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে যেমন দাঁতহীন বুড়ো মাংসের দিকে তাকায় উগ্র লোভানিতে, সেই তার সঙ্গে তিলকঠাকুরের একমাত্র ভাব। প্রসন্ন চাটুজ্জে পেয়েছে গুপ্তধন, সেই ধনে সে বড়লোক। লোকে বলে তারও নাকি যখের ধন। এরা মরলে আর জন্মাবে না। প্রসন্ন চাটুজ্জে আর তিলকঠাকুর জমে ভারী ভাল। শোনা যায়, তিলকঠাকুরের আসল নজরটা নাকি প্রসন্নর স্ত্রীর ওপর। প্রসন্নর স্ত্রী, সত্যিই বলা চলে অপূর্ব সুন্দরী। কথাটা হয় তো প্রসন্নও জানে তবে উভয়েরই যখের ধনের যে মিলটা আছে, সেটা তাদের অবিচ্ছেদ্য করেছে।

কিন্তু তিলকের সাহস আছে বলতে হবে। সে রোজ শ্রীমতী কাফের বারান্দায় উঠে টিকিটি নেড়ে এক গাল হেসে বলে, 'ভাইপো, মাইরী বলছি, এ রাস্তাটা আর পার হতে পারি না তোমার এ শ্রীমা কেইফের মাংসের খোসবাইতে। সৎ বামুনকে একদিন খাইয়ে একটু পুণ্য কর। শত হলেও বিলিতী রান্না তো!'

অর্থাৎ মরে গেলেও সে পয়সা খরচ ক'রে খাবে না। ভজু জানে এখানে রাগ বৃথা। কিন্তু পিত্তি জ্বলে যায় তার। তবু বলে নিস্পৃহ গলায়, 'ঠাকুরকাকা, ভাইপো'র আপনার মতি খারাপ, পয়সা ছাড়া যে আমি কেষ্ট বলতে পারিনে।'

তিলকের নাসারন্ধ্র সত্যি ফুলে ওঠে মাংসের গন্ধে, সমস্ত মুখটা লালায় ভরে যায়। তবু পয়সা ব্যয় করে রেষ্টুরেন্টে মাংস খাওয়া? আরে বাপ্‌রে! ছেলে বউ দূরের কথা, নিজে সে আধ পয়সার ঘুগনিও কোনদিন কিনে খায় না ইচ্ছে হলে। কে জানে বাবা, কোন ফাঁকে গণেশ বিগ্‌ড়ে বসে থাকবে।

ভজু ভাবে, এই তিলকঠাকুর কি মুক্তি চায় না! চাইবে কি ক'রে। ও যে টাকা ধনরত্ন যখ দিয়ে রেখেছে!

তবে কে মুক্তি চায়। যুঁই চায়। যুঁই!

কই, তার চোখে তো আর সেই বিদ্রোহের ঝিলিক দেখা যায় না। ঠোঁটের সেই বাঁকা রেখাটি তো আর তেমন ক'রে নীরব বিদ্রূপে জ্বালিয়ে দেয় না ভজুর হৃদয়। যেন ভাবের ঘোরে ভাবলেশহীন তার মুখ। অথচ যেন একটি কিশোরী বালিকা। বালিকা চুল বাঁধে না, আলতা পরে না, সাজগোজ করে না। সে বৈরাগিনী হয়েছে।

নিতায়ের মায়ের সে রূপ দেখে বুক জ্বলে না ভজুর, বুকের মধ্যে এক পুরুষ নিঃশব্দে

অশ্রুহীন চোখে যেন লুকিয়ে কাঁদে!... না, যূঁই পারল না তাকে ছেড়ে যেতে। মৃণ্ময়ী কি নবকুমারকে ছেড়ে যেতে পেরেছিল? যাবে তো, অমন করে গঙ্গায় তলিয়ে যাবে কেন!

বকুল মা ছুটে এলেন কেন বৃন্দাবন থেকে? মুক্তি পেলেন না সেখানে? কোথায় তাঁর ঠাকুর। এখন তো দিবানিশি মালা হাতে বসে থাকেন হালদারমশাইয়ের আরাম কেদারার পায়ার কাছে। দুজনেই নিঝুম। দেহ রয়েছে, তাঁরা দুজনে নেই। কোথায় উধাও হ'য়ে গিয়েছেন।

মুক্তির সন্ধানে গেছেন বুঝি!...

কথা বল হে মৌন রাত
চোখ চাও হে অন্ধ রাত
মুক্তি দাও হে অনন্ত রাত!...

ভজু এসে ঢুকল শ্রীমতী কাফেতে।

সন্ধ্যা হয়েছে, বাতি জ্বলছে এখানে সেখানে। স্টেশনে গাড়ীতে যাত্রীর ভিড়। কলকাতার চাকুরেরা ফিরছে সব কাজের শেষে। ভিড় রাস্তার উপরে।

ঘোড়ার গাড়ী একটাও নেই স্ট্যান্ডে। জলদানিটার তলার মুখ থেকে জল উঠছে টগবগ করে। মোটরবাস পুষ্পময়ী ষ্টার্ট দিয়েও চীৎকার করছে, 'চলে এস, খালি গাড়ী!'

সন্ধ্যাকালীন ভিড় জমে উঠেছে শ্রীমতী কাফেতে। মেতে উঠেছে সকলে। এই মাতামাতিতে মাতেননি ভবনাথ। বরং অত্যন্ত বিরক্ত ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছেন সকলের দিকে।

অদ্ভুত আসর জমিয়েছেন চাটুজ্জেমশাই। তিনি আজ ভূতের গল্প আরম্ভ করেছেন। কোন্ এক বাদ্‌শা'র ছেলে ঘুঁটে কুড়োনীর মেয়ের সঙ্গে প্রেম ক'রে জান ফতে করেছিল, তারই কাহিনী। একালে প্রেমটাই তো তারই ভৌতিক ব্যাপার।

শুধু ঘন ঘন হাতের সোনার ঘড়ি দেখে সুনির্মল। সরসী তাকে ডাকতে আসবে।

রাত্রি ন'টার পর শ্রীমতী কাফে প্রায় নিরালা হয়ে আসে, চরণ যখন তার ভাতের হাঁড়িটি উনুনে বসিয়ে দেয়, যখন শহরের বড় রাস্তাটায় লোকজন কমে আসে, স্টেশনে লোকাল ট্রেনের ভিড় কমে গিয়ে মেইল ট্রেনের যাত্রীরা ঘুমোয়, ঘোড়ার গাড়ীগুলো প্রায় আশাহীন হয়ে পড়ে থাকে, অবশ হয়ে আসে ঘোড়াগুলির রুগ্ন শরীর, দক্ষিণ থেকে ছুটে আসে চৈত্রের ঝোড়ো হাওয়া তখন ভবনাথ আর ভজু যায় পেছনের ঘরটায়।

এতক্ষণ প্রতীক্ষা করা ভবনাথের অসহ্য। ছেলেমানুষের মত কান্না পায় তার। ইচ্ছে হয় ভজুকে কামড়ে খামচে দেন। রোজই এ অস্থিরতাকে চেপে ঠাণ্ডা গলায় বলেন, 'কাল থেকে আর আসব না হে ভজু।' কিন্তু যখন পানীয় পড়ে, তখন আবার নিজেকে ফিরে পান। আবার ঠিক সন্ধ্যাবেলাটিতে হাজির হন এসে।

তাদের এ আসরে ভজু কোন কোন দিন ডেকে নিয়ে আসে তার ভুনু সারথিকে। প্রথমে এ ব্যাপারটা দেখে তো ভবনাথ প্রায় আঁতকে উঠেছিলেন। একটা গাড়োয়ানের সঙ্গে বসে মদ্যপান! কিন্তু ভজুর পাল্লায় পড়ে এ আত্মসম্মানটা তাঁকে খোয়াতে হয়েছে। এখন আর ভুনুকে তাঁর তত বাধে না। কিন্তু মদ না খেয়ে চরণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে, সেটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

আজ মদ খেয়ে ভবনাথ বাইরে এসে রোজকার মত সেই একই কথা প্রথমে বলেন, 'দেখ ভজু, শুনেছিলুম বুড়োদের নাকি জীবনে কোন সাধ থাকে না। কিন্তু আমি তোমাকে জোর করে

বলতে পারি, আমার বড় ছেলের চেয়েও আমার শক্তি যথেষ্ট।'

ভজু বলে, 'তোমাকে দেখে তাই মনে হয়। বিয়ে টিয়ে করতে ইচ্ছে যায়?'

'তোমার খালি ঠাট্টা। এ বয়সে আবার বিয়ে।' ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গিয়ে ভবনাথ চোখ বুজে মোটা গলায় বলেন, 'তবে দেখ ভজুলাট, ছেলেটার বে দিয়ে আমি ভুল করেছি।'

এরকম বকবকানি প্রত্যহের ফলে ভজু এ সময়ে নির্বিকার শ্রোতা মাত্র। বলল, 'এ যে নতুন কথা শোনালে বাঁড়ুজ্জে দা?'

'হ্যাঁ হে, তাই শোনাচ্ছি।' ভবনাথ কিছুটা উত্তেজনা বোধ করেন। বলেন, 'চাকরি, বিয়ে, সংসার এসবের মধ্যে না ঢুকিয়ে ছেলেটিকে যদি অমানুষ করে ফেলতাম, একবার দেখতাম তা' হলে কি পরিণতিটা হয়। অর্থাৎ ও নিজে ওর জীবনটাকে কিভাবে গড়ে, সেটা একবার দেখতাম।'

এবার কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে ভজু ভাল করে ভবনাথের মুখটা দেখে বলে, 'বল কি বাঁড়ুজ্জে দা, একেবারে ছেলের বিনিময়ে এমন কড়া একস্‌পেরিমেন্ট কিসের জন্য?'

শ্রীমতী কাফের উজ্জ্বল আলোর উপরেও দরজার কাচের একটা ধারালো শেড ভবনাথের অ্যালকোহল উজ্জ্বল মুখে পড়েছে। মনে হচ্ছে, লোকটা ভবনাথ বাঁড়ুজ্জে নয়, আর কেউ।

বললেন, 'দেখ ভজু, নিজের জীবনটার দিকে যতই ফিরে তাকাই, কেবলি দেখি কতগুলো ফাইল, কাগজ আর বাংলাদেশের কতগুলো স্টেশনের অন্ধকার ঘর। এমনকি স্ত্রীর মুখটা পর্যন্ত মনে করতে পারি না, সত্যি বলছি।..... এখন আমার এ ছেলেটার জীবন দেখে মনে হচ্ছে আমিও হয়তো এমনিই ছিলাম, সেই একই ব্যাপারের এপাশ ওপাশ। এর কি দরকার ছিল?'

ভজু বলল, 'সেই তো ভাল বাঁড়ুজ্জে দা, তোমার নিজেকেই আর একবার ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

ভবনাথ যেন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলেন, 'ছি ছি ছি, আমার ঘেন্না ধরে গেছে ভজুলাট, ও জীবনটা আমি আর দেখতে চাইনে। আমার মত বয়সে ওরও হয় তো এই পরিণতিই হবে। তা ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে। ও তো অলরেডি খাঁচায় আটকা পড়ে গেছে।'

ভজু দেখল, ভবনাথের এটা মাতলামি নয়, হৃদয়েরই কথা। বলল, 'তোমার ছেলে কী হলে তুমি খুশী হতে?'

'তা জানিনে ভজু কিন্তু আমারই মত চাইনে!' তারপর জনহীন রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও যদি চোর হত, ডাকাত হত, ও যদি পরের মেয়েকে ছিনিয়ে এনে বিয়েও করত তাতেও আমার আপত্তি ছিল না। ও পান বিড়ি কিছুই খায় না, বউ বলে ওকে যে মেয়েটাকে এনে বিয়েছি, তার দিকে ছাড়া কোনদিকেও ফিরেও তাকায় না। পরের ছেলে দুটোও যেন তাই হচ্ছে। এই আদর্শে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে ভাই। আমি একটু হাওয়া চাই আমার গুমোট ঘরে। আমি যেন আমাকে আর না দেখি।'

ভবনাথের বেদনা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল ভজুকে। সে বুঝেছে, এ বেদনা হল গর্ভবতীর বেদনা, অন্ধ প্রকোষ্ঠের শিশু যত সংশয়ান্বিত হোক্, এ সংসারের আলো দেখতে চায় সে। ভবনাথের বেদনা নতুনের জন্য। সে তাকিয়ে দেখল, ভবনাথের গলার শিরগুলো ফুলে উঠেছে, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে আরও। একটা অদ্ভুত হাসির আভাস তার মুখে।

ভজুর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে তিনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন, 'ক্ষুদিরাম বলে এক

বাঙালীর নাম শুনেছি, তাকে সরকার ফাঁসি দিয়ে খুন করেছে। তোমার দাদা নারাণ হালদার কত কথা বলেছে। ভাবি, এ মহাজীবনের এই মহামরণের পথেও যদি আমার ছেলেরা যেত—'

ভবনাথের রক্তচোখ ফেটে অকস্মাৎ জলের ধারা গড়িয়ে এল। ধরে আসা গলায় বলে চললেন, 'আমি যদি কাপুরুষের মত বাধাও দিতাম—তবু....তবু'...

একে একে শহরের বাতি নিভে আসতে থাকে, নেমে আসে অন্ধকার। স্টেশনের কুলিরা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়েছে রাস্তাটা। চরণ ঝিমুতে থাকে পেছনের অন্ধকার ঘরটায়।

রাতের নিঝুমতায় চৈত্র হাওয়া উদাস হয়ে যায়, আনমনে ধাক্কা দিয়ে যায়—শ্রীমতী কাফের ঘরে।

ভজু বলল, 'বাঁড়ুজ্জেদা, চল বাইরে যাই।'

দুজনেই তারা বাইরে এসে দাঁড়ায় অস্থির পদক্ষেপে।

নির্মেঘ আকাশে ঝক্‌মক করছে তারা। সুস্পষ্ট ছায়াপথের শুভ্রতা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রেলওয়ে ইয়ার্ড থেকে ভেসে আসছে লুজ সান্টিং-এর গুম্‌গুম্ শব্দ।

ভজু বলল রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে, 'বাঁড়ুজ্জেদা নেশাটা আজ মাটি করে দিলে তুমি।'

তারপর গম্ভীর গলায় বলে উঠল,

'নীলে নীল বিষ শিরে শিরে রয়,
লক্ষ জীবনের মিছে অপচয়,
আজ কিসের উচ্ছ্বাসে ওঠে বুদ্‌বুদ্।
এ কোন্ রক্ত চাহিতেছে সুদ?
কড়ায় গণ্ডায় হিসেব যে চায়
নীল বন্যার একি ঠেকা দায়,
কে এ শিশু রক্ত-পত্র হাতে
হেসে হেসে আসে ধূলি রাঙ্গা পথে।'

তারা দুজনে রাস্তার মাঝখানে। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা মোটরগাড়ী। তার পথ রুদ্ধ। কেবলি হর্ণ দিচ্ছে।

ভজু চীৎকার ক'রে উঠল, 'চুপ করে পাশ দিয়ে চলে যা।'

ভেতরের যাত্রী এদেশীয় স্বামী-স্ত্রী। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে তাঁরা যেন সীটের গায়ে মিশে গেলেন।

ড্রাইভার একবার ভীত চোখে ভজুলাটকে দেখে, প্রায় নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আবার ঠাণ্ডা হয়ে আসে ভজু। একটু আরাম অনুভব করে হাওয়ার স্পর্শে। বলে, 'বাঁড়ুজ্জেদা, তোমার কথা আমি খানিক আন্দাজ করতে পারি। তোমার চাপা পড়া প্রাণে আগুন লেগেছে। তেমনি এ বিশ্ব সংসারের সকলের প্রাণেই আজ আগুন। কিন্তু আমরা বোবা, কেউ কথা বলতে পারিনে।'

বলে সে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি ভজু, ভজুলাট, মাতাল। আমাকে সকলে হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছে! দিক, দোষ দেব না... দেখ, ছোটকালে বাবাকে দেখেছি মাতাল, প্রতিবেশীকে দেখেছি স্বার্থপর। পয়সার জন্য ব্লেড্ দিয়ে মাসীর গলা কাটতে দেখেছি পাড়ায়। মা বাবা কারুকে আমার বিশ্বাস ছিল না। মায়া ছিল না নিজের প্রতি। মদ যেদিন প্রথম খেয়েছি, নির্ভয়ে খেয়েছি, বাবার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছি! এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল জানতুম না। কার

তোয়াক্কা, কিসের তোয়াক্কা, আর কিসের আশায়? জীবনটাকে কোনরকমে ক্ষয় করে ফেলা, এই তো জীবন!... শালা ঘরে এক ফোঁটা মদ রাখতে পারি না, বাবা খেয়ে ফেলে। সংসারের আগে পেছনে সমস্তটা শূন্য। এ শ্রীমতী কাফে চোরাবালুর উপর দাঁড়িয়ে আছে, আমি দেনায় তল হয়ে আছি। তোমরা বলবে এ শুধু আমার দোষ, কিন্তু পারি না। সকলের মুখে আমাকে অন্ন তুলে দিতে হয়, শ্রীমতীর রোজগার আমাকে সবটুকু পোষাতে পারে না আর বাবা......।'

থেমে যায় সে। ভবনাথ চেয়ে থাকেন তার মুখের দিকে। সে আবার বলে, 'যুঁই! ভাবি কেন মরতে এনেছিলুম। ওর বাবা কাঁড়িখানেক টাকা দিয়েছিল, কবে তা খেয়ে বসে আছি। আজকে আমার নিতাই গৌর, ওদের আমি কোথায় রেখে যাব, কার কাছে, কোন্ আশ্রমে? এ জীবনের বেড়াজালকে ভাঙ্গতে পারলুম না। যিনি পেরেছেন, তিনি চলে গেছেন। আমি? আমি কি করব আমার এ অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ দিয়ে, কোথায় কুটব মাথা?'

তার কানে বেজে উঠল সেই ঝড়জলের রাতে ভুনুর গাড়ীর ঘর্ ঘর্ শব্দ। ভবনাথের স্পর্শে যেন মনে হল, নারাণ হালদার তার হাত ধরেছেন। সে শুনতে পেল সেই কথা, 'তুমি তাকে পথ দেখাও, ছিঁড়ে ফেল এ অন্ধকার, ভাঙ্গো এ পথের বাধা।'...

কার কাছে, কার কাছে সে প্রার্থনা, কোন্ সে মহাশক্তি? বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠল নিতাই, গৌর, চরণ, যুঁই, ভবনাথ...

সামনে তাকিয়ে দেখল ভুনু দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই রাত্রে যে ভুনু সোনা নেয়নি। সে দুহাতে ভুনুর হাত জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'জীবনের ভাঙ্গা পথে আমি যেন তোর মত গাড়োয়ান হতে পারি। আমি যেন মুটে হতে পারি। আমাকে যেন কোনদিন থামতে না হয়, কোনদিন না।'

রাত নিঝুম, নক্ষত্র নির্বাক, ঝিঁঝির গোঙ্গানি, উতলা হাওয়া বারো বাসর জাগার পালা নাড়ু পুরোতের গলিতে।

আচমকা সমস্ত কিছুকে চমকে তীব্র কণ্ঠের মিনতি ভেসে এল গঙ্গার ধার থেকে 'বউ কথা কও, কথা কও!'

চরণের ঘরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি। আসে এখন প্রত্যহ। বোধ হয় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে এমনি আসাটা। অনুরোধ না করলেও স্ব-ইচ্ছায় বহুক্ষণ থেকে যায়। তাড়া নেই, নেই তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত।

চরণের সে উচ্ছ্বাস মৃত, আবেগ উধাও। তবুও অষ্টপ্রহর উনুনের আঁচে জ্বলা পোড়া মুখটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, বন্ধুকে অভিনন্দনের হাসি ফোটে মুখে। বলে, 'এস। ঘরে লোক ছিল না?'

মেয়ে নয়, বারো বিলাসিনী। বাঁকিয়ে হাসে, অকারণ ছায়াঘন চোখে আলো জ্বালাতে চায়। বলে, 'তুমি কি লোক নও?'

'লোক বৈকি। আমি যে চরণ!'

'কার চরণ?'

'তোমার চরণ।'

'ছি।' মেয়েটি হেসে ফেলে। তারপর জিজ্ঞেস করে, কি খেলে, আর কি খবর। বলে তাদের পাড়ার খবর। তারপর বলে চরণকে, 'তোমাকে ভালবাসি।'

চরণ জানে হয়তো ও ভালবাসে না, এ কথা বলাটা বুঝি ওর অভ্যাস! তবু চরণ তার মাসের

পুঁজি একটু একটু ক'রে দিয়ে নিঃশেষ করে ফেলে সব। খাওয়ায় ওকে উদ্‌বৃত্ত চপ কাটলেট। না চাইতে এমনভাবে দেয় যে, মেয়েটা নিজেই এক একদিন লজ্জায় বলে ফেলে, 'আজ থাক, কাল নেব।'

তারপর খুব ধীরে ধীরে চরণের আবেগ আসে, মনটাকে তলায় ফেলে জয় হয় শরীরের। তখন সে দু'হাতে মেয়েটিকে নিয়ে যেন গুটিয়ে ফেলে তুলোর দলার মত।

মেয়েটি স্বাভাবিকভাবে বলে, 'রাতে রোজই তোমার কাছে চলে আসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ওদের হিসেব না মেটালে তো চলে না.....তুমি ঝাল বড়ি খেতে ভালবাস বলছিলে, আচ্ছা কাল নিয়ে আসব।'

চরণ বিড়ির পর বিড়ি ফোঁকে। কথা বলার জন্য প্রাণটার মধ্যে ছটফট করে, কিন্তু তার জিভ্‌টা যেন অসাড় হয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই অসীম সমুদ্র, অনন্ত আকাশ। তারপর বলে, 'ঝাল বড়ি এনো, আমার এখানে তোমারও নেমন্তন্ন রইল মাছ ভাতের।'

'আ-মৃত্যু যার কপালে সিন্দুর থাকবে, সেই চিরসধবার এই-ই তো প্রকৃত নিমন্ত্রণ।'

নোয়া সিন্দুর মাছ ভাত সোনার বরণ পতি।
রেখে ড্যাং ড্যাং ক'রে সগ্‌গে গেল চির আয়ুষ্মতী।।

'যুঁই।' ভজু ডাকল।

রাতের নিরালা পথের দিকে তাকিয়ে যুঁই দাঁড়িয়েছিল জানালার কাছে। বলল, 'যাই।' যুঁই দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলে দিয়ে যুঁই রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল। ভজু তাকে ধরে ফেলল। বলল, 'আজ আর খাব না যুঁই।'

এটা নতুন নয়। প্রায় প্রত্যহ রাতেই তার খাওয়া হয় না। যন্ত্রণা বাড়ে যুঁইয়ের। বলে, 'আর কতদিন এভাবে চালাবে? শরীরটা যে যাবে?'

'কিন্তু ক্ষিধে যে আমার সত্যি নেই, নিতাইয়ের মা।'

এমনভাবে বলে যে যুঁই আর জোর করতে পারে না। সে ভজুর উত্তপ্ত গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সংসারের কথা বলে, রোগের কথা বলে।

ভজু হঠাৎ বলে ওঠে, যেন আচমকা যুঁইয়ের সারা অন্তরটাকে চোখের সামনে তুলে এনে বলে, 'আচ্ছা যুঁই, এই কি চেয়েছিলে? তোমার জীবনের ভবিষ্যতের স্বপ্নে, একদিনও কি এ রাতের কথা ভাবতে পেরেছিলে?'

যুঁই নিশ্চুপ। তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ে। সত্যি যে সে স্বপ্নের অগোচরেও তার জীবনের এমন রাতকে কল্পনা করতে পারেনি। তার শৈশবে সারা দেহ ভরে কোন উল্লাস জাগেনি এই রাত্রির জন্য। এই ভজুর বুকে আজ সে আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার জন্য আকুল হয়। কিন্তু তার কুমারী প্রাণে কোনদিন এ শিবের মূর্তি গড়েনি। কিন্তু কি হবে সে কথা ভেবে!

ভজু বলে, 'পারোনি, আমি জানি। কেউ পারে না। এ সংসার তাই। কিন্তু একলা আমাকে দোষ দিও না যুঁই। দোষ যদি দাও, অভিশাপ যদি দাও, তবে এ পুরুষশাসিত সমাজকে দিও। তুমি এ অন্ধঘরের কোণে পড়ে থাক, তবু জানি কী আগুন লুকানো আছে তোমার বুকে। যদি কোনদিন আগুন জ্বালো, তা' হলে সারা বিশ্বকে জ্বালিও।'

যুঁই বলে ওঠে, 'থাক, তোমার এত কথা তো আমি বুঝিনে। শুধু এইটুকু বুঝেছি, তোমাকে আমি পারিনি বাঁধতে, তোমাকে আমি পাইনি, পাইনি।'

রুদ্ধ কান্নায় গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল তার।

ভজুর ইচ্ছা হল চীৎকার ক'রে বলে, 'সত্যি বাঁধতে পারোনি, তোমার নারীর সমস্ত ক্ষমতাকে তুমি টিপে চেপে রেখেছ, তোমার পরাজয়ের অপমান নিয়ে তুমি প'ড়ে আছ। আমরা কেউ-ই কাউকে পাইনি, কেউ না।'

নিতাই স্বপ্ন-ঘোরে ডেকে উঠল, 'মা'!

'এই যে বাবা' বলে ওঠে যুঁই। তারপর ঘুমন্ত নিতাইয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভজুকে বলে একেবারে পরিষ্কার গলায়, 'ভূতুড়ে ভাবনা রাখ, শুয়ে পড় বাপু। রাত হয়েছে।'

রাত হয়েছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভজু তবু যুঁইয়ের কাছে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে। মনে মনে বলে, 'কথা কও, হে মৌন রাত, কথা কও!'

নিশুতি রাত চীৎকার করছে, বউ কথা কও।

সন্ধ্যাবেলা শ্রীমতী কাফের জমজমাটির মাঝে আবির্ভাব হল তিলকঠাকুরের। বোধ হয় অভ্যাসের বশেই, পেছনের ঘরটার দিকে তাকিয়ে নাকের পাটা ফুলিয়ে বলে, 'ভাইপো, একদিন খাওয়াও বাবা বিলিতী রান্না, একটা দিন।'

আজ সন্ধ্যার ঝোঁকেই ভজুর মাথা এলিয়ে পড়েছে টেবিলের উপর। বলল, 'খাবে? বেশ, ব'সো। আজ খাওয়াব তোমাকে।'

তিলকঠাকুর কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না। খুশীতে ঢোঁক গিলে বলে, 'সত্যি বলছ ভাইপো!'

'সত্যি নয় তো কি মিছে! চরণ?' হাঁক্‌ল ভজু।

চরণ এল মুখ বেজার ক'রে। ভজু হুকুম দিল, 'দে, ঠাকুরকাকা যা খেতে চায় তাই দে। কোরমা পিস্ দে, কারি দে, চপ, কাটলেট, যা আছে সব দে।'

তিলকঠাকুর সকলের দিকে হেসে হেসে তাকায়। হাতে হাত ঘষে ব'সে পড়ে ভবনাথের পাশে। আবার ভবনাথকেই বলে গলা নামিয়ে, 'মাতালই বা কি আর ভগবানই বা কি। দুটোই সমান। ভজু আমার ভাইপো!'—

তিলকঠাকুর লোভী রাক্ষসের মত খায় তারিফ করে। বলে, 'এ যদি বিলিতী রান্না হয়, সত্যি বল্‌ছি, এ দেশটাও যেন বিলেত হয়ে যায়। বেঁচে থাক ভাইপো, শ্রীমা কেইফের দিন দিন ছিবিদ্ধি হোক।'

খাওয়া শেষ হলে ভজু বলল, 'আর খাবে না?'

'না ভাইপো, খুব খেয়েছি আর একদিন হবে।'

ভজু ডাকল, 'চরণ!'

'আজ্ঞে!'

'ঠাকুরকাকা কি কি খেয়েছে?'

চরণ বলল, 'চার পিস্ কোরমা, এক ডিস্ কারি, দুটো চপ, দুটো কাটলেট।'

ভজু বলল, 'মানে, তিন টাকা দশ আনা?'

তিলকঠাকুর একটু বিমর্ষ হয়ে বলল, 'সত্যি ভাইপো, তোমার অনেক পয়সা খেয়ে ফেললুম।'

'আমার কেন খাবে, তোমারই খেয়েছ।' ভজু বলল রক্তচক্ষু তুলে, 'সুদ আদায় ক'রে ফিরছ, ট্যাকেও টাকা আছে, দিয়ে যাও।'

জোর করে হাসে তিলকঠাকুর—'হেঁ হেঁ কি যে বল ভাইপো।' ভজু প্রায় দাঁড়িয়ে ওঠে, 'হেঁ হেঁ কি যে, নয়। তিন টাকা দশ আনা দিয়ে তবে যাও। চরণ কাছে দাঁড়া।'

তিলকঠাকুরের মুখ একেবারে অন্ধকার। ককিয়ে উঠল, 'তুমি যে আমাকে খাওয়ালে?'

'সবাইকে খাওয়াই, তা বলে কি পয়সা নিইনে?'

তিলকঠাকুর কেঁদে ফেলে প্রায়। সারা ঘরে আরম্ভ হয়ে যায় গুলতানি। ঠাকুরের সাক্ষী মানা কেউ-ই শোনে না।

'একে বলে আক্কেল সেলামী। দেবে তো দাও, নইলে বে-ইজ্জত হবে কিন্তু।' ধমকে ওঠে ভজু।

সত্যি চোখের জল মুছেই তিলকঠাকুর ট্যাক থেকে টাকা বার করে দিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে, 'আমি যদি খাঁটি বামুন হই, তবে তোকে অভিসম্পাত দিচ্ছি—'

'ভগবানকে দাও ঠাকুরকাকা, আমাকে যে তিনি গড়েছেন।'

তিলকঠাকুর ততক্ষণে চীৎকার করতে করতে পথে নেমে গিয়েছে।

ভজু চীৎকার করে ডাকল, 'ঠাকুরকাকা শোন।'

তখন তিলকঠাকুরের আশা হল, তবে বোধ হয় পয়সা দিয়ে দেবে। সে ফিরে এল।

ভজু বললে, 'আমি কে বল তো?'

'ভজু।'

'উঁ হুঁ, ভজুলাট। মনটা তোমার খারাপ হয়েছে, গানু পুরোতের ছেলের বিধবা বউয়ের কাছে যাও, ভাল লাগবে।'

তিলকঠাকুর পৈতে ধরে চীৎকার করে উঠল, 'হে ভগবান, হে ঈশ্বর, হে চন্দ্র সূর্য, এ শয়তানকে ধ্বংস কর। ধ্বংস কর।' বলতে বলতে চলে গেল।

ভজু বলল ভবনাথকে, 'আমার কাছে রমজানি। জান, শুনেছি, সি. আর. দাশকে একজন প্রফুল্ল ঘোষ সম্পর্কে বলেছিলেন, ঘোষমশাই খুব সরল। তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, একটা লোহার শিক গরম ক'রে ঘোষের মাথায় ঢুকিয়ে দিলে সেটা স্ক্রু-থ্রেডের মত পাকিয়ে বেরিয়ে আসবে। এ ব্যাটারা তাই।'

হাসিতে গোলমালে মত্ত হ'য়ে উঠল সব কেবল হীরেন ছাড়া।

আর একজনের চোখে কিছুই ছিল না। সুনির্মল তার দুটি চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল বাইরে, ওই এক নম্বর প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে, দু'নম্বর প্লাটফর্মের ওভারব্রীজের সিঁড়ির ভিতর দিয়ে এক টুকরো তারা মিট্‌মিট্ করা আকাশের দিকে! সেখানে শুধু সরসী রায়, ওই ঝিকিমিকি তারা তারই হাসি, তারই চোখ।

গণ্ডগোলের মধ্যে সে গান গাইতে লাগল,

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা?
কোন্ শূন্য হতে এল তার বারতা?

কিন্তু তিলকঠাকুর ছাড়বার পাত্র নয়। সেখান থেকে বেরিয়েই ছুটে গেল ভজুর বাবার কাছে। গিয়ে একেবারে কেঁদে পড়ল সে।

ভজুর বাবা মহাদেব হালদার বসে আছেন বাইরের বারান্দায়, চেয়ারে হেলান দিয়ে। চেহারাটাতে ভাঙ্গনের লক্ষণ সুস্পষ্ট, একটা বিরাগ ও উদাসীনতায় কেমন গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখায় তাঁকে। ভজুর তীক্ষ্নতা তাঁর মুখে চোখেও স্পষ্ট কিন্তু তা যেন কয়েকটা বিরক্তির তির্যক রেখায় বেঁকে রয়েছে। যেন মনে হয়, এ সংসারকে একদিন তিনি ভালবেসেছিলেন এবং প্রতিদানে ঠকেছেন। সেইজন্য আজ আর বিস্বাদের অন্ত নেই। তাঁর বিরাট খাঁড়ার মত নাকটা এখন অনেকখানি ঝুলে পড়েছে।

যেমন বসে থাকেন তেমনি বসে রইলেন হালদারমশাই। অপলক চোখে তাঁর সেই বিরক্তব্যঞ্জক দৃষ্টি দিয়ে তিলকের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

তিলক সমানে বলে চল্‌ল ভজুর কথা, কেবল বাদ দিল গানু পুরোতের ছেলেদের বউয়ের উল্লেখটা। বলল, 'সেই তোমার মনে আছে দাদা, কালী কায়েতের সঙ্গে তোমার শেষ মামলার দিন তুমি আমার কাছে দশটা টাকা চেয়েছিলে। আমার কাছে সাতশো টাকা ছিল আমি তোমাকে তবু দিইনি। টাকা আমার এত আদরের। তুমি তো তাতে আমার উপর রাগোনি। আর তোমার ছেলে খাওয়ার নাম ক'রে আজ কী দাগাটাই দিলে। খাঁটি বামুন হও তো, এর বিচার করতেই হবে।'

মহাদেব হালদারের কোন ভাবান্তর হল না এত কথা শুনে। যেমন শুনলেন তেমনি নির্বিকার ভাবে বললেন, 'তুমি এক কাজ কর তিলক। পাঁচ টাকা খরচ ক'রে দশ টাকা নিতে চাও?'

তিলকের চোখ জ্বলে উঠল, 'কে না চায় দাদা।'

'তবে দশটা পয়সা খরচ ক'রে তোমাকে সদরে যেতে হবে। গিয়ে আমাদের উকীল মিত্তির মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এক নম্বর ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে যাতে পড়ে সেরকম মুসাবিদা ক'রে ভজুর নামে একটা মামলা ঠুকে দিয়ে আসতে হবে। মানহানি ও মারধোর। পারবে?'

মহাদেব একই রকম চেখে তাকালেন তিলকের দিকে।

তিলকের চোখ জোড়া যাকে বলে একেবারে ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। সে কথা বলবে কি, তার খালি মনে হতে লাগল, কোথায় এসেছে সে। তার মুখ দিয়ে খালি বেরিয়ে এল, 'তুমি বলছ, তোমার ছেলের নামে।'

মহাদেব হালদার বললেন, 'আর মিত্তিরমশাইকে বলবে যে,—'

তিলক ততক্ষণে নেমে পড়েছে বারান্দা থেকে। বলল, 'আর ব'লো না দাদা, তোমাকে নমস্কার। তিন টাকা দশ আনা আমার আক্কেল সেলামী গেছে।'

বলে সে পোঁ পোঁ করে পালাল।

তাতেও কোন ভাবান্তর হল না হালদারমশায়ের। তিনি পুবের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, অন্ধকারের মধ্যে আরও অন্ধকার যেন ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। কেবলি উঠছে আর শ্বাসরোধ ক'রে ফেলছে।

তিনি বললেন, 'হে নারায়ণ।'

তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা অন্ধকার ছোট্ট ঘর এবং তার লোহার বেড়া। তার ভেতরে গালে হাত দিয়ে কে একজন বই পড়ছে। ফিস্ ফিস্ গলায় কয়েকটি শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে থেকে থেকে সেই অন্ধকারে, মুক্তি—স্বাধীনতা, মৈত্রী!—

কে একজন দাঁড়াল হালদারমশায়ের সামনে। তিনি চোখ বড় বড় ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ? নারাণ?' অর্থাৎ তাঁর বড় ছেলে। জবাব এল, 'আমি নি।'

'নি কে?'

'আমি তা।'

'তা?'

'আমি হস্‌সই...।' বলে নিতাই খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

হালদারমশাই বললেন, 'হারামজাদা।'

তাতে নিতাইয়ের হাসি আরও দুর্বার হ'য়ে একেবারে বাড়ী মাথায় ক'রে তুলল। যুঁই সচকিত হ'য়ে রান্নাঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। হতভাগাটা পড়াশোনা ছেড়ে পালিয়েছে।

জালিয়ানবাগ দিবসের ডাক নয়। স্মৃতি পালনের নির্দেশ দিয়েছে কংগ্রেস সারা ভারতময়, আহ্বান জানিয়েছে বি. পি. সি. সি। সুভাষ বসুর সঙ্গে মতান্তরকে কেন্দ্র করেই, বাংলা কংগ্রেসে একটা বামপন্থার ঝোঁক দেখা দিয়েছে যেন। তবে খুবই সামলে। যত সামলেই হোক, তবু ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষ বসুর উপর সভ্যপদ বাতিলের শাস্তি চাপাবেন, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বি. পি. সি. সি.-র উপর এ্যাড্‌হক্ কমিটি চাপানো হবে গান্ধীবাদী কংগ্রেসীদের নিয়ে। আর সুভাষবাবু একটা নতুন দল খাড়া করতে পারেন, এটাও কানাঘুষা।

এই কোঁদলের মধ্যে হীরেন আর কৃপালও ছিল। বি. পি. সি. সি.-র উপর তুষ্ট নয় সে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির উপরেও নয়। গত কয়েক বছরে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসের এ্যাসেম্বলীর কার্যাবলী তার পছন্দ হয়নি। সে দেখেছে নিজেদের মধ্যেই দলাদলি, ক্ষমতার অপব্যবহার। সে যা চেয়েছিল, গান্ধীজী যা চেয়েছিলেন, সে বস্তু সুদূর পরাহত। নিশীথ রাত্রির ঘুমন্ত ভারত, ঊষার মঙ্গলগান ও স্তোত্রে, ঘণ্টা ও কাঁসী-ধ্বনিতে মুখরিত মন্দিরের ভারতকে পাশ্চাত্ত্যের ডামাডোলের বাজারের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে সবাই। তাই সে আজ রাজনীতি থেকে অনেক দূরেই থাকে।.....দূরে না থাকলে উপায় কি! যে মন্দিরের সে স্বপ্ন রচনা করেছিল সেই মন্দিরের রক্ষাকর্ত্রী রামা ঝাড়ুদারনী। ফল পাকুড় ও স্বপাকের মিষ্টি দিয়ে দেবতার পুজো দেবে। সেই প্রসাদে তারা ধন্য হবে। কিন্তু কুৎসিত জগৎ তার বিষাক্ত কীটে পরিণত করেছে রামাকে। আর বউদি! তার চোখে শুধু আগুন আর একটা ভয়াবহ হাসি। ওই হাসি দেখে নাকি পুরুষে আবার মাতালও হয়। না, হীরেন পালিয়ে যাবে কোথাও।

কৃপালও বি, পি, সি, সি-র ব্যাপারে খুশী নয়। কিন্তু দু' নৌকায় পা দিয়েছে। ক্ষমতা পেতে চায় সে। তার সবচেয়ে বেশী রাগ ছিল প্রিয়নাথের উপর। ওদের সেন্ট্রাল কমিটি কায়দা ক'রে উদারতার সঙ্গে জানিয়েছে, 'কংগ্রেসের মধ্যে থাকা না থাকা নিয়ে বিবাদ করব না। ভেদপন্থার চেয়েও কাজের দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশী থাকবে।' অথচ, কাজ তো ছাই। সমাজতন্ত্রবাদের বাজে ধোঁকা দিয়ে খালি মজুর খেপানোই তাদের কাজ। শেষ পর্যন্ত তো সবাই ওই সুনির্মলের মত মাষ্টারনির পেছনে ছুটবে আর যক্ষ্মা রোগে ভুগবে।

সেইজন্য এই জালিয়ানবাগ দিবস ডাকের ব্যাপারে রথীন ও প্রিয়নাথের উপরে তার বিশ্বাস ছিল না। অথচ কংগ্রেস বলেছে, শান্তিপূর্ণ সভা ও শোভাযাত্রা হবে। সাধারণ নাগরিক ও ছাত্ররা তাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই শহীদদের স্মরণ করবেন। কংগ্রেস কর্মীরা অফিসে বৈঠক

করবেন। শোক প্রকাশ করবেন, প্রার্থনা করবেন ও শহীদের মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন।

কিন্তু বেলা বাড়তে দেখা গেল, স্কুলের ছাত্ররা সব গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত আকাশটাকে চমকে তুলল বহু তরুণ গলার ঘোষণা, 'জালিয়ানবাগ, জিন্দাবাদ।'

কৃপাল হীরেন এরা সব শ্রীমতী কাফেতে এসে থেমে পড়েছে। এ কি হল! এসব কার কারসাজি? ধর্মঘট বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের তো কোন কথা ছিল না। কংগ্রেস এরকম ডাক তো দেয়নি।

হীরেন বলল, 'রথীন ওখানে রয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে।'

কৃপাল বলল, 'কারণ?'

'তা কি জানি।' হীরেন হাত উল্টে বলল।

রথীন কংগ্রেসেরই সভ্য। সে কি ক'রে ছাত্রদের ধর্মঘটের মাঝখানে চলে গেল। তার পার্টির কাজ করবার কোন কথাই তাকে বলা হয়নি।

'সুনির্মলও আছে বোধ হয়?' কৃপাল খেঁকিয়ে উঠল।

হীরেন বিরক্ত হ'য়ে জবাব দিল, 'আমাকে ধমকাচ্ছ কেন?'

সে গীতাখানি বার করল পকেট থেকে।

একটা গলার স্বর ভেসে এল স্কুলের গেটের কাছ থেকে, 'বন্ধুগণ, ছাত্রবন্ধুরা, এ সেই ইংরেজের মিথ্যে ইতিহাস অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী নয়, আজকের এই দিনেই দিনের বেলা ইংরেজ হত্যা ক'রেছিল ভারতীয়দের, পাঞ্জাবের ঘেরা বাগানের চারদিক থেকে বন্দুকের গুলীতে!'.....গোলমাল বেড়ে উঠেছে।

মনে হ'য়েছিল ভজু ঘুমোচ্ছে টেবিলে মাথা পেতে। সে চীৎকার ক'রে উঠল, 'ঠিক—ঠিক বলেছিস্।'

কৃপাল সেদিকে কান না দিয়ে বলল, 'রথীন অন্তত ছেলেগুলোকে বাড়ী ফিরে যেতে বলবে তো!' হীরেন ডুবে গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণার্জুনের প্রশ্নোত্তরে।

ভজু তার মোটা গলায় ঘোষণা করল, 'ওরা আর কোনদিন বাড়ী ফিরে যাবে না।'

হেড্ মিস্ট্রেস্ সরসীর বুকের মধ্যে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে, হাওয়ায় কেঁপে ওঠা বুনো ঘাসের ডগার মত। তার সারা চোখে মুখে ঝড়ের প্রতীক্ষা। এখুনি এসে ঝড় আছড়ে পড়বে তার স্কুলের গেটে। বিদীর্ণ ক'রে দেবে তার কপট বাঁধ, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেই বন্যা তার এই ছোট্ট সরোবরের মত স্কুলটাকে, মেয়েরা বেরিয়ে পড়বে পথে পথে ছেলেদের সঙ্গে। সেই ঝড়কে চালিয়ে নিয়ে আসবে উদ্ধত পবনের মত সুনির্মল। বুঝি লণ্ডভণ্ড ক'রে দেবে তারও এ ঘরখানি, বুঝি তাকেও বেসামাল করে দেবে সেই ঝড়, তার হৃদয়কে, তার সমস্ত কিছুকে।

কিন্তু পারছে কোথায় তা সুনির্মল। মধ্যপথে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মুখ থেকে সিগারেটটা। অসহ্য বেদনায় বুকের মধ্যে যেন স্ক্রু বিঁধছে। আন্দোলন নয়, জালিয়ানবাগ দিবস নয়। শুধুই গিয়ে একবার ছাত্রদের সামনে দাঁড়ানো। তার হাজারো আলস্য ও ক্লান্তির মাঝে সে যে শুধুমাত্র নেশা। কিন্তু পথ চলা দায়। কাশির দমকে ছিটে ছিটে রক্ত রুমাল রাঙ্গিয়ে তোলে। সরসীর ইংরেজী আদ্য অক্ষর 'এস্' রুমালের কোণে যেন রাজহংসীর মত গ্রীবা বাঁকিয়ে রয়েছে। লাল রেশমের সে অক্ষর রক্তাক্ত।

অভূতপূর্ব ক্লান্তি। হে পৃথিবী থামো! ওই একটু দূরেই ছাত্রেরা ভিড় করেছে স্কুল গেটের সামনে, শ্লোগান ভেসে আসছে তাদের। ওই শ্রীমতী কাফের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কৃপাল দত্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে। সুনির্মল না এসে পারেনি শুধুমাত্র দর্শক হিসেবে।

অকস্মাৎ একটা কান্নার বেগ ঠেলে আসছে তার বুকে। এ কী জীবন তার! কি চেয়েছিল সে জীবনে। গোলমাল হ'য়ে গিয়েছে সব। বারবার বলতে থাকে, 'সরসী, সরসী আমাকে নিয়ে চল, অন্য কোথা, অনেক দূরে। শুধু আমি আর তুমি।' ...সে হাঁটতে আরম্ভ করে। হরিজন সেবা, পপুলার ফ্রন্ট, বম্বের কাপড়ের কলে ধর্মঘট আর মাদ্রিদ...

'পুলিশ।' কে চীৎকার ক'রে উঠল। ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল ছাত্ররা।

জালিয়ানবাগ আর আব্বাসউদ্দিনের কাশের বন—

ভজু চীৎকার ক'রে উঠল, 'ভুনু সারথি, গাড়ী মাঝপথে রাখ।'

হুকুম মাত্র গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে। উৎকণ্ঠিতা সন্ত্রস্তা মনিয়া ছুটে আসছে। মিনিলোসা..........। পুলিশের পথের সামনে বাধা।

ভবনাথ আফসোসে ভেঙ্গে পড়ল, 'ভজু...ভজু, আমার ছোট ছেলেটা ভয়ে বাড়ী পালিয়ে গেল হে স্কুল থেকে।'

সুনির্মল আসছে। দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতা। রাইখ্‌ষ্টাইগ ও লক্ষ গ্রাম বাংলা, সুভাষ-সীতারামাইয়া.........

'চলা আও কসম মেরি........।' মনিয়া দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কোচোয়ানের উঁচু টঙ্গের দিকে। কিছু না বুঝলেও একটা স্বরাজীর নেশা আছে ভুনুর। এই স্বরাজীর জন্য সে সব করতে পারে সেকথা জানে মনিয়া। তাই সে ছুটে এসেছে। ভুনুর জানটা যদি যায়। মিনিলোসার চোখে জল। 'চলা আও, আও।'

ভবনাথের সমস্ত কিছু গণ্ডগোল হ'য়ে গেল, দিশা হারিয়ে গেল মনিয়ার দিকে তাকিয়ে। জীবনে এই প্রথম চোখ আটকে গেল, পুরুষের চোখে যেন এই প্রথম নারী। বুকের মধ্যে যেন ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে উঠল ভবনাথের।

মনিয়ার ঘোর দুপুর গায়ের রং, চোখে ব্যাকুলতা, উত্তোলিত সুঠাম হাত, কাপড়ের আড়ালে উঁকি দেওয়া শক্ত পুষ্ট বুক, খোলা নাভিস্থল, তার নীচে শাড়ীর বাঁধন। মোনালিসা নয়, মিনিলোসা! হ্যাঁ, ওই নামই তো অনেকবার শুনেছেন ভজুর মুখে। শুনেছেন ভুনুর মুখে। কিন্তু ভাবতেও পারেননি এমন করে ওই কোচোয়ানি মিনিলোসা ঝড় তুলবে তাঁর বুকে। এ কি হল বুকের মধ্যে। কি হল তাঁর চোখের। ছি ছি ভবনাথ। ....কে তুমি ভবনাথ?

কেউ নয়, এক চরিত্রবান ভদ্রলোক, নাম ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'গাড়ী হটাও।' দারোগা চীৎকার ক'রে উঠল।

'দাঁড়া ভুনু, গাড়ী চেপে বাড়ী যাব।' চেঁচিয়ে উঠল ভজুলাট।

বাঁ দিকের রাস্তায় বেঁকে যাচ্ছে মিছিল।

সুনির্মল ভেসে গিয়েছে জনারণ্যে। কালিদাস আর ভারতচন্দ্র, মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ! মন চমকে উঠল সুনির্মলের।

হ্যাঁ, সরসীর সঙ্গে যে সে শান্তিনিকেতনে যাবে। লাঠির আঘাত পড়ল ঘোড়ার মাথায়। পেছিয়ে গেল গাড়ী।

পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল স্কুলের গেটে, বাঁ দিকের রাস্তায়। একটা ছেলে এসে ছিটকে পড়ল গাড়ীর কাছে। মনিয়া তাকে তুলে দিল গাড়ীর মধ্যে, দিয়ে নিজে উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

কৃপাল হীরেনের হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল গীতাখানি। দিয়ে বেরিয়ে গেল পেছনের দরজা দিয়ে।

পুলিশ মার্চ ক'রে গেল গীতার উপর দিয়ে, থেঁৎলে দলে।

এ কি একুশ সাল না তিরিশ সাল?

ভুনু নামিয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল ছেলেটাকে শ্রীমতী কাফেতে।

ভজু চেঁচিয়ে উঠল, 'শ্রী শ্রীধরের ছেলে, তুই কানু না?'

কানু বলল, 'হ্যাঁ! ওরা কোথায় গেল?'

চোখ আর কপাল ফুলে উঠেছে কানুর! ভজু তাকে দু'হাতে টেনে নিল বুকের কাছে। বলল, 'ওদের সন্ধান পরে হবে। কিন্তু, তুই যে সত্যি দেব-সূত রে। চরণ, এক গেলাস দুধ দে।'

ভুনু বলল, 'লাটঠাকুর, বউ নিয়ে ঘরে যাচ্ছি।'

'যা।' ভজু বলল। সামনের রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে আসছে। পুলিশ চলে গেছে মিছিলের সঙ্গে। স্কুলবাড়ীটা ফাঁকা পোড়োবাড়ীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মনিয়া গাড়ীর ভেতর থেকে উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে আছে কানুর দিকে। যেন ভুনুর সোয়ারী বসে আছে গাড়ীতে।

ভবনাথের চোখের পলক পড়ে না। এক সন্ত্রস্তা মেয়ে আলুথালু বেশ, অযত্নের এলো চুল, কী বিচিত্র তার গায়ের রং, অপূর্ব গঠন। এ যে দুর্গা প্রতিমার আর এক রূপ! চোখ গেল! চোখ গেল! এ কি হল!

নিয়োগী হতভম্বের মত তাকিয়ে রয়েছে ছেঁড়া গীতাটার দিকে। ছিন্নভিন্ন পাতাগুলি উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। ......প্রসাদে সর্ব দুঃখানাং হানিরস্যোপজয়তে....কায়েন মনসা বিদ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি.....যেন সমগ্র ভারত ছিন্নভিন্ন হচ্ছে!

কানু সসঙ্কোচে দুধের গেলাসে চুমুক দিল। ভজু বলল, 'ওরে, তোকে বেঁধে রাখার জন্য দুধ দিইনি, দিয়েছি তোর প্রাণটার জন্য। তোকে সেদিন মাংস খাইয়েছিলুম ব'লে তোর বাপ আমাকে গালাগালি দিয়ে গেছে। গেলই বা, তোর জন্য শ্রীমতী কাফের দরজা চিরদিন খোলা রইল।'

ভজুর মনে পড়ে গেল, তার ছেলেমেয়েরা ঠিকমত দুধ পায় না। না-ই বা পেল। কিন্তু কানু—!

ভজু বলল, 'নারাণ হালদারের নাম শুনেছিস্?'

কানু তার লাঠির আঘাতে ফোলা চোখটা তুলে বলল, 'জানি, আপনার দাদা।'

'আর তোর?'

কানু জবাব দিল, 'রথীনদা বলেছেন, তিনি আমাদের গুরুদেব।'

গুরুদেব! ভজু তার ড্রয়ারের ভেতর থেকে একখানা বই বের করে, তার ভেতরে একটা ছবি খুলে ধরল কানুর সামনে। বলল, 'চিনিস এ লোকটাকে?'

ছবিটার নীচে লেখা রয়েছে 'ঋষি কার্ল মার্কস।'

কানু বলল, 'ইনি কোথাকার ঋষি?'

ভজু বলল, 'বিশ্বের!—বইটা তোদের গুরুদেবের ঝোলায় ছিল, পড়েছে আমার হাতে। আমি তোকে দিলুম, তুই পড়বি। খবরদার, কেউ যেন না দেখে।'

ব'লে দুধ খাইয়ে কানুকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল সে। দিয়ে এসে দাঁড়াল তার সেই র‍্যাফেলের মা, সিরাজদ্দৌলা আর রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটির সামনে।

এমন সময় বিনা বাধায় পুলিশ ঢুকে তল্লাসী চালাতে আরম্ভ করল শ্রীমতী কাফের ঘরে।

দারোগা বলল, 'আপনার এখানে কেউ লুকিয়ে আছে?'

ভজু ধীর গলায় বলল, 'আছে।'

দারোগা উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে? প্রিয়নাথবাবু?'

ভজু বলল, 'কাছে আসা হোক।' তারপর কৌতূহলিত দারোগাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, সি, আর, দাশ, রবীন্দ্রনাথ, র‍্যাফেলের মা-ছেলে আর সিরাজদ্দৌলার ছবিটা। পরে নিজেকে দেখিয়ে বলল, 'এই এঁরা, আমিও লুকিয়েই আছি, খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

দারোগা হঠাৎ রাগে এক মুহূর্ত গম্ভীর থেকে বলল, 'সকালবেলাই বোধ হয়—'

'না না, পেটে মাল পড়েনি, মাইরী বলছি।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ভজু, 'সেইজন্যই তো ভাল ক'রে কথা বলতে পারছি না। যাবার আগে আমার ওই সুদর্শন চক্রধারীর ছবিখানিও দেখে যাবেন, উনি নরনারায়ণ।'

দারোগা বেরিয়ে যাওয়ার মুখে হীরেনকে বলল, 'আপনি চলুন থানায় একটা ষ্টেট্‌মেন্ট দেবেন।'

কিন্তু ভজুর মুখে একটুও বিদ্রূপের আভাস নেই। তার সারা চোখ মুখ আগুনের মত ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে জ্বলছে। নিজের পেটটা চেপে ধরে ফিস্‌ফিস্ করছে, সত্যি আমি লুকিয়ে আছি। আমি পলাতক, পালিয়ে আছি সকলের কাছ থেকে। যুঁই আর সন্তানদের কাছ থেকেও। কেন, কেন এমন হ'ল!

গার্লস স্কুলে ধর্মঘট ক'রে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে অলিগলিতে, গঙ্গার ধারে, মাঠে, গ্রামে। যেন ঝড় এসেছিল কালবৈশাখীর, আবার সব শান্ত হয়ে গিয়েছে। কেবল কারখানাগুলোর গেটে পুলিশ এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন আবার ঝড়ের আশঙ্কায়।

জ্বরতপ্ত সুনির্মলকে নিয়ে সরসী ফিরে গিয়েছে তার কোটরে।

আস্তাবলে গাড়ী ঢুকতেই মনিয়া একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভুনুর উপর।—'কেন, কেন গোযার কাঁহিকা!'

বলে আর ভুনুর গায়ে পিঠে ছোট্ট দস্যি মেয়েটার মত হাত চালাতে থাকে। ভুনু সেসব গ্রাহ্য না ক'রে হা হা ক'রে হেসে উঠে আস্তাবলের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। জোর ক'রে মনিয়ার হাত দুটো ধ'রে বলল, 'বুজদিল আওরত্! আমি তোর মরদ ভুনু নয়? অতগুলো ছোকরাকে পুলিশ মারবে, আমাকে আটকাতে হবে না?'

'কাঁহে?' রুদ্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মনিয়া।

'কাঁহে?' রাগ হয় না, মায়া হয় ভুনুর। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে, 'এটা আজাদির লড়াই জানিস্ না?' তারপর নিজের মাথা থেকে বানিয়ে বলতে থাকে, 'মহাত্মা গাঁধী আছে না? উন্‌কে জেলে নিয়ে গেছে তাই। লারাইন্‌ঠাকুর ফের আসবে কিনা, ছোকরারা সে দেওতাকে ফিরিয়ে আনতে চায়।'

মনিয়া কিছুক্ষণের জন্য সত্যি সব ভুলে বড় বড় চোখে তাকিয়ে ভুনুর কথা শুনতে থাকে।

ভুনু আপন মনে তার যা খুশী তাই বলতে থাকে। গান্ধী, মতিলাল, আর ইংরেজ। কোন বিষয়েই তার পরিষ্কার ধারণা নেই, স্বাধীনতা কেন এবং কিসের তারও কোন খেই পায় না সে ভেবে ভেবে। কিছুক্ষণ পর মনিয়া তার পেষম খুলে ধরে। হাসি গোপন করে ব'লে ওঠে, 'হরবখত্ তুম এ্যয়াসা ক'রেগা তো হম্ ভাগ যায়েগা কিসিকো সাথ্!'

ফের সেই কথা। মুহূর্তে ভুনুর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। উগ্র রক্ত চোখে তাকায় মনিয়ার দিকে। মনিয়া ওর হৃদয়ের তলাটুকু চিনে ফেলেছে যেন। কিন্তু ঠাট্টা হলেও একথা শুনতে পারে না সে। মনিয়া ঘাড় বাঁকিয়ে হাসে, আড়ে আড়ে চায় আর বলে, 'হাঁ সচ্।'

ভুনু এমনভাবে দাঁড়ায় যেন এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে মনিয়ার উপর। কিন্তু সে হঠাৎ পেছন ফিরে বাইরের দিকে পা বাড়ায়। অমনি মনিয়া হাসিতে ফেটে প'ড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে দু'হাতে! খেলাটা যেন তার রোগে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ভুনু টানা হ্যাঁচড়া করতে থাকে, বেসামাল মনিয়ার গায়ের থেকে কাপড় খসে পড়ে। তবুও ছাড়ে না, হাসে আর প্রতিজ্ঞা করতে থাকে আর কোনদিন বলবে না।

তাতেও হয় না। তারপর হাসি ছেড়ে কান্নার পালা আসে। কঠিন গালাগালিতে ভুনু ভাটা দেয়, হয় তো কষে থাপ্পড়ও কষায়। তারপর হয় এর পরিসমাপ্তি।

বাঁকা অওরত বাঁকা তার কথা। তার আকাঙ্ক্ষাও বাঁকা। কি চায় মনিয়া! সত্যি কি মোনালিসা হতে চায় সে! কি ক'রে হওয়া যায় তা তো জানে না ভুনু।

মনিয়া মুক্ত হতে চায়। কিসের মুক্তি? তার শরীরের মাঝে বন্ধ মহাসমুদ্রের মুক্তি। সে কি, মৃত্যু? না, না, এ দুনিয়াতে কেউ তোমরা অওরতের দুঃখ বোঝ না। নিজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি আর উল্লাস, তাকে সে আর ধরে রাখতে পারে না। তাকেই সে মুক্তি দিতে চায়।

কে বুঝবে? ভুনু নিজেকে বোঝে না। ভাবে সে নিজে কি চায়। এক এক সময় মনে হয়, জিন বাঁধা লাগামের বন্ধন ছিঁড়ে সে শুধু উন্মুক্ত মাঠে ছেড়ে দিতে চায় তার রাজারাণীকে।

ভজু বলে, 'বাঁড়ুজ্জেদা, রোজ ঘুম থেকে উঠে দেখি একটা ক'রে বছর চলে যায়। চুল যে আমার পেকে যাচ্ছে।'

ভবনাথ চুপ ক'রে থাকেন। দেড়বছর হ'য়ে গিয়েছে, প্রথম প্রেমের গোপন বেদনা তাঁর বৃদ্ধ হৃদয়টিকে দুমড়ে ফেলেছে। ভজুকেও পারেন না সেকথা বলতে। এ কি হল? ঘর-বার যে সমান হয়ে গেল। একে কি ভীমরতি বলে? হবে বা, কিন্তু বুকে যে ঝড়, রক্ত যে তোলপাড়। যুবকদের কি প্রেমে পড়লে এমনি হয়? নিদ্রাহীন রাতে কেবলি সেই নারীর মুখ। নারী নয়, হায়, সে যে গাড়োয়ানের বউ!

ভজু হাঁফায়। গায়ে সব সময়েই যেন জ্বর। পেটে যেন কি হয়েছে। মনে হয় যেন অনেকগুলো বিষফোঁড়া হয়েছে। তবু বিলিতী আরসীতে মুখ দেখে, আর বলে,

সাদা চুল দেখেছ বটে, মনটি কিন্তু রাঙ্গা,
সাকী তুমি যতই নাচ, এ দিল যাবে না ভাঙ্গা।

আর আজকাল সে যখন তখন ভবনাথের কাছে কেবলি শ্রীমতী কাফে, গৌর, নিতাই, যুঁই, এদের প্রসঙ্গ পেড়ে বসে। একটা দারুণ অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা যেন তাকে ধীরে ধীরে ময়ালের মত গ্রাস করছে।

মাঝে মাঝে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কানুর দিকে। সে এখন রীতিমত রথীনদের দলের সঙ্গে কাফের পেছনে বৈঠক করে। তাকে এসে প্রণাম করে আর বলে, 'জানেন, সে বইটা আমি পড়েছি, অনেককে দিয়েছি পড়তে। আমাদের পথ কেউ রোধ করতে পারবে না।'

এ অঞ্চলে ঝড় এনে দিয়েছে সরসীর সিঁথির সিন্দুর। সে বিয়ে করেছে সুনির্মলকে, আচমকা ষ্টার্ট দেওয়া মোটর ঝাঁকানির মত অন্তঃপুরের বিধবারা যেন ঝাঁকানি খেয়েছে। শ্রাবণে যেন চৈত্র এসেছে। এতবড় পুরুষ কে?

সুনির্মল। কিন্তু সরসীর সিঁথির ঔজ্জ্বল্য নেই তার চোখে। তাদের পুরোনো আমলের নোনা ধরা বাড়ীটার অন্ধকারের মত ছায়া চেপেছে তার চোখে। সন্ধ্যা-আহ্নিকে স্তব্ধ তার মায়ের মত হৃদয় স্পন্দন যেন নিঃশব্দ। দেরী হয়েছে, বড় দেরী হয়ে গিয়েছে। সরসীর সমস্ত উষ্ণতাও আর যেন টিকিয়ে রাখতে পারে না।......

এখানকার একটি স্কুল কমিটি চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে সরসীকে। সরসী চলে যাবে সুনির্মলকে নিয়ে, সমুদ্রের তীরে, কোন স্বাস্থ্য নিবাসে। এত সহজে হাল সে ছাড়বে না। আবার যে সে সিঁদুর পরেছে এখনি মুছে ফেলার জন্য? না, তার জীবন-তারার মত ওই সিন্দুর বিন্দু কিছুতেই হারাতে দেবে না সে।

'ভুনু।' ডাকতে ডাকতে ভুনুর আস্তাবলের ভেতরে বাড়ীর ভেতরের গলির মুখটার কাছে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়েন ভবনাথ। এ কি করছেন তিনি, এ কি? চরিত্রবান ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রিটায়ার রেলওয়ে কর্মচারী, ঘর ভরা তিন ছেলে, এক বউ।... কিন্তু বুক যে পুড়ে গেল, গোপন প্রেম যে আর সহ্য হয় না। আজ মৃত্যুকে ধ্রুব করে এসেছেন। এর শেষ চাই।

মনিয়া বেরিয়ে এসে থম্‌কে দাঁড়াল। দেখল, শান্তশিষ্ট এক বুড়ো ভদ্রলোক, হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। পলকহীন চোখে তার একটু বিস্ময়, একটু-বা আর কিছু। কিন্তু প্রসন্ন চাটুজ্জের মত খারাপ মনে হল না।

মনিয়ার ঘোমটা নেই। কাজের ফাঁকে সামান্য আঁচল টেনে দেওয়া বুকে। তার সরম হল না। বলল চোখ তুলে, 'উ তো ঘর মে নহি হ্যায় বাবু।'

ভবনাথের গোঁফ কেঁপে উঠল, হাত পা কাঁপছে থরথর ক'রে। ভাঙ্গা গলায় ব'লে উঠলেন, 'তোমার কাছে এসেছি।'

মনিয়া হতবাক্। লোকটা কিরকম বোকা হয়ে গেছে যেন, একটা ভালো মানুষ কিসের শোক পাওয়ার মত। দু'পা এগিয়ে আবার দাঁড়াল। মনিয়া তাজ্জব। লোকটা কেঁদে ফেলবে নাকি? কোন দুঃসংবাদ এসেছে, তার মরদের গাড়ীতে যাবে বুঝি? কিন্তু মনিয়াকে চায় কেন? সেও এগিয়ে এল, জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে আছ বাবু?'

ভবনাথ একেবারে হতভম্ব শিশুর মত বলে ফেললেন, 'আমি? আমি ভবনাথ, ভবনাথ বাঁড়ুজ্জে। চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। আমি—আমার বড় ছেলের বিয়ে হয়েছে, আমার—'

হঠাৎ ভবনাথের গলা বন্ধ হয়ে গেল, সব ঝাপসা হয়ে গেল চোখের সামনে। তাঁর বুকটার মধ্যে যেন গলানো উত্তপ্ত সীসা ঢেলে দিয়েছে কে? মুহূর্তে সব জমে তাঁকে একেবারে পাথর ক'রে দিল। তাঁর মনে হল, নিজের মুখটা যেন একটা কালো জানোয়ারের মত দেখাচ্ছে। তিনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন, 'মিনিলোসা, আমি ভবনাথ।'

বলে তিনি দু' হাতে মুখ ঢেকে সেখান থেকে কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। মনিয়া অবাক হ'য়ে পেছন পেছন এসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে খালি বলল, 'মিনিলোসা.......ভওনাথ।'

সন্ধ্যাবেলা এলেন ভবনাথ শ্রীমতী কাফেতে। এক হাতে স্যুটকেশ, আর এক হাতে ছোট বিছানা। বললেন, 'ভজুলাট ভায়া, আজকে রাত্রেই রওনা হলুম হরিদ্বারের দিকে।'

ভজুলাট মাথা এলিয়ে পড়ে আছে। শুধু মদের নেশায় নয়, অসহ্য পেটের যন্ত্রণায়। ব্যথায় প্রায় সংজ্ঞা নেই তার। খালি বলল জড়িয়ে জড়িয়ে, 'চল, যাচ্ছি।'

ভবনাথ তার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'সেই ভাল, ভাই।' বলে হেসে চোখের জল মুছে চলে গেলেন।

পিওন চিঠিটা দিয়ে গেল শ্রীমতী কাফেতে। আন্দামানের চিঠি। অসীম সমুদ্রের দূর দ্বীপ থেকে আসা এক ঝলক রোদ।

খুলতে গিয়ে ভজু মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। পেটের নাড়িতে নাড়িতে সহস্র বিস্ফোটকের যন্ত্রণা। সমস্ত লিভারটা যেন বিষাক্ত পুঁজ রক্তে ফুলে উঠেছে। চিঠিটা দুমড়ে যেতে লাগল হাতের মুঠোয়। মেঝেতে ছেঁচড়ে যেতে লাগল মুখ। পথের নিশানা এসেছে, মুক্তির সন্ধান এসেছে, খুলে পড়তে চায় ভজু।

ভুনু দেখে তাড়াতাড়ি নেমে এল গাড়ীর উপর থেকে। দু'হাতে ভজুকে তুলে ডাকল, 'ঠাকুর, লাটবাবু?' ব্যথায় নীল মুখ ভজুর শব্দহীন।

চরণ ভুনুর গলার স্বরে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা বুঝল। বলল, 'ব্যথা উঠেছে, বাড়ী নিয়ে যেতে হবে।'

ভুনু বলল, 'আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

হাতে চিঠিটা মুঠো করা অবস্থায় ভুনু ভজুকে পাঁজাকোলা ক'রে গাড়ীর গদীতে শুইয়ে, চালিয়ে নিয়ে গেল।

বাড়ীর সামনে গিয়ে নামতেই বারান্দা থেকে নিতাই চেঁচিয়ে উঠল, 'মা বাবা মাতাল হয়েছে, ভুনু কোচোয়ান নিয়ে এসেছে।'

যুঁই ছুটে বেরিয়ে এল। ভুনু নিয়ে তাকে শুইয়ে দিতেই যুঁই আর্তনাদ ক'রে উঠল, 'এ কি, এ কি মুখ হয়েছে, হাত পা এত ঠাণ্ডা কেন?'

সব ছেলেমেয়েরা ছুটে এল। নিতাই বলল, 'মদ তো ঠাণ্ডাই।'

হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে যুঁই দেখল, খোলাই হয়নি, দুঃসংবাদের কারণ তো নয়। তবে এমন হল কেন? সে ডাকল ভজুর বুকে হাত দিয়ে, 'ওগো, ওগো সব শুনছো? কি হয়েছে তোমার? পেটে ব্যথা?' ভজু কোনরকমে ঘাড় নাড়ল, আর কি সব বিড়বিড় করতে লাগল। যুঁই বলল, 'ভুনু, একবার ডাক্তারকে ডাক দাও।'

ভুনু ছুটল। যুঁই রান্নাঘরে গিয়ে গরম জল বসিয়ে দিল। তারপিন তেল ফেলে দিল দু'ফোঁটা। ফ্লানেল বের করে আবার ভজুর কাছে ছুটে গিয়ে বসল সে।

এমন অবস্থা তো কোনদিন দেখেনি। হাত পা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে বলল, 'ওগো, কতদিন যে তোমাকে বলেছি, কতদিন। আজ এ কি করছ, এ কি করছ, তুমি?'

ছেলেমেয়েরা সবাই বুক টনটনানি নিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেবল নিতাই যেন রাগ ক'রে বসেছিল বাপের কাছে। কেন এত মদ খাওয়া?

ভজু বলল স্তিমিত গলায়, 'চিঠি—'

যুঁই বলল, 'পড়ব?'

ভজু ঘাড় নাড়ল। যুঁই চেঁচিয়ে পড়তে লাগল,—

কল্যাণীয় ভজু,

তোর চিঠি পেয়েছি। জানিস তো চিঠি আসতে কত দেরী হয়! তুই মনটা অত উতলা করিস্ কেন। তোরাই আমাকে দেখতে চাস্, আমার বুঝি তোদের দেখতে ইচ্ছে করে না? অত ভাবিস্নে। দ্যাখ্, মানুষ চিরদিন একরকম থাকে না। আমিও নেই। তোর সেই ছোটকালের কথা মনে আছে, আমি সাধু হয়ে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলুম? সেটা কতবড় পাগলামী! বৃথাই ভগবান বলে চেঁচিয়েছি। বারবার যে হাত তুলে নমস্কার করেছি আকাশের দিকে তাকিয়ে, সে যে তোদেরই, তোরাই সে যে। প্রমীলাকে বলিস্, বাইরে গেলেই দেখা করব.....'

তারপর কালি লেপে দিয়েছে চিঠিটাতে। যেন দ্বীপের পরে অথৈ সমুদ্র।

ভজু তা বুঝল। তাঁর দুই চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। সে বলল ভাঙ্গা গলায়, 'যুঁই। গৌর, নিতাই, শামু, মিনি—'

আবার চুপ হয়ে গেল। যুঁই বলল, 'বল কি বলছ, বল।'

ডাক্তার এলেন। এসেই তাঁর চোখ মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল। ভজুর হাত নিয়ে নাড়ি দেখলেন।

যুঁই ডাকল, 'ডাক্তারবাবু!'

ডাক্তার বললেন আচমকা নিশ্বাস ফেলে, 'উনি যা চান, ওঁকে তাই দিন।'

'কী বললেন, কী বললেন' যুঁই ডুক্‌রে কেঁদে উঠল।

ভজু হঠাৎ পরিষ্কার গলায় ডাকল, 'যুঁই মণি, কাঁদিস্নে। এদিকে আয়, আমার ছেলেমেয়েকে আমার কাছে দে।' যুঁই তাড়াতাড়ি সব ছেলেমেয়েকে তার কাছে এনে দিল। বলল, 'ওগো তুমি কি চাও একবার বল?'

ভজু দু'হাতে ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে এনে বলল, 'আমাকে একটু মদ দাও।'

ডাক্তার বললেন, 'মদ?'

যুঁই তাকাল ডাক্তারের দিকে। তীব্র-ব্যাকুল দৃষ্টি তার।

ডাক্তার আবার একবার ভজুর হাত তুলে নাড়ি দেখল। কিন্তু মুখ আরও কালো ক'রে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

যুঁই বলল, 'বাধা দেবেন না ডাক্তারবাবু, আমাকে দিতে দিন। আর কোনদিন যে চাইবে না।'

বলে সে পাগলিনীর মত পাশের ঘরে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল! দেখল তার শ্বশুর, তার স্বামীর মদটুকু খেয়ে, বোতলটি নিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই মাত্র যেন ঝড়-ভাঙ্গা গাছটা পাতা ডালপালাহীন অবস্থায় দুমড়ে হা ক'রে রয়েছেন। বুঝি পড়ে যাবেন এখুনি।

যুঁই চীৎকার করে উঠল, 'পিচাশ...রাক্ষস!...'

ভজুর গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসছে। তবু বলছে, 'ভেবেছিলুম কত ভয় করবে, কত ভয়। না, ভয় নেই যুঁই—বাবাকে ডাক।'—

তারপর ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল,

কথা বল হে মৌন রাত,
চোখ চাও...
মুক্তি দাও।...

ভুনু দশ বছর আগের মত আচমকা ঘোড়া দুটোকে ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। হট্ যাও—মত রোখো। রাজা-রাণী চল। কিন্তু কোথায় যাবে সে। মনে হ'ল তারও জীবনে, যৌবনের অধ্যায় আজ শেষ হয়ে গেল।

শ্রীমতী কাফের দরজা কয়েকদিন বন্ধ রইল। কাচের দরজায়, 'শ্রীমতী কাফে, ভিতরে আসুন।' কথাটাতে সামান্য ধুলো পড়ল। চরণও ভজুর বাড়ীতে রাত্রে শোয়। বারান্দাটায় শুয়ে রইল কয়েকদিন একটা কুকুর, তার সঙ্গে কুটে পাগলা। শুধু প্রিয়নাথেরা যেন ঘরছাড়ার মত কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল।

তারপর আবার খোলা হল একদিন। গৌরকে বসিয়ে দিয়ে গেল তার বাপের চেয়ারটাতে তার মামা।

ভুনু হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল ছেলেটার দিকে। শ্রীমতী কাফের আর এক পর্ব শুরু। কেবল ভুনুর মনে হল, ছিমতি যেন আজ বেওয়া বাউরী হয়ে গিয়েছে। হাঁ, এ তো লাটবাবুর অওরতের মতই। লাটবাবুর প্রাণের ছিম্‌তি কাফে।

তারপর উনিশ শো আটচল্লিশ সালের শেষ দিকে একটি দিন। দীর্ঘ দিন চলে গিয়েছে। দীর্ঘ কতকগুলি বছর। তার মাঝে গেছে সর্বগ্রাসী যুদ্ধ আর মন্বন্তর। মানুষ মরেছে লক্ষ লক্ষ। শহীদ হয়েছে শত শত বিয়াল্লিশ সালের সংগ্রামে, ছেচল্লিশের আজাদ হিন্দ দিবসে।

কিন্তু আজকের এই সকালে শ্রীমতী কাফে দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। না, তেমনি নয়, একটু অন্যরকম।

সাইন বোর্ড আছে তেমনি। তবে একদিকে কাত হয়ে পড়েছে। বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। অস্পষ্ট হয়েছে লেখাগুলি। দরজাগুলি পুরোনো হ'য়ে গিয়েছে। চেয়ারগুলি হাল আমলের রূপ ধরেছে। ভেতরে ছবিগুলির অধিকাংশ নেই। নেই ভজনের সেই প্রিয় ছবি রবীন্দ্রনাথ, মেরী, সিরাজদ্দৌলা, আর র‍্যাফেলের মা। নেই নারায়ণের ছবি। ঘড়িটার লেখাগুলি ক্ষয়ে গেছে। ঘড়িটার নীচে একটা কাগজে লেখা রয়েছে, 'লিকার স্ট্রিক্‌ট্‌লি প্রোহিবিটেড'।

প্রোপাইটারের চেয়ারে বসে আছে একটি নির্জীব মত লোক। চেহারায় নির্জীব, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। লোকটা একমনে কাগজ পড়ছে।

তার পাশে ঝুঁকে আছে একটা ছেলে। ছেলে নয়, যুবক। এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, লম্বা শক্ত গড়ন। টানা টানা চোখ, কিন্তু বিবর্ণ। বয়সের চেয়েও মুখটা পাকা। একটা কঠিন নিষ্ঠুরতার ছাপ।

ঝুঁকে আছে দুই বগলে দুটি ক্রাচ্ চেপে। হাঁটুর খানিকটা উপর থেকে তার একটা পা নেই। হাফ প্যান্টের তলা দিয়ে একটা পা নেমে এসেছে আর একটার তলায় গোল একটা মাংসের ড্যালা থল্ থল্ করছে। তার ওই নরম মাংসের ড্যালাটা প্রায় একটা কাবুলী এসে টেপে আর বিশ্রি করে হাসে। ছেলেটাও হাসে তার পায়ের দিকে তাকিয়ে। বলে, 'কেটে দেব মাংসটুকু।'

সে শ্রীমতী কাফের বাবুর্চি। বয়। নাম তার নিতাই, ভজুর ছেলে।

ভজনের মৃত্যুর পর গৌর বছরখানেক দোকানে বসেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, স্বল্পভাষী সুন্দর গৌর একবছরের মধ্যে একেবারে অন্য ধরনের হ'য়ে গিয়েছিল। নানান্ কুসংসর্গে প'ড়ে তার চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করেছিল। তার পক্ষে শ্রীমতী কাফের হুইল ধরা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন সেটা এখানকার নীচু শ্রেণীর বদমাইসদের আশ্রয়স্থল হ'য়ে উঠেছিল।

প্রতিবাদ করার ছিল একমাত্র চরণ। প্রতিবাদ প্রিয়নাথও করেছে। কিন্তু গৌর তাদের সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

কংগ্রেসের সবাই এমনিতেই তখন সরে গিয়েছে। হীরেন এখন কলকাতাবাসী। কৃপাল কংগ্রেসী এম. এল. এ.। সে যখন এখান দিয়ে মোটরে করে যায়, তখন একবারও তার স্মৃতিপথে এই শ্রীমতী কাফের কথা মনে হয় না।

প্রিয়নাথ একদিন গিয়ে যুঁইকে বলেছিল গৌরের কথা। যুঁই শুধু বলেছিল, 'ওটা ওর বাপের সম্পত্তি ঠাকুর পো! আর গৌর যে এমনি হয়েছে, তাতে আমি একটুও অবাক হইনি। না হলেই ভাবনায় পড়তুম। তা, ও যদি শ্রীমতী কাফেটাকে একেবারে শেষ ক'রে দিতে চায়, দিক। একবার ঘুচে গেলে আর শুনতে হবে না কিছু।'

প্রিয়নাথ যুঁইয়ের মুখের দিকে আর তাকাতে পারেনি। প্রিয়নাথ হয় তো আরও কিছু করত, কিন্তু ঠিক সেই সময় কমিউনিষ্ট পার্টিকে সরকার বে-আইনি করে দিল। আত্মগোপন করল প্রিয়নাথ।

একবার শেষবারের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন হালদার। এই বয়সে, পাড়ায় ঘুরে ঘুরে শ্রীমতী কাফেটা তিনি একজনকে লিজ দিলেন।

ততদিনে গৌর হালদার উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে। বিড়ি সিগারেট ছাড়িয়ে নেশার দৌড় তার অন্যদিকেও গেল। চরিত্রেও দোষ দেখা দিল।

যুঁই একটা প্রাণহীন পুতুলের মত সব তাকিয়ে দেখেছে। সে দুঃখিত না বিস্মিত, কিছুই তার চোখ দেখে বোঝা যায়নি। রাত্রে ঘুমন্ত গৌরকে দেখত সে। মনে হত, তার স্বামী শুয়ে আছে যেন। পরমুহূর্তেই তার গায়ের মধ্যে ঘৃণায় কাঁটা দিয়ে উঠত। ভজন আর গৌর, এ যে স্বর্গ মর্তের তফাৎ।

কিন্তু কি আশ্চর্য! শ্রীমতী কাফে বছরে বছরে কেবলি হাত বদলি হ'য়ে চলল। সবাই নাকি খালি লোকসানই দেয়। শ্রীমতী কাফের প্রোপাইটারের চেয়ারটা যেন অভিশপ্ত, অভিশপ্ত দোকান। এখানে কেউ-ই বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। কেউ কেউ বলে, ভজুলাটের ভূত চেপে আছে দোকানটায়। এ আর কেউ চালাতে পারবে না।

সত্যি, চলে না। যারা লিজ নেয়, তাদের একটা মাসিক টাকা যুঁইকে দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে হয়। কিন্তু বেশীদিন সেই চুক্তি পালন করা চলে না। অথচ এই শ্রীমতী কাফে একমাত্র ভরসা। যুঁই যা-ই বলুক, শ্রীমতী কাফে না থাকলে তারা খাবে কি!

এতদিন বাদে দেখা যাচ্ছে, এই শেষ মুহূর্তে হালদার বিচলিত হ'য়ে উঠছেন। যেন এইজন্যই তিনি বেঁচে রয়েছেন। বৃদ্ধা বকুল মা বিরক্ত হন যুঁইয়ের উপর। বলেন, 'এ মানুষটাকে তোমরা শান্তিতে মরতেও দেবে না।' যুঁই ভাবে, 'সত্যি, যাকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত ছিল তাকে রাখতে পারিনি! কাকে বলব, কাকে জানাব সে কথা। যাকে না বললেও সব বুঝত, যাকে না দিলেও ঠিক নিয়ে নিত, সে তো আজ আর নেই। সেদিন যে ব্যথার মাঝে আগুন ছিল। আজ সে ব্যথা ও আগুন, কিছুই নেই।'

নিতাইকে একটা মোটর কারখানায় ভর্তি করার কথা হয়েছিল। কিন্তু তার একটা পা কেটে ফেলতে হয়েছে। ও যে বড় দস্যি ছেলে। গাছ থেকে পড়ে পা কেটে সামান্য ঘা হ'ল। সেই ঘা পচে উঠে পা'টাকে বাদ দিতে হল। যেন সময় বুঝে, ঘর বুঝে ও পঙ্গু হ'য়ে বসে রইল। কোথায় গেল তার দস্যিপনা, কথায় কথায় হাসি ও রাগ। ক্রাচ্‌টি বগলে দিয়ে সে প্রথম দিকে রোজই চলে যেত নিরালা গঙ্গার ধারে। কেবলি বাবাকে মনে পড়ত। তারপর মনে মনে কি একটা ভেবে সে যুঁইয়ের কাছে ছুটে আসত। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বলতে পারত না। শুধু ক্রাচ্‌টি বগলে চেপে দাঁড়িয়ে থাকত। যুঁই বলত, 'অমনি ক'রে দাঁড়াস্‌নি নিতু, একটু বসে থাক।'

তারপর বিয়াল্লিশ সাল গিয়েছে। নিতাই বসে থাকতে পারেনি। ক্রাচ্‌টি বগলে দিয়ে সে রোজ বসে থেকেছে শ্রীমতী কাফের বারান্দায় গিয়ে। মালিক বদল হয়েছে কাফের। কোনও রাজনৈতিক দলের সভা বৈঠক সেখানে কিছুই হত না। তবু পুলিশ শ্রীমতী কাফে তখন তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেছে। তীক্ষ্ণ সন্দেহান্বিত চোখে তাকিয়ে দেখেছে এক পা'ওয়ালা নিতাইকে।

মানুষ না থাক, শ্রীমতী কাফের ইঁটের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ইন্ধন। শ্রীমতী কাফে যতদিন থাকবে, ততদিন এ অঞ্চল নিশ্চিন্ত হতে পারবে না।

কিন্তু নিতাই সেজন্য আসে না। সে আসে শ্রীমতী কাফের উপর নজর রাখবার জন্য। কাফের কোন ক্ষতি না হয়। তার কোন অধিকারই নেই, তবু সে নিজে প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যায়।

পেছনের অন্ধকার ঘরটা উঁকি মেরে দেখে। দরকার হ'লে নিজেও ঝাঁটা বুলিয়ে দিয়ে যায়। তখনো সে ভাবতে পারেনি এ ঘরে একদিন তাকে আসতে হবে কাজের জন্য। এই ঝুল পড়া অন্ধকার ঘরটা একদিন তার রোমান্সের লীলাভূমি ছিল। এ ঘরটাকে সে নিজের ব'লে ভাবতে পারেনি। কেননা, এখানে ভূত আছে। এটা কালো ঘর।

তারপর কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছে। আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে প্রিয়নাথেরা। জাপানী-বিরোধী আন্দোলন তখন কমিউনিষ্টদের মুখ্য-কাজ। কিন্তু ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি তারা বোঝাতে পারেনি দেশকে, ফলে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার মাঝখানে অপমানে ও বিদ্রূপে ছিন্নভিন্ন হতে হয়েছে তাদের। কিন্তু হার মানেনি।

আস্তে আস্তে দেখা গেল, শ্রীমতী কাফের দায়িত্ব যারা এর পর নিয়েছে তারা সকলেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের লোক। ফলে, সেখানে রাজনৈতিক কোলাহল, এমনকি হাতাহাতি, মারামারিও হয়েছে।

আন্দামান থেকে মুক্ত হ'য়ে এসেছেন নারায়ণ। যুঁইয়ের মনের মধ্যে হয় তো এমনি একটা আশা ছিল, নারায়ণ এবার সংসারের দায়িত্ব নেবেন। বোধ হয় উচিত-বিবেচনায় নারায়ণও কিছুদিন চেষ্টা করেছেন।

সে চেষ্টা দেখে, ঘোমটার আড়ালে হাসতে গিয়ে যুঁই কেঁদে ফেলেছে। সে অনেকদিন কাঁদেনি। কাঁদতে হল নারায়ণের অবস্থা দেখে। সমুদ্রের এক অন্ধকার দ্বীপ থেকে মুক্ত হয়ে, আর এক জায়গায় এসে তিনি বন্দী হয়েছেন। যুঁইয়ের বন্দীশালায় আটক পড়েছেন তিনি। তাঁর কাছে দৈনিক অনেক লোক আসে, তাঁর অনেক কাজ বাইরে। তাঁর জন্য অনেকে প্রতীক্ষা ক'রে আছে। কিন্তু কেমন ক'রে যান। ...ভজন যে ভাসিয়ে রেখে গেছে সব। এসে দেখলেন, এ সংসারের দিন চলে না। গৌরকে সারাদিন খুঁজে পাওয়া দায়। নিতাই পঙ্গু। আর একটি ছেলে আছে, মন্টু। সে

সারাদিন একটা সাইকেল মেরামতের দোকানেই পড়ে থাকে। কাজ শেখে। লেখাপড়া করাবার মত পয়সাও নেই। তাকে নারায়ণ আর বেরুতে দেন না কোথাও।

কিন্তু তিনি কি করবেন। আজ তাঁকে কি নতুন করে আবার সংসারের পথে যাত্রা করতে হবে! তাতে তিনি নিজে বা সংসার, কোনটাই যে টিকবে না।

তাঁর এ অবস্থা দেখে যুঁই আর চুপ করে থাকতে পারল না। জীবনে প্রথম সে ঘোমটার সমস্ত সঙ্কোচ খুলে ফেলে নারায়ণের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'আপনি এভাবে বসে থাকলে কি ক'রে চলবে?'

নারায়ণ লজ্জায়, সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, 'না বউমা, আমি চেষ্টায় আছি। মানে, সংসারের সব ব্যাপার তো সব সময় বুঝে উঠতে পারিনে, তাই একটু—'

'সংসারের কথা বলিনি। আপনার সংসার তো শুধু এটাই নয়, আরো অনেক আছে।'

নারায়ণ বুঝতেই পারেননি, যুঁই তাঁকে বিদ্রূপ করেছে কিনা। যুঁই বলল, 'এভাবে সব ছেড়ে দিয়ে আপনাকে আমি ঘরে বসে থাকতে দেব না। আপনার জন্য এত মানুষ বসে আছে—'

'না না বউমা, সংসারে কেউ কারুর জন্য বসে থাকে না।'

যুঁই জোর করে বলল, 'থাকে। নিজের চোখে তো দেখতে পাচ্ছি। আপনাকে দেশের মানুষ নির্বাসন থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে এসেছে। আমি তো তার থেকে বাদ নই। আপনি চলে যান তাড়াতাড়ি, আপনার কাজে হাত দিনগে। আমাকে আর অপরাধী করবেন না।'

নারায়ণের বুকের মধ্যে ফানুসের মত ফুলে উঠল। চোখ দুটো তাঁর কিছুতেই শুকনো থাকতে চাইছে না। বললেন, 'কিন্তু সংসার—'

যুঁই বলল, 'চলবে। বরং আপনি জানাশোনা একজন ভাল লোকের হাতে দোকানটা দিয়ে যান।'

নারায়ণ ভাবছিলেন, 'ভজন ভাসিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার শ্রীমতী কাফেই আজ সং ভরসা।'

একদিন শেষ মামলায় হেরে হালদারমশাইও ভজনের চায়ের দোকানটিকেই ডুবন্ত মানুষে তৃণকুটোর মত জ্ঞান করেছিলেন।

কিন্তু আরও কিছু বলার ছিল যুঁইয়ের। বলল, 'প্রমীলা ঠাকুরঝি মারা গেছেন।' সংবাদটা জানতেন না নারায়ণ। কয়েক মুহূর্ত তিনি অবুঝ পাগলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'ও! মারা গেছে? কবে?'

'বছরখানেক। আপনাকে একবার দেখবার...'

'বউমা।' নারায়ণ থামিয়ে দিলেন যুঁইকে। তিনি আর শুনতে চান না। পারছেন না শুনতে কানের মধ্যে বাজছে খালি একটি কথা, 'একবার যদি তুমি না আস, তা' হলে জীবনের সবটা বাকি থেকে যাবে।'

যুঁই বলল, 'যদি কখনো রাণাঘাট যান, তবে একবার প্রমীলা ঠাকুরঝি'র বরের সঙ্গে দে করবেন। ঠাকুরঝি বলে গেছেন।'

গিয়েছিলেন নারায়ণ, দেখা করেছিলেন প্রমীলার বরের সঙ্গে। অত্যন্ত সাধারণ মানু অবস্থাপন্ন লোক। বয়স হয়েছে যথেষ্ট। আর বিয়ে-থা করেননি। নারায়ণকে বলেছিলেন, 'অনে চেষ্টা করেছিলাম মশাই ধরে রাখবার, আপনি বড় দেরী করে ফেললেন। বিয়ে হওয়ার প

থেকে শুধু তাকে ধরে রাখাই আমার কাজ ছিল। তা' আপনি যে এত দেরী করবেন, মানে, তারও তো একটা মানুষের জ্ঞান ছিল। কাহাঁতক সে আর....'

নারায়ণ তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'না না, মশাই বলতে দিন। এই সামান্য কথা কয়টি না বললে আমারও যে ছুটি নেই। আপনার কি, দিব্যি কোন্‌দিন পুলিশের গুলি খেয়ে ফট্ ক'রে মরে যাবেন, ব্যাস্ হয়ে গেল। আর আমি? আমি কি করব?'

হাসতে গিয়ে ভদ্রলোকের চোখ জল দেখা দিয়েছিল। বলেছিলেন, 'মশাই, আমি আর চুপ ক'রে থাকতে পারছি না, বুঝলেন। এই যে নবীন, একেও সে আপনাকেই দিয়ে গেছে। আর আমি। আমাকে যদি নেন, মাইরী বলছি......আমি আর কিছুতেই একলা থাকতে পারছি না।'.....

নারায়ণ জোর করে প্রমীলার স্বামীর হাতটি নিজের হাতের মধ্যে দিয়ে খালি বলেছিলেন, 'আপনি একটু চুপ করুন।' তারপর নীরবে তাঁরা দুজনেই অসীম শূন্যে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অনেকক্ষণ।

তারপর আবার শ্রীমতী কাফে। নারায়ণ যতীশ বলে একটি ভদ্রলোকের হাতে শ্রীমতী কাফে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোককে অনেকে কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন বলে জানতেন।

প্রিয়নাথদের অহোরাত্র আড্ডাস্থল ওইটাই। লোকে বলে, রেস্টুরেন্ট নয়, কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস। সত্যি, তাদের দলের প্রাদেশিক নেতারাও এ অঞ্চলে এলে একবার শ্রীমতী কাফেতে আসেন। তা ছাড়া দিবারাত্রি কমিউনিষ্টরা তো আছেই। চা কত কাপ খায়, তার কোন হিসেব নেই। আসলে জায়গাটি তাদের বড় সুবিধার হয়েছে।

মাঝে মাঝে যতীশবাবু গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকেন। কিন্তু ভদ্রলোক মুখ ফুটে বিশেষ কিছু বলতে পারেন না। কেননা, সময়ে সময়ে উনি নিজেও মেতে যান। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে তিনি কটু কথাও বলেন। কিন্তু রোধ করতে পারেন না।

নবীন গাঙ্গুলীও এ অঞ্চলের কংগ্রেসী এম, এল, এ,। তিনি একদিন মোটর থেকে নেমে এক কাপ চা খেয়েছিলেন। খেয়ে যতীশকে বলেছিলেন, 'চায়ের স্বাদটাও দেখছি লাল হয়ে গিয়েছে। আপনি বুঝি প্রিয়নাথদের দলের লোক!'

যতীশ তাড়াতাড়ি বলেছিলেন, 'আঁজ্ঞে না মশাই।'

নবীন ভেংচে বলেছিলেন, 'না মোশাই কেন, হ্যাঁ মোশাই বলুন না। ছি, ছি, এ্যাদ্দিনের দোকানটা একেবারে মাটি করে দিলে। নারাণটার জন্যই এরকম হল। তুলে দেওয়া দরকার দোকানটা।'

কৃপালও বলেছে এরকম কথা। শঙ্করদা কলকাতা কংগ্রেস কমিটির লোক, তিনি সেখানেই থাকেন। হীরেনও কলকাতাতেই থাকে। শোনা যায়, সে আজকাল ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ করছে। বউদি তার সঙ্গে কলকাতাবাসিনী হয়েছেন। বউদিও এখন একজন কংগ্রেসের নেত্রী। এ অঞ্চলে তার নামে সবাই বড় কলঙ্ক দিয়েছে। অর্থাৎ বউদির চরিত্র সম্পর্কে।

তেমনি আছে শুধু কুটে পাগলা। তবে একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে। একমাথা পাকাচুল, একমুখ দাড়ি।

কিন্তু চরণ নেই। গৌরের দৌরাত্ম্যের যুগেই শ্রীমতী কাফে ছেড়ে সে চলে গিয়েছে নাড়ু

পুরোতের গলিতে। সে জীবনের পথে ভাসতে চেয়েছিল। কিন্তু একলা সে কোথায় ভেসে যাবে। তার সর্বস্ব পড়ে থাকবে ওই গলিটাতে। পণ্যাঙ্গনা সেই মেয়েটি তাকে আশা দিয়েছে, সময় এলে একদিন দুজনেই তারা বেরিয়ে পড়বে। তারা মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সেই মুক্তি আসেনি। তাদের দুজনেরই চুলে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সেদিন আসেনি। আজকাল তাকে লোকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, খিস্তি-খেউড় করে। তার গায়ে খারাপ রোগেরও লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সে কানা হ'য়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আধকানা চোখ নিয়ে সে মাঝে মাঝে শ্রীমতী কাফের সামনে এসে দাঁড়ায়। তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায় নিতাই।

এখানে এসে চরণের মনে পড়ে সেই শিয়ালদহ ষ্টেশনের কথা। যেদিন তাকে ধুলো থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল ভজন, তার মনিব ভজুলাট। আর মনে পড়ে জাহাজের সেই বাবু, নারায়ণ, আর ইরাবতী কূলে সেই গ্রাম, তার জন্মভূমি।

যতীশের আমল থেকেই নিতাই এসেছে শ্রীমতী কাফেতে। সে নিজেই একদিন যুঁইকে বলেছিল, 'মা, আমি ভাল রাঁধতে পারি। একটা লোক শুধু শুধু মাইনে নিয়ে যায়। দোকানে আমিই রাঁধব। যতীশবাবুকে বলেছি।'

ক্রাচ্ বগলে নিতাইয়ের দিকে খানিকক্ষণ অর্থহীন চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিল যুঁই, 'বেশ। তোর যদি তাই ইচ্ছে হয়।'

যুঁই বুঝেছিল নিতাইকে সে তার বাপের দোকানে আজ চাকর খাটতে পাঠাচ্ছে। মা আর ছেলে কয়েক মুহূর্ত শুধু সামনাসামনি মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল। আর কিছুই বলার দরকার হয়নি। নিতাই মাটির বুকে ক্রাচের একটা অদ্ভুত খট্ খট্ শব্দ করে চলে গিয়েছিল। ক্রাচের সেই খোঁচা এসে লাগছিল যুঁইয়ের বুকে। সে ছুটে গিয়েছিল ছাদের উপর। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলেছিল 'কি অদ্ভুত কারখানা-ই না খুলেছিল!'

হালদার মরবেন না। বোধ হয় বকুল মা মরতে দিতে চান না। তিনি আছেন সেখানে দিবারাত্র।

হালদারের একটা ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছাটা, জমি সংক্রান্ত ওই বেনামা কাগজপত্রগুলি যদি গৌরবে দিয়ে কাজে লাগানো যায়। অর্থাৎ মামলা করানো যায়। সে আশা অনেকদিন নির্বাপিত হয়েছে আশা ছিল নিতাই। সেও গেল। কিন্তু প্রধান রায় মন্ত্রী হয়েছেন শুনে তিনি আবার আশান্বিত হলেন। মুমূর্ষু শয্যাতেই সেই আশাতে আবার বুক বাঁধলেন তিনি। একদিন এই প্রধান রায়কে এ সমস্ত অঞ্চলের ভোট পাইয়ে দিয়েছিলেন কাউন্সিলের ইলেকশনে। সুরথনাথ বাঁড়ুজ্জেকে পরাজিত করেছিলেন।

গৌরের একটা সুযোগ সুবিধার জন্য প্রধান রায়কে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন গৌরের হাত দিয়ে। কয়েকদিন ঘুরে চিঠিটা দিয়েছিল গৌর তাঁকে। জবাবটা এসেছিল কৃপালের মারফত। জবাব ছিল এখন কিছু করা সম্ভব নয়। আব নারায়ণের ভাইপোর কোন কাজ সরকারি ব্যবস্থায় নেই।

হালদারমশাই খালি কৃপালকে বলেছিলেন, 'শীগ্‌গির বেরিয়ে যা এখান থেকে। যা।'

কৃপাল অসহ্য ক্রোধে বেরিয়ে এসেছিল। এতবড় অপমানের একটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্ষেপে গিয়েছিল সে।

আজ আটচল্লিশ সালের শেষ দিক। কমিউনিষ্ট পার্টি আবার বে-আইনি হয়ে গিয়েছে প্রিয়নাথ আত্মগোপন করেছে। কানু, বাঙ্গালী, মনোহর, ভাগন, তারা সকলেই জেলে!

নারায়ণ অনেকদিন থেকেই বিভিন্ন জেলায় ঘুরছিলেন। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। জেলে আছেন।

শ্রীমতী কাফে ফাঁকা। আজকাল এখানে কয়েকশো সাইকেল রিক্সা সব সময় প্যাঁক প্যাঁক করে ঘোরে। 'পুষ্পময়ী' নেই। এ অঞ্চলে এখন নতুন বাস রুট খুলেছে। ঘোড়ার গাড়ীতে কেউই চাপে না। তবু ভুনু আছে। একেবারে বুড়িয়ে গেছে। না, সে কোনদিন এই ছিম্‌তি কাফেকে বুঝল না, কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। লাটবাবুর ছেলেকে বাবুর্চির কাজ করতে দেখে সে ভগবানের প্রতিও বিমুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছিম্‌তির সঙ্গে আর তার সে ভাব নেই। ভাবের লোক নেই, তাই ভাব নেই, মাঝে মাঝে সে চমকে দোকানটার দিকে তাকায়। মনে হয়, কেউ যেন তাকে ভুনু সারথি বলে ডাকছে। কিন্তু কেউ ডাকে না। আজকে সে সারথি নয়, শুধু এক বুড়ো গাড়োয়ান।

নেই মনিয়া। মিনিলোসা। সে মারা গেছে। শূন্য কোল নিয়ে, মহাসমুদ্রের মত অসীম উল্লাস বুকে চেপেই সে মারা গেছে।

ভবনাথের আর কোন সন্ধান কেউ পায়নি।

শ্রীমতী কাফে টিমটাম চলে। চপ কাটলেট খাওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ কি ভিড় হয়েছে সে অঞ্চলে। পূর্ববঙ্গের বাস্তুবিতাড়িত মানুষের ভিড়। যেন দাবা খেলার ছড়ানো ঘুঁটির মত ছড়িয়ে পড়েছে।

তবু শ্রীমতী কাফের উপর কড়া নজর। অন্ধকার রাত্রে অদৃশ্য প্রেতের জোড়া জোড়া চোখ পাহারা দিচ্ছে শ্রীমতী কাফে। এর প্রতিটি ইঁটে ইঁটে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা।

দেওয়ালে লাল রং-এর পোস্টার পড়ে রাত্রে, এই সরকারকে বিতাড়নের আহ্বান তাতে। খাওয়া পরার দাবী, বাঁচার দাবীতে ক্ষুব্ধ ঘোষণা লেখা থাকে কাগজগুলিতে।

দেওয়ালে, গাছে, পাড়ায় টিকটিকির মত অনুসন্ধানী চোখ ঘুরছে। কে, কারা দিচ্ছে ওই পোস্টারগুলি। নজরটা সোজা গিয়ে পড়ে শ্রীমতী কাফের দিকে।

তখন হয়তো অন্ধকার শ্রীমতী কাফের ঘরে ঘুম ভেঙ্গে যায় নিতাইয়ের। আজকাল সে এখানেই শোয়। আর তার ঘুম আসে না। ক্রাচ্ ছাড়া এক ঠ্যাং নিয়ে দাঁড়ায়। ঘুম আসে না, বিচিত্র খেয়ালে লাফিয়ে লাফিয়ে পেছনের ঘরে যায়। যেন একটা এক ঠ্যাংওয়ালা প্রেতের মত। ঝাঁপটা আটকানো আছে কিনা দেখে। তারপর হঠাৎ লাইটটা জ্বেলে দেয়। অমনি তার কিম্ভূতকিমাকার ছায়াটা ভেসে ওঠে বেড়ার গায়ে।

আচমকা আলোর আঘাতে ছুটে পালায় ইঁদুর আর ছুঁচো। তার গা বেয়ে ওঠে আরশোলা। স ঝাড়া দেয়, বলে, শা—লা!

আর তার দিকে তাকিয়ে প্রাণের ভয়ে কুড়কুড় করে খাঁচা-বন্দী মুরগীটা। ভাবে, ওই এক ঠ্যাং যম বুঝি এখুনি ক্যাঁচ করে তার গলায় বসিয়ে দেবে ধারালো ছুরিটা। ওই কাটা ঠ্যাং দিয়ে চেপে গলায় ছুরি দেয় সে।

আবার বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে সামনের ঘরে এসে তার বাবার চেয়ারটা দেখে। ওইখানে আর কোনদিন সে বসে না। বসবার অধিকার নেই তার।

সত্যি, হঠাৎ ভীষণ নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে তার মুখটা। কিন্তু খুব আলতোভাবে কাটা ঠ্যাংটায় হাত বোলায় সে।

যতীশ কাগজ পড়ছেন। ক্রাচ্ বগলে দিয়ে ঝুঁকে দেখছে নিতাই। সকালবেলা। সবে শ্রীমতী কাফে খোলা হয়েছে। রিকসাওয়ালারা এখনো সবাই আসেনি। ভুনু আসেনি! যাত্রীর ভিড় হয়নি।

এমন সময় একগাড়ী সশস্ত্র পুলিশ এল। পাশ থেকে নেমে এলেন একজন পদস্থ অফিসার। হাতে তাঁর তল্লাসীর পরোয়ানা, এবং আরো কিছু। ভদ্রলোক প্রৌঢ়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মোটা-সোটা মানুষ। চোখে তাঁর সপ্রশ্ন কৌতূহলিত দৃষ্টি। যেন অবাক হয়েছেন শ্রীমতী কাফে দেখে।

যতীশকে বললেন, 'আপনি মালিক যতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়?'

'হ্যাঁ।'

'এ ঘরে কি কমিউনিষ্ট পার্টির গুপ্ত অফিস আছে?'

'না।'

'আমরা দেখব।'

তল্লাসী খুব সামান্য হল। পাওয়া গেল না কিছুই।

রাস্তায় জনতার ভিড় হয়েছে! পুলিশ ভিড় হটিয়ে দিচ্ছে। অফিসারটি সব ঘুরে ঘুরে দেখে হঠাৎ বললেন, 'আগের ছবিগুলি দেখছি নেই। ভজুবাবুর আমলের সেইসব ছবি।'

এই সেই ছোকরা অফিসার। একদিন যে মাথা উঁচু ক'রে এখানে ঢুকতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। আজ ঢুকছেন। একদিন যাদের তিনি এখানে ধরতে এসেছেন, তাদের অনেকের হুকুমে আজ তিনি এখানে এসেছেন। যতীশকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বর?'

যতীশ বললেন, 'আজ্ঞে না।'

'আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।'

যতীশের মুখে হঠাৎ ছায়া ঘনিয়ে এল। তারপরে বলল, 'বেশ!'

অফিসারটি আবার বললেন, 'এই নিন সরকারী হুকুম পত্র। এই শ্রীমতী কাফেটি আমি তালাবন্ধ করে দিয়ে যাব। গভর্ণমেণ্ট এটা খুলে রাখতে চান না।'

বলে তিনি নিতাইয়ের দিকে ফিরে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে ছোকরা, তোর নাম কি?'

প্রশ্ন শুনে নিতাইয়ের গায়ের মধ্যে জ্বলে উঠল। তবু বলল, 'নিতাই হালদার।'

'বাপের নাম?'

'ভজনানন্দ হালদার।'

অফিসারটি যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন! আমতা আমতা ক'রে বললেন, 'ও, মানে ভজুবাবু, ভজুবাবুর ছেলে তুমি?'

নিতাই কোন জবাব দিল না সে কথার। তিনি আবার বললেন, 'তোমার পা'টা কি ক'রে'......

নিতাই পেছনের ঘরে ক্রাচের খট্‌খট্ শব্দে চলে গেল। জল ঢেলে দিল সদ্য জ্বলা উনুনে। খাঁচায় একটা মুরগী ছিল। ছেড়ে দিল সেটাকে বাজারের পেছন দিকে! মুরগীটা কয়েক মুহূর্ত এ অভাবিত মুক্তিতে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়তে লাগল। তারপর বাজারের পিছন দিকটায় ছুটে গিয়ে খুঁটে খুঁটে পোকা খেতে লাগল। সবই নজর করে দেখলে একটি সেপাই।

তারপর বাইরের ঘরে এসে যতীশকে বলল, 'আপনি যান, আমি মা'কে গিয়ে বলি সব কথা।'

অফিসারটি হঠাৎ ডাকলেন তাকে আবার। অফিসারটি কিছু করতে চান এদের জন্য। ভজু তাকে অনেক অপমান করেছে, তার শোধ দেবেন তিনি· এদের উপকার ক'রে। তিনি আবার মাথা উঁচু করে ঢুকতে চান শ্রীমতী কাফেতে।

নিতাইকে বললেন, 'তুমি একদিন কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা কর। বুঝতে পারছি, এটাই তোমাদের শেষ সম্বল। আমি চাই না এটা বন্ধ থাকুক। তুমি এস, আমি তোমার নামে দোকানটাকে ওপন্ ক'রে দেব, কেমন? আমিই সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। একটু সমঝে চললে, কিছু· হবে না। সত্যি, ভদ্রলোকের ছেলে! আমি গভর্ণমেন্টকে রাজী করাব। কেমন?'

নিতাই চকিতে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অফিসারের মুখের দিকে দেখে দক্ষিণ দিকে ফিরে তাকাল।...অনেক লোক ভিড় করেছে। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় সকলের করুণা হচ্ছে তার জন্য।

কোন কথা না বলে, খুব জোরে পীচের রাস্তায় ক্রাচের শব্দ তুলে চলে গেল সে। খট্ খট্ খট্......

অফিসারটি চাপা অস্ফুট গলায় খালি বললেন, 'সাপের বাচ্চা, শলুই! নন্‌সেন্স!' বোধ হয় মাথাটা আজ আবার নতুন করে নীচু হ'য়ে গেল তাই রাগ হচ্ছে।

তারপর দোকানটা বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল।

শীতের রুক্ষতা। চারদিকে ন্যাড়া গাছ। ধুলো আর ধোঁয়া। সব যেন কুঁকড়ে আছে। ওই আকাশ, ধুলো, মাটি সবই।

তবু একটা দক্ষিণের সামুদ্রিক হাওয়ার বেগ থেকে থেকে হুস্ হুস্ করে আসছে। শীতের আড়মোড়া ভেঙ্গে আসছে. বসন্তের হাওয়া।

নিতাই এসে সব বলল, যুঁইকে। যুঁই শুনল। অবাক হল না। হালদারমশাই শুনলেন, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না বোধ হয়। কেননা শুনতে পান না।

নিতাই যুঁইকে বলল অফিসারটির কথা। যুঁই তাতেও বিস্মিত হল না। বরং নিতাইয়ের কঠিন মুখটার দিকে বড় বড় চোখে তাকাল।

তারপর নিতাইয়ের একটি হাত নিজের ঘাড়ে নিয়ে ক্রাচ্ দুটি সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ও দুটো থাক, আমার উপর ভর দিয়ে একটু দাঁড়া বাবা। ওই দুটো আমি দেখতে পারিনে রে।'

নিতাই বলল, 'তোমার উপর আর কতদিন ভর্ করব?'

যুঁই বলল, 'ভর্ করবি কেন? তা বলে আমার বুকে একটু আসতে নেই?'

হাওয়া আসছে। উত্তরের চাপ *ঠেলে* আসছে দক্ষিণ হাওয়া। আর নিতাইয়ের উত্তপ্ত জিভে একটা নোন্‌তা স্বাদ ঠেকছে।